[illegible]
ও
অন্যান্য গল্প

মণি মুখোপাধ্যায়

৪৪ অনাথ নাথ দেব লেন কলকাতা ৭০০০৩৭

প্রথম প্রকাশ : ১৩ মার্চ ১৯৪৯

প্রকাশক :
গল্পগুচ্ছ প্রকাশনীর পক্ষে জয়ন্ত বিশ্বাস
৪৪ অনাথ নাথ দেব লেন
কলকাতা ৭০০০৩৭

মুদ্রাকর :
আর কে প্রিণ্টার্স
৭৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০০৯

প্রাপ্তিস্থান :
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ শিল্পী :
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
দি আর্টিজান
১০৭এ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০১২

উৎসর্গ

কিরণকুমার মুখোপাধ্যায়

মানসী মুখোপাধ্যায়

দখল

উ····· র······র·····রা······আ—আ !

খুব নীচু থেকে এক অবিশ্বাস্য উঁচু পর্দায় উঠে সারা মাঠময় ছড়িয়ে পড়লো এই ধ্বনিলহরী। চকিতে ভয়ার্ত টিয়ার ঝাঁক মাঠের স্বাদু প্রলোভন ছেড়ে উড়ে যেতে বাধ্য হয় নদী পেরিয়ে বনের দিকে।

সে দুই হাত আকাশের দিকে তুলে খুব দুলে দুলে হাসতে থাকে। কপালের উপর হাত রেখে দূর অবলোকনের ভঙ্গিতে কোথায় কোথায় যেন তাকায়। বিড় বিড় ক'রে তার গলায় কথা ফুটে ওঠে, 'খা বটেক শালারা খা। ভিতুর ডিম কাঁহাকা!' তার স্বর ক্রমাগত নীচু আর জড়ানো হয়ে পড়ে। কেবলমাত্র নিজের জন্য বলা, তার কথা অন্যের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে যায়।

এখানে অবশ্য দ্বিতীয় মানুষ বলতে তার ছায়াটি। কচিৎ কদাচিৎ হাট ফেরতা মানুষেরা কিংবা এক আধজন এগ্রাম ওগ্রাম পেরোনীয়রা এই পথে আসে। তারা বিস্মিত হয়ে দেখে এক খাপছাড়া গোছের মানুষ ধান ক্ষেতের মধ্যে উবু হয়ে বসে। সিড়িঙ্গা পারা চেহারা বটে একখানা। দেখে চোখে এক খিটকেল বাধে। তারপর আরো চমকে যায় তারা। কার সঙ্গ কথা বলছে বটে লোকটা! এখানে কান ধার দেবার মত জন-মনিষ্যি কোথায়। তারপর তারা উটকো কান পেতে শোনে এক পরম আশ্চর্য বাক্যানিচয়। হাই দেখো, ভুদের গোড়া থিকে জল এত কমে গেছে ক্যানেক। শালো আকাশের হইছে তেমনি কেরদানী। আজ দু'দিন এক ফোঁটা জল নাই। ইয়ারা বাঁচে কি পেকারে। তেবে ডর নাই বাপসকল, কাল রেতে আকাশে চাঁদ দেইখলম বটে। জল নিকট বলে দুরশোভা ধইরে আছেন উনি। চুপ যা

বাপসকল, কাঁদিসনে—কাঁদিসনে—! লোকের চোখ কপালে ওঠে দেখে শুনে। এ আবার কেমন ধারা লোক গো। ধান গাছের সঙ্গে বাক্যি বিনিময়, চাঁদ আকাশের সঙ্গে বাক্যি বিনিময়। পরিবেশের গুণে তাদের গা ছমছমায়। কি জানি, এখানে তো বেম্মাস্তা উদোম হয়ে আছে। কারু ভঙ্গি তো কোন নিষেধ নেই। এমন কি ছুটন্ত বাতাসকে এক লহমা ধরে পত্‌ পত্‌ করে পাতার ভাষায় দু'চারটে এলে-বেলে কথা বলার মত একটা গাছও নয়। কি ন্যাংটো মাথা ঘুরানো ফাঁকা রে বাবা।

গা ছমছম, পা ছমছম করে তারা তড়িঘড়ি গাঁ ঘরের দিকে পা চালায়। আর লোকালয়ে পা দিতেই পরিবেশ তাদের অন্য গুণ করে। তারা হেসে হেসে লোক জড়ো করে। লোক জড়ো করে আরো হেসে বলে, 'শোনহে, এক বিত্তান্ত।'

লোকালয়ে মজা খোঁজা লোকেরা জড়ো হয়ে যায়।

'কি বিত্তান্ত বটে হে, কি বিত্তান্ত?'

'খুব মজার হে।'

'বলো তো শুনি।'

মজার লোভ লোকেদের আরো জড়ো করে।

'কাউকে কখনো ধানগাছের সঙ্গে কথা বলতে শুনেছো বটে?'

লোকেরা মাথা নাড়ে।

'না।'

'আকাশের সঙ্গে?

'সে কেমন করে হবেক।'

'বাতাসের সঙ্গে?'

'ধুস্‌ তুমি সত্যিই খুব দিল করছো হে।'

লোকেরা এই ধপাছাড়া মজাটা ভেঙ্গে ফেলে দিয়ে লৌকিক ক্রিয়াকর্মের দিকে চলে যেতে উদ্যত হয়।

বিত্তান্ত-বলিয়ে তখন একটু বেজার হয়ে বলে, 'পরিবেব কথা বিশ্বাস হলো না তো?'

লোকেরা সাফসুফ বলে, 'না'।

আহত বিত্তান্ত-বলিয়ে বলে, 'না তো চলে যাও কেনে কালোবাবুদের

ধুকুরিয়ার মাঠে। দেখেসো বিত্তান্ত ঠিক, না বেঠিক। সেই যে সেই টঙ বানিয়ে থাকে খেত পাহারাদার, সেই সিড়িঙ্গা পারা লোকটা তার কথা বলছি।' ছমদাম পা ফেলে স্থান ত্যাগ করে বিত্তান্ত-বলিয়ে লোকটা, 'যত্তো সব। এক ফোটা মুরোদ নেই মজা শুনতে আসে।'

ততক্ষণে কিন্তু লোকালয়ের লোকেদের সত্যি সত্যিই মুরোদ ফুরিয়েছে। কালোবাবুদের ধকুরীয়া মাঠ। হ্যাঁ, তারা দেখেছে বটে মনিষ্যি পারা এক পাহারাদার টঙ বানিয়ে থাকে। তা ছাড়া, কালোবাবুদের নিয়ে, কালোবাবুদের মাঠ নিয়ে সত্যি সত্যি কোন মিথ্যে জিনিস হয়না। তারা কোনদিন বিধাতা পুরুষকে দেখেনি, কিন্তু সে আপসোস কালোবাবুদের এক-আধবার দেখে ঘুচেছে।

কালোবরণ মোহান্তি। আরে বাপ, লোকালয়ের লোকেদের মাথা ঝুঁকে পড়তে চায়। ওনাদের এক পূর্বপুরুষ একরাতে ঘুম থেকে জেগে দেখেন, বুকের উপর এক মিশমিশে কালো নোড়া পারা শিব পড়ে আছেন। বাবার নেশা ভাঙের ধাত থাকলেও ঠিকঠাক বুক চিনতে ভুল হয়নি। তিনিই তো সব কিনা।

সেই থেকে মোহান্তিদেরও সব।

লোকালয়ের লোকেরা তার সঠিক হিসাব কষতে পারে না। যা শিবের সাধ্য তা মানুষের অসাধ্য। শিবের বরে মোহান্তিরা একেবারে জমি দিয়ে আসমান ছোঁয়। গঞ্জে রবিশস্যের একচেটিয়া কেনা বেচায় ঘসতে পারার মত দোসরা কেউ নেই। শহরের দিকে কি সব কলটলও চলে বাবুদের। বাবুরা শহরেই থাকেন। এক আধবার গাঁ-ঘরে আসেন লোকেদের পুণ্যে। দেখ্‌ভাল করে সব মাইনে করা লোকেরা।

এমনি করে লোকালয়ের লোকেদের মুখে মুখে ধুকুরীয়া মাঠের এক টঙে বসবাসকারী ফসল পাহারাদারের বিত্তান্ত বেশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। মুখ থেকে মুখে গল্প বেশ টেরাবেঁকা হয়ে যায়। লোকেরা বলে, 'ধুকুরীয়ার মাঠে দিন নেই রেত নেই একা একা থাকা কি চাট্টিখানি কথা হে। তবেই বোঝ।'

'এ আর বোঝাবুঝির কি আছে। নিঘঘাত কিছু তুকতাক আছে বটে মানুষটির।'

'ছাই আছে। ব্যাটা নিশ্চয় দু'চারটে খুন খারাপী করে কালোবাবুদের

ফসল পাহারাদারের চাকুরী নিয়ে ধুকুরীয়ার মাঠে লুকিয়ে আছে।' তারপর গলাটা নীচু করে বলে, 'আর কালোবাবুদের তো অমনিধারা লোকজনই পেয়জন।' যারা এই নীচু স্বরের বাক্যটি শোনে তারা চমকায়। বক্তাকে সাবধান করে, 'খুব হুঁশিয়ার হে চাড়ালের ব্যাটা। কালোবাবুদের হয়ে বাতাসও ডাক পিয়নের নোকরী করে।'

এর মধ্যে প্রধান গাঁয়ের ডাকসাইটে গোঁয়ার ছিটু প্রধান একদিন রেগে মেগে বলেছিলো, 'চলো দিনি কেউ একজন আমার সঙ্গে। পাহারাদার ব্যাটাকে নদীর চড়ায় পোঁতার জন্য ছিটুর সঙ্গে একজন সঙ্গী জোটেনি। সেই কারণে এবং গাঁয়ের মেয়েরা কান্নাকাটি করায় ছিটু শেষ অবধি যুদ্ধযাত্রা স্থগিত রেখেছে। কেবলমাত্র নিরাজপুরের স্কুলের মাস্টার গম্ভীর গলায় বলেছেন, সম্ভবত লোকটি খুব দুঃখী আর একা। প্রকৃতি ছাড়া তার বোধ হয় আপনজন কেউ নেই।

শুনে লোকেরা তো থ। এরকম বাংলা কথার মানে কি! সেই থেকে তারা মাষ্টারের নাম দিয়েছে 'সম্ভবতঃ লোকটি।'

সেই যাকে নিয়ে এত কাণ্ড, সেই সিড়িঙ্গাপারা পাহারাদারটি লুটেরা টিয়ার ঝাঁক তাড়িয়ে বেশ খুশী হয়। সে লাফিয়ে নামে তাল পাতার ছাউনি দেওয়া তার টঙ থেকে। টঙের গায়ে ঠেস দেওয়া বল্লমটা তুলে নেয় হাতে। তারপর আলের উপর দিয়ে দুলে দুলে হাঁটে। কখনো সোজা কখনো ডাইনে, আবার কখনো বাঁয়ে।

হঠাৎ থেমে সে আকাশের দিকে দেখে। একটুকরো চলন্ত মেঘ দেখে ভুরু কোঁচকায়। হাত নেড়ে বিরক্ত গলায় বলে, 'আগে বাড়ো বটে হে আগে বাড়ো। ধুকুরীয়া মাঠে এখন পেয়জনটা কি হে।'

তার ভঙ্গি থেকে মনে হয়, কাজ নেই বলে যেন এক দিনমজুরকে সে বাড়ীর উঠোন থেকে হটিয়ে দিচ্ছে।

আপন মনে বিড়বিড় করে সে, হুট বলে হাজির হলেই হলো আর কি? বলিহারী যাই বটে। এখন ধানের পেটে দুধ জমছে না—ঘন হচ্ছে না। কালাকাল জ্ঞান না হলি কখুনো সোমসার চলে। যত্তো সব।'

সে টপাস করে শুয়ে পড়ে আলের উপর। কান চেপে ধরে মাটিতে। চোখ পিটপিট করে। যেন কি এক দামী খবর জেনে নিচ্ছে। তারপর তার ফাঁসানো গলাকে যথাসাধ্য নরম করে বলে, 'তিনি আইসছেন হে, তিনি আইসছেন।'

ফের উঠে দাড়ায় সে। হাঁটতে হাঁটতে কথা চলে। 'হেঁ হেঁ, তিনি আইসতে লাগলে আমি ঠিক টের পাই। জানান পাই বটে! তিনি আইসেন মাটির তলা দিয়ে। টুকুস শব্দ নাই চলনে। এইসে পরে তিনি ধানচারারের শিকড়ে শিকড়ে খবর লাগান। তখন দেখ নাই চারাদের নাচানাচি। হাসাহাসির ধুম শোন নাই বটে।' আচমকা শুরুর মতই সে আচমকা থেমে যায়। গম্ভীর মানুষের মত আল বাইতে থাকে। এঁকে বেঁকে যখন যেমন। তারপর একসময় তার জিভ আর টাকরার কৌশল থেকে ছররাগুলির মত ছিটকে ওঠে সেই অবিশ্বাস্য ধ্বনিলহরী।

উর—র -ব - রা – আ আ!

পাখির ঝাঁক উড়তে থাকে ইতস্তত। শূন্যে পাখসাট মেরে তারা বাসান্তবালে যায়। আর ধ্বনির ছররা ছুড়ে ছুঁড়ে সে ক্রমাগত এগুতে থাকে আলপথ ধরে। একসময় তার ধ্বনির মত সেও ক্ষীণ হয়ে আসে। দৈর্ঘ্য প্রস্থ মুছে গিয়ে সে শুধু বিন্দু হয়। সবুজ ধান ক্ষেতের সমতার ছকে তাকে একটা কালো বিন্দুর মতই মনে হয় তখন।

এই এক মাঠ বটে।

তুমি যে দিকে তাকাও পুব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ আকাশ নেমে আছে মাটিতে। যেন আকাশের দেওয়াল ঘেরা এক ফাঁকা বিশাল গম্বুজ। চোখ তোমার চলতে গিয়ে একবারও থামবে না কোথাও। পুব সীমানা দিয়ে উত্তর-দক্ষিণ গেছে ন্যাশনাল হাইওয়ে। পশ্চিম সীমানায় ডাকাত নদী। নদীও উত্তর থেকে দক্ষিণগামী। নদীর উপর কংক্রিটের পুল। পুল পেরিয়ে ক্রোশটাক বন ফেড়ে পথ। তারপরে বসত শুরু। লোকালয়।

তাই এই মাঠ খুব নির্জন। লোকালয় থেকে অনেক দূরে। এই মাঠ নিয়ে অনেক কিংবদন্তির কথা আছে। লোকেরা যেমন বড় পাহাড় বড় বিল, বিশাল সমুদ্র, বড় নদী, গহীন দিঘি নিয়ে কিংবদন্তি বলে তেমনি এই মাঠ নিয়েও অনেক কথা।

আপাতত এই মাঠে সবুজের অঢেল বিস্তার। হাওয়ার তরঙ্গ তুলে সবুজ সমুদ্র দুলছে। খানিক তাকিয়ে থাকলে চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয় এই মাঠ। হাওয়ার কারসাজিতে ধানের পাতায় পাতায় লেগে একটা ফিস ফিস শব্দ উঠছে।

এই শব্দের মানে আর কেউ না বুঝুক সে বোঝে। সে কান খাড়া করে দাঁড়ায়।

'কি বইলছ বাপ সকল। কি কথা হচ্ছে বটে, শুনি?'

একজন প্রকৃত সমঝদারের মত সে দুলে দুলে হাসে।

হেঁ হেঁ হেঁ, তিনি আইসবেন সেই খপর লেগেছে বুঝি শিকড় বাকড়ে। তা বেশ, তা বেশ।'

'সোমসারে এটাই তো পেধান খপর বটে। উনি না এলিতো সব কাত।' সে নীচু হয়ে একটা ভিজে মাটি তুলে নিয়ে করতলের উপর রাখে। আঙ্গুল দিয়ে নাড়েচাড়ে গভীর মনোযোগে।

'হু, দোআসলাই বটে! তবে একটুন বালির মিশেল আছে। অখন ছুঁতে না ছুঁতেই পাক ধরে যাবে।'

সে এসব বোঝে। মাটির ধাত জানে। আকাশের মর্জি বোঝে। গাছের শিকড়ে পাতায় রোদ হাওয়ার কাজকর্ম জানে। পোক পোকালীরা কে কেমন মতলবে ঘোরে তারও হদিস জানা আছে তার। এক কথায় সে হলো গিয়ে মাঠ আর শস্যের প্রকৃত সমঝদার।

সারাটা দুপর আলে আলে ঘুরে মাঠের তদারকী সারে সে। তার কালো চিম্‌সানো শরীর উদোম মাঠের তেজী রোদে পুড়ে আরও চিমসানো হয়। সমান বালুর উপর বড় বড় ফোঁটার বৃষ্টি পড়লে যেমন দাগে দাগে মেরে যায়, তার মুখটিও তেমনি। এক সময় গুটি বসন্ত তাকে যম ছোঁয়া করেছিলো বোঝা যায়। তার শরীর মাংসহীন, দোমড়ানো পাকানো। চোখ দুটি গর্তে ঢোকা। থুতনীর উপর অল্প কিছু দাড়ি। তার পরনে অনেক কাল আগের একখানা মোটা কাপড়ের অংশ বিশেষ।

মাঠের ওপ্রান্ত থেকে এই মাঝামাঝি তার টঙের পাশটিতে আসতেই এক হেঁচকায় কে যেন সূর্যিটাকে বনের পিছনে নামিয়ে নেয়। আর ছায়া এসময় সবুজের উপর উড়ে এসে কি যে মায়া লাগায়। সে চোখ পিট পিট করে। সে বোঝে, তার হাভ্‌ডিসার সিড়িঙ্গা দেহের মধ্যেও নরম সরম কি যেন চলেছে ফিরছে।

এই সময় সে মাঠকে আড়াআড়ি ছেদ করে নদীর দিকে যায়। এই তার স্নানের সময়। টঙের উপর ঢাকা দেওয়া আছে এ্যালমুনিয়মের থালায় ভিজানো

ভাত। ফিরে সে কাঁচা লঙ্কা কাঁচা পিঁয়াজ দিয়ে খাবে। তার জিভের মধ্যে যেন একটা তার এসে যায় এখুনি ; সে শুরুৎ করে নোলার জল টানে। এতক্ষণ বাদে সে ক্ষিধেটাকে টের পায়।

পা চালিয়ে নদীর ধারে এসে পড়ে।

বল্লমটি মাটিতে পুঁতে তাতে পরনের কাপড়টি বেঁধে রাখে। সে জানে, মানুষের চোখ সব বনের ওপারে। সে খানিক মাটির উপর উদোম শরীরে শুয়ে থাকে। এ সময় কেমন যেন সন্দেহ হয়, তার চোখের গর্ত থেকে জল উঠে এসে গড়িয়ে যেতে থাকে মাটির দিকে। কেন ? তার পিছনে কিছু কষ্টের কথা আছে নাকি ? সন্ধ্যাবেলা, নদীর ধার আর মাটি দেখলেই মনে পড়ে ?

কি জানি। আর থাকলেইবা কে তার খবর রাখছে। সে তো এক সিড়িঙ্গাপারা মানুষ, লোকালয় থেকে এই নির্জন শস্যের মাঠে সে তো পাহারাদার। তার পিছনে কোন কথা আছে কিনা তা জানবার গরজ কার।

এ এক মজার খেলা। কেউ কারো কথা জানতে চায়না। খালি খালি নিজের কথা অন্যকে জানাতে চায়। যাকে জানাতে চায় সে আবার জানতে চায় না। তার অবশ্য এ সব কোন ঝামেলা নেই। সারাদিন আর সারারাত সে এই মাঠ ফসলের সঙ্গে কথা বলে কাটিয়ে দেয়। এর চাইতে আরামে থাকার কথা সে ভাবতে পারে না।

স্নান শেষ হলে সে কিছু সময় ডাঙায় উঠে দাঁড়িয়ে থাকে। ভিজে পা শুকিয়ে যেতে হয়। শেষে চিট ময়লা কাপড়টি কোমরে জড়িয়ে বল্লম হাতে টঙের দিকে ফিরতে থাকে। আবছা অন্ধকারে তার দু'পাশে ধানের গোড় থরে থরে। স্নান শেষে পবিত্র শরীরে সে এদের স্পর্শ করতে করতে ফেরে।

এই অন্ধকার ধুকুরীয়ার মাঠে তেনার আসবার ঘোষণা একেবারে রোমাঞ্চিত হয়ে আছে। তিনি আসবেন। তিনি এলেই সব ঠিকঠাক। সে জানে, তেনার আসবার জন্য কত আয়োজন। যদিও তখনও সে আসেনি। কিন্তু অনুমান করতে পারে, অম্বুবাচীর আগে থেকেই এই বিশাল মাঠের ওপর গর্ভিনী মেঘ কেমন অঝোর বর্ষে ছিলো। জল থৈ থৈ ধুকুরীয়ার মাঠ লাঙলের ফালের জন্য প্রস্তুত। তারপর অম্বুবাচী ছেড়ে যেতেই এই মাঠ হাল-বলদ, চাষার হাঁক ডাকে একেবারে লোকালয়ের হাট। ঢুমকার কালো কালো মেয়েরা কাদায় কালো পা পুঁতে, হাঁটুর উপর শাড়ি তুলে পুঁতে দিয়ে গেলো ধানের

গুছি। দুই নিড়ানে মাঠে জেগে থাকলো কোলাহল। তারপর চাপান সার লাগাতেই মাঠময় নিঃশব্দে হেসে উঠলো সবুজ। তখন সে এলো এই মাঠে পাহারাদারীর কাজ নিয়ে। টঙ বানালো। বাবুরা চাল নুন দিলো। দু'একটা ফাটা ভাঙ্গা এ্যালমুনিয়মের পাত্তর। সে কাঠকুটো জোগাড় করল চাল ফোটাবার জন্য। সেই থেকে সে এখানে। সেই থেকে তার বিভ্রান্ত লোকালয়ের মানুষদের মুখে।

সে টঙের ভিতর বল্লমটি রাখতে গিয়ে তাজ্জব। হায় হায়, তার এ্যালমুনিয়মের পাত্তর দুটি টঙের মুখে ওল্টানো কেন? শেয়াল, না কুকুর। কিন্তু এখানে তো সে কখনো কুকুর দেখেনি। আর শেয়ালই বা তার উঁচু টঙে উঠবে কি করে। সে হামাগুড়ি দিয়ে টঙের ভিতর ঢোকে। সে জলে ভাতে একথালা রেখে গিয়েছিলো। একটা দানাও পড়ে নেই। তার পেট থেকে পাক দিয়ে উঠে ক্ষিধেটা ঝনাৎ করে ছড়িয়ে পড়লো রক্তে রক্তে।

টঙ থেকে লাফিয়ে নামলো সে। এদিক ওদিক তাকালো। সে অন্ধকারে কখনো বাতি দিয়ে দেখতে অভ্যস্ত নয় বলে সহজেই দেখতে পেলো, কে একটা আলের উপর শুয়ে আছে। মানুষের পারা।

ঝটিতি বল্লম হাতে তুলে নিয়ে এগিয়ে গেলো সে।

'কে বটে হে, কে?'

সাড়া না পেয়ে এক লহমা ভড়কালো। পরক্ষণেই শক্ত মুঠিতে বল্লম চেপে ধরে চোয়াড়ে গলায় বললো, 'সাড়া না দিলে এই ছুড়ে দিলাম কিন্তুক।'

'মেরো না গো, মানুষ বটি'।

'মানুষ!' সে এবার সত্যিই চমকালো। এতো মেয়েমানুষের গলা। এত রাতে ধুকুড়িয়ার মাঠে মেয়ে মানুষ। এই উটকো ঝামেলা কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসলো। মেয়েমানুষ তা এখানে কেন? পুল পেরিয়ে, বন পেরিয়ে তো লোকালয় আছে। সেখানে এসব ব্যাপার খাপ খায়। এরকম ঝামেলা সে মোটেই পছন্দ করে না। তার সামনে এখন ধানের শিষে দুধ জমেছে। সারা রাত্তির শিশির খেয়ে বসুমতীর তরল রক্ত ধানের মধ্যে জমাট বাঁধবে। তার এখন অনেক কাজ। অনেক ঝঞ্ঝাট। তার গলাটা রুক্ষ হয়ে ওঠে 'জল ভাতটা তা'লে তুমিই মেরে দিয়েছো বটে?'

জবাব না দিয়ে মেয়েমানুষটা উঠে বসে।

'কি হলো, রা কাড়ছো না কেনে ?'

তার অন্ধকারে দেখতে অভ্যস্থ চোখ টের পেলো মেয়েমানুষটা মাথা ঝুঁকিয়ে বসে আছে। ক্ষিধেটা পেটের মধ্যে পাকিয়ে ওঠাতে তার মেজাজ একেবারে তুঙ্গে চড়ে গেলো।

'ধুততরি তোর নিকুচি করেছে মেয়েমানুষের।'

এরকম দাপুটে আওয়াজে মেয়েমানুষটা ঘাবড়ায়। কি জানি বাবা, কেমন-ধারা গোঁয়ার মানুষ কে জানে। তা ছাড়া সত্যিই তো বেড়ে রেখে খাওয়া মুখের গরাস। মেয়েমানুষটা দুবলা গায়ে বলে, 'তিনদিন কিছু খাই নাই গ, তাই।'

'ব্যাস, তবে আর কি, অন্যের বাড়া ভাত মেরে দেবে।' কিন্তু সে জানে, এসব বলার এখন আর কোন মানে টানে নেই। তার বাড়া অন্ন এখন তিন দিন না খাওয়া মেয়েমানুষটার পেট আলো করে বসে আছে। অন্নের নিয়ম এই। অন্ন তুমি কার ? যখন যার পেটে তার। সে নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করে এইসব ভেবে।

মেয়েমানুষটা এবার চিকন গলায় কথা বলে, 'এখনো রাগ করে আছ বটে ?'

'তবে কি পিরিত করে থাকব ?'

তার ঝাঁঝ এখনো যায়নি। এত চট করে যাবার কথাও নয়। সে এবার হাত নেড়ে বিরক্ত গলায় বলে, 'খেয়েছো, দেয়েছো। এবার ইখান থিকে কেটে পড়ো দিনি। রাত বিরেতে ধুকুরীয়ার মাঠ ভাল নয়।'

সে লম্বা লম্বা পা ফেলে টঙে ফিরে আসে। মাটির হাঁড়ি থেকে মুঠো করে চাল নিয়ে কড় কড় করে চিবুতে থাকে। চাল চিবিয়ে চোঁ চোঁ করে জল টানে। পেটের জ্বালা খানিক কমলে ভাবে, তাইতো, মেয়েমানুষটাকে তো কিছুই শুধনো হলো না। তিনদিন খায়নি কেন সে ? কোথায় ঘর ? ধুকুরীয়ার মাঠে কি জন্যে ? এই সব বিত্তান্ত। কিন্তু কি লাভ। সে তো জানেই মেয়েমানুষটা কি বলবে। বেশীর ভাগ মানুষের যেমন বিত্তান্ত দুঃখের এরও তাই হবে। আর যত দুঃখী মানুষের কাহিনীই এক প্রকার হয়। তাছাড়া বেশী পুছতাছ করতে গেলেই মেয়েমানুষটা তাকে পেয়ে বসবে। নড়তে চাইবে না। এখন ওটা ভেগে গেলেই সে বাঁচে।

তার এখন অনেক কাজ। ধুকুরীয়ার মাঠে ধানের খোড়ে এখন অনেক মজার

ব্যাপার স্যাপার চলবে। তিনি আসবেন। খুব চুপি চুপি। কাউকে জানান না দিয়ে তিনি ঠিকঠাক না এলে সোমসার জুড়ে যত জ্বালা যত কষ্ট। ঐ মেয়েমানুষটার মত। শেষবেস্ ধুকুরীয়ার মাঠে এসে অন্যের ভাত চুরি করে জ্বালা মেটাতে হবে। তাকে যে নামেই ডাকো, তিনি তো অন্ন। তিনিই তো সব। তার জন্যই এত আয়োজন। সেই তিনি না এলেই জগৎ অন্ধকার। আর তার আগমন সে ছাড়া কে বুঝবে। বেড়ে উঠবার মুখে গাছেদের দুঃখকষ্টকে সারারাত মাঠে ঘুরে ঘুরে ধানের চারাদের ডাক দিয়ে ফিরবে। হুঁশিয়ার বাপসকল, ছুটকো পোকামাকড় থিকে হুঁশিয়ার। কেউ যেন ঘুম যেও না। সব জেগে থাকো, সব জেগে থাকো। হিম ঝরছে বাপসকল, যত পারো সব খেয়ে লাও, খেয়ে লাও।

সে দেখে মেয়েমানুষটা তার টঙের ধারে দাড়িয়ে। রেগে খিঁচিয়ে ওঠে সে, 'কি হলো, ভাগলে না যে বড় ?'

'এত রেতে কুথাকে যাবো।'

খুব দুঃখীদের মত শোনায় মেয়েমানুষটার গলা। তার রাগ হয় আবার হাসিও পায়। এই আঁধার রেতে ধুকুরীয়ার মাঠ একখানা ভালো আশ্রয় বটে। এ কেমন ধারা মেয়েমানুষ। হঠাৎ তার মনে পড়ে, পেটে অন্ন নাইতো মেয়েমানুষের চোখেও লাজ নাই। ভয় মান অপমান এসব হলো গিয়ে তোমার পরের কথা। ভাতের টানে মেয়েমানুষটার তাই লাজও গেছে, ভয়ও গেছে।

কিন্তু মন তিতিয়ে ওঠে। বিরক্ত হয়ে বলে, 'তবে যা পারো কর গে।'

আলের পথে পা বাড়াতে গিয়ে সে থমকে দাঁড়িয়ে বলে, 'তবে খেয়াল রেখো কাল ভোরে দু'জনে একসঙ্গে সুর্যি ওঠা দেখবো না, তার আগেই ভেগে যেয়ো।'

সে আপন মনে গজগজ করতে করতে আল ভাঙে। তারপর একসময় ধুকুরীয়ার অন্ধকার মাঠ তাকে গ্রাস করে।

আবার এক-আধজন হাটকরনীয়া মাঠপেরোনীয়া ঐ পথে যেতে গিয়ে চোখ কপালে তুলে দেখে, আই বাপ সেই সিঁড়িঙ্গাপারা পাহারাদারটির পাশে বসে ওটি কে বটে গো, যেন মেয়েমানুষের পারা লাগে। তারা আর দেরী করে না। হুড়মুড়িয়ে লোকালয়ে এসে পড়ে।

'শোন বটে সব, শোন। সে এক মজার বিত্তান্ত।'

লোকালয়ের লোকেরা জড়ো হয়।

'কি মজা হে, কি মজা ?'

''কালোবাবুদের ধুকুরীয়া মাঠ—'

'তা কি হলো তার ?'

বিত্তান্ত-বলিয়ে হাত তোলে কথকের ভঙ্গিতে।

'আগে শোনই না। সেই মানুষের পারা পাহারাদার।'

'তা কি করেছে বটে সে ?'

'তোমরা কি বিশ্বাস যাবে ?'

লোকেরা অধৈর্য হয়।

'অত দিক করোনা দিনি বাপু। তোমার বলার ভাগ বলে যাও। বিশ্বাস অবিশ্বাসের দায় তো মোদের।'

বিত্তান্ত বলিয়ে বলে, 'আমার নিজের নজরে দেখা আগুনের দিব্বি বলছি।'

'কি বটে হে।'

'পাহারাদারের পাশটিতে বইসে আছে। কথা বলছে। হাসছে। একেবারে জ্যান্ত এক মেয়েমানুষ বটে হে।'

শুনে লোকেরা একেবারে তাজ্জব বনে যায়। কারু মুখে রা থাকে না। সকলেই বোঝে এবার পাহারাদারের হয়ে এল। ফসল পাকার মুখে শালা মেয়েমানুষ তুলেছে টঙে। যেখানটিতে লক্ষ্মীঠাকরুণের পা পড়বে সেখানে বাবুদের মত বাগান বাড়ী। শালা এবার গেলো। কালো বাবুরা শুনলে আর রক্ষে নেই।

একজন বললে, 'কথা থিকে ভাগিয়ে এনেছে দেখো।'

'শেষকালে মেয়েমানুষ চুরি।'

'ডাকাত, ডাকাত।'

ডাকসাইটে গোঁয়ার ছিটু প্রধান বলে, 'সঙ্গে একটা লোক পেলে ব্যাটাকে আমি নদীর চড়ায় পুঁতে দিয়ে আসতাম না।'

কেবল নিয়াজপুরের সেই কেমন যেন ইস্কুল মাস্টার খানিক সময় আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে বলেছে, 'আমি ঠিক এই রকমই পড়েছি। মানুষের ইতিহাসে এই রকমই লেখা আছে। একজন পুরুষ থাকলে প্রকৃতির টানে একজন মেয়েমানুষও এসে যায়। তাদের প্রয়োজনের চাওয়া থেকেই

ক্রমে বসতি গড়ে ওঠে। একটা নতুন জনবসতি গড়ে উঠছে বলে যেন মনে হয়।'

মাস্টারের কথা যারা শুনলো আর যারা শুনলোনা তারা একই সঙ্গে বললো, 'এ আবার কেমন ঢঙের কথা। কোন মানে বোঝা যায় না।'

তবে সবাই বুঝলো মাস্টারেরও হয়ে এসেছে। কালোবাবুদের কানে গেলে এমন পাগল মাষ্টার তারা স্কুল থেকে নিঘ্‌ঘাত হঠিয়ে দেবেন। লোকালয়ের লোকেদের মুখে মুখে আবার ধুকুরীয়ার মাঠের এক পাহারাদারের নতুন বিত্তান্ত ছড়িয়ে যেতে থাকে।

সে আলের উপর গোজ হয়ে বসে থাকে। স্পষ্টতই সে খুব বিরক্ত। এসব তার মোটেই ভাল লাগছেনা। মেয়েমানুষটা এখনও ভাগেনি। তার পায়ের কাঁটা হয়ে আছে। কত আর কুকুর বিড়ালের মত দূর দূর করা যায়। এই মাঠে এখন অবশ্যের অধিষ্ঠান হতে চলেছে। সংসারের তাবৎ মানুষের জীয়ন কাঠি—এখন কোন উটকো ঝামেলা তার পছন্দ নয়। তাকে চোখ মেলে থাকতে হচ্ছে আকাশের দিকে, বাতাসের দিকে, পোকা মাকড়ের দিকে। এখন তার চোখ আর মন ভিন দিকে ফিরাবার উপায় নেই। আর এই সময়েই এই উটকো মেয়েমানুষটার ঝামেলা।

তবে হ্যাঁ, মেয়েমানুষটার রান্নার তরিবৎ আছে। সে তো ভিজা ভাত এতকাল কাঁচা লঙ্কা দিয়ে মেরে কাটালো। জিভের সোয়াদ বলতে এই। মেয়েমানুষটা জবরদস্তি ভাত ফোটাতে লেগে গেছে। তার মানা শোনেনি। পেটে একটু ভাত পড়াতে চোখে বোধহয় লাজ এসেছে। কিছু না করে খেতে তাই দোনামনা। তবে হ্যাঁ, মেয়ে মানুষটা রান্নার তরিবৎ জানে বটে। কোথা থেকে গুগ্‌লি কুড়িয়ে এনেছে। আলের ধার থেকে শুশনী শাক। দু'দিন অন্ন বড় মধুর লাগছে তার।

কিন্তু ঢের হয়েছে। আর নয়। মেয়ে মানুষটাকে এবার তাড়াতে হবে। সে এক সিড়িঙ্গাপারা পাহারাদার। তার আর মেয়েমানুষের কাজ নেই।

ইতিমধ্যে ধুকুরীয়া মাঠের কপালে একটু চাঁদ উঠেছে। রাতের গায়ে একটু শীতের আভাস। বেসে জ্যোৎস্নায় ফসলের মাঠে বড় রহস্য ধরেছে। প্রকৃতির মধ্যে যে কত তুকতাক আছে কে জানে।

মেয়েমানুষটা হঠাৎ বলে বসে 'তুমি মানুষটা পাগল নাকি বটে?'

সে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়। গলাটা মোটা করে বলে, 'কেনে পাগলের কি দেখলে তুমি ?'

'না হলে কেউ ধান গাছের সঙ্গে কথা বলে ? পোকা-মাকড় আর বাতাসের সঙ্গে কথা বলে ? ছেঁড়া আঁচল মুখে চেপে মেয়েমানুষটা হাসি আটকায়।

সে রেগেমেগে দাঁড়িয়ে পড়ে। মুফতে ভাত মেরে এখন থাকে ঠাট। সে রাগী গলায় বলে, 'সে তুমি বুঝবে না সে তুমি বুঝবে না। মেয়েমানুষরা সোমসারে কি বা বোঝে।' সে হন হন করে আলপথ ধরে হাঁটতে থাকে। মেয়েমানুষটা তার পিছু নেয়। সে জানে গাছ চলে গেলে তার ছায়া বাঁচে না।

বলে, 'রাগ করলে, রাগ করলে। মেয়েমানুষ কি অত বোঝে বটে।'

সে দাঁড়ায়। গলায় ঝাঁঝ রেখে বলে, অত বুঝে কাজ নেই। কাল তুমি চলে যাবে ইখান থেকে। সোজা কথা।'

'কুথাকে যাবো। সোমসারে তো আমার কেউ নেই। যারা ছেল—'

'থাক বটে থাক, আমার শুনে কাজ নেই। সব দুঃখী মানুষের কথাই এক। ও আমি ঢের ঢের জানি ' - তার গলার স্বর কেমন নীচুতে নেমে যায়। সে আবার আলের উপর বসে পড়ে।

মেয়েমানুষটা আস্তে আস্তে বলে, 'তবে তোমার যে চাষবাস অন্ত প্রাণ তা বেশ বোঝা যায়।'

কানাৎ কাটা পায়ের উপর হাত বোলাতে বোলাতে সে জিজ্ঞেস করে, 'কিসে বুঝলে ?'

'তা আবার বুঝবোনি। তোমার যে গাছপালা ধানপানের সঙ্গে কথা চালাচালি হয়। সে তো মন টানে বলেই না। তোমার নিশ্চয়ই চাষ আবাদ ছিলো কিনা ?

সে চমকে ওঠে।

'অঁা, কে বললে বটেক ?'

'আমার মনে লয় তোমার চলনে বলনে।'

সে তার পাকানো শরীরটা নিয়ে লাফিয়ে ওঠে আলের ওপর। তেতো গলায় বলে, ঝুট বাত, একদম ঝুট বাত। ফের আমার সাথে দিয়ালা করবে তো এক চড়ে মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেবো।' মেয়েমানুষটা অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। মানুষটির ধরন-ধারণের কিছুতেই তল পাওয়া যাচ্ছে না। কিসে

যে খুশী আর কিসে যে রাগ তা বোঝা এক কঠিন কাজ। কে জানে, মানুষটি অনেক শোক পেয়েছে কিনা! কে জানে মানুষটি অনেক কিছু হারিয়ে আজ এক নেংটি পরা পাহারাদার কিনা।

সে মাথা ঝুঁকিয়ে বিড় বিড় করে আপন মনে বলে, 'চাষ-আবাদ, জমি-জিরেত। আমি শালা সেই বলে গিয়ে এক জন্মো হাঘরে, আমার সঙ্গে দিয়ালা।'

চাঁদ ক্রমাগত নদীর দিকে সরে গেলে এই ধুকুরীয়ার মাঠে রাত অনেক গভীর হয়। আকাশ থেকে দয়ামায়ার মত টপটপ করে হিম পড়তে থাকে। নগন্য পোকা-মাকড়ের পরস্পরের ভাষায় কথা বলা শুরু হয়।

তখন যেন মেয়েমানুষটার কেমন সন্দেহ হয়, সিড়িঙ্গাপারা মানুষটার চোখের কালো গর্ত থেকে জলের ধারা বেরিয়ে মাটির দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে।

মেয়েমানুষটা ডাকে, 'শুনছো বটে'।

সে দুই হাতের মধ্যে থেকে মাথা তোলে। আর এই প্রথম সে মেয়েমানুষটার দিকে ভাল করে তাকায়। সে ভাবে দুটি অন্নের টানে মানুষ কোথায় কোথায় ভেসে যায়। মেয়েমানুষটার সঙ্গে সে তো এখনো একবারও ভালো করে কথা বলেনি।

সে হঠাৎ খাপছাড়া ভাবে বলে, 'তা তো ফের রোদজল ঠেকাবার মত দেয়াল তুলতে হয়, চালা খাটাতে হয়।'

'কেনে?'

মেয়েমানুষটার চোখে কেমন চাঁদের আলো চিক্‌চিক্ করে।

'কিন্তুক চালার ভিতরে বসে দু'খানা থালা পেড়ে খাবার মত অন্ন কোথা থেকে আসে বলতো, কোথা থেকে আসে।'

তার শেষ কথাটা এই ধুকুরীয়ার মাঠে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। ভীষণ অদ্ভুত আর রহস্যময় শোনায় তা। এই মাঠ এখন অন্নময়। আর সে এমন লোক যে, ধানের গন্ধে অন্নের সঞ্চার সর্বাঙ্গ দিয়ে টের পায়। কিন্তু এক-খানা চালার তলায় দু'খানা থালা পেড়ে বসে খাবার মত অন্ন কোথা থেকে আসে তা সে জানে না। এই মহারহস্য ভেদে অক্ষম হয়েই যেন সে দুই হাতের থাবায় মুখ ঢাকে। মেয়েমানুষটার হঠাৎ কান্না পায়। সে উঠে এসে মানুষটার অভুক্ত পিঠে একখানা হাত রাখে। এখানি ভিন্ন সোয়াদের হাত।

সে প্রায় পাগল হবার দাখিল।

ছুটোছুটীতে তাকে হয়রান হতে হচ্ছে। বাতাস খবর পাঠিয়েছে লুঠেরাদের কাছে। এসো হে, এসো, ধুকুরীয়ার মাঠে একখানা বড় মাপের ভোজনের আয়োজন হয়েছে। পুরুষ্টু শস্যদানার ভারে নুয়ে পড়েছে ধানের ছড়া। ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসছে লাল ঠোঁট সবুজ টিয়া। তাদের তীক্ষ্ণ কর্কশ ডাক এখানকার বাতাসকে ফালাফালা করে দিচ্ছে। ধেড়ে মেঠো ইঁদুর আসছে অগুণতি। কুটকুট করে ধানের ছড়া কেটে টেনে নিয়ে যাচ্ছে গর্তের ভিতর। এই মাঠে এখন বড় রকমের লুঠতরাজ শুরু হয়ে গেছে। 'উর্‌····র····র····রা······আ····আ।'

সে দুই হাত তুলে শব্দের ছররা ছুঁড়ে একবার তেড়ে যাচ্ছে দক্ষিণে তো উত্তরে নামছে লুঠেরা। আবার উত্তরে পূবে চলছে তাদের লুঠতরাজ। তার এখন মনকে অন্য কাজে দেবার সময় নেই।

তবু ভালো লোকালয় থেকে চোরেরা এখানে আসে না। একটি ভয়ের সাবধান কথা অদেখা ভাবে টাঙানো আছে তাদের চোখের ডগায়। বাপরে কালোবাবুদের মাঠ বলে কথা। কালোবরণ মোহান্তি।

কালোবাবুরা চাইলে কি না হয়। দিনকে দিন, রাতকে রাত তারা পালটে দিতে পারে। তারা জমি দিয়ে আকাশ ছুঁয়েছে। এখানকার লোকালয়ের লোকেরা জানে, কালোবাবুরা এলে এখানকার সাবেক রীতি জেগে ওঠে। অর্থাৎ ধুলোয় শুয়ে বলতে হবে: পণাম লিবেন বাবু, গরীব চড়াল, আমরা আর কি জানি বটে।

এই সময় একবার কালোবাবুরা গাঁ ঘরে আসেন। মাঠে শস্যের দানা পুরুষ্টু আর গন্ধময় হলে তার সংবাদ বহুদূর চলে যায়। কালোবাবুদের শহরেও চলে যায় গন্ধটা। তাই এ সময় তারা আসেন। মাইনে করা লোকের তদারকীর ফাঁক ভরাট করে দিয়ে যান। লোকালয়ের লোকেরা এসময় নরম আর মান্যকারির মত থাকে। এমন ডাকসাইটে-গোঁয়ার ছিটুপ্রধান তাকে অবধি মেয়েমানুষের মত নরম নরম লাগে।

সে এসব জানেও না, বোঝেও না, সে শস্যের পাহারাদার। এখন রকমারী লুঠেরাদের সে হঠাতে ব্যস্ত। স্নানের জন্য সে নদীতে যেতে পারে না। খাবার জন্য টঙে দু'দণ্ড থিতু হয়ে বসা তার পক্ষে কঠিন।

মেয়েমানুষটা তাই এ্যালমুনিয়মের থালায় ভাত বেড়ে, পাশে

সুসনী শাক ভাজা যত্ন করে রেখে মাঠের আলে আলে ঘুরে তাকে ধরে।

'ইবার তুমি সত্যি পাগল হলেক বটে।'

সে চেঁচিয়ে ওঠে 'ভাগ্‌, ভাগ্‌, হট্‌, '

মেয়েমানুষটা এবার হেসে ফেলে, 'আমি তোমার পাখি লয়, ইঁদুরও লয় ধান লুটেও আসিনি যে বড় হটহট করছো '

সে অন্যমনস্ক অপ্রস্তুত হাসি হাসে। বলে, 'দেখছিস না, ঐ ধারটায় একটা বড় ঝাঁক নামলো।'

'তা ওদেরও তো কিছু চাই। তা না হলে পাখ-পাখালি জন্তু-জানোয়ার বাঁচে কি পেকারে?'

সে শোনে কি শোনেনা, আবার ছুটে যায় মুখে শব্দের ছররা তুলে। মেয়েমানুষটা ভাবে তার আচ্ছা কাল হলো পাগল নিয়ে। বাড়া ভাত নিয়ে ছুটন্ত মানুষের পিছু নিতে হয় তাকে।

তারপর একসময় মানুষটাকে সে ধরে ফেলে। ঠেসে ঠুসে বসায় ভাতের থালার সামনে। বলে, আগে খাও দিনি চুপটি মেরে।'

সে এমনি করে ভাত মুখে তোলে যেন সে খাচ্ছে না। যেন সে অন্য কোন চিন্তায় গভীর ভাবে মশগুল হয়ে আছে। মেয়েমানুষটা দেখে, তার চোখের ভিতরটা বর্ষাকালের ঘোলা জলের মত ঘুর আর পাক খাওয়া। তার ভয় হয়। যে মানুষটাকে সে ক্রমে চিনে উঠছিলো এতো সে নয়। মানে পালটানো এই মানুষকে সে ধরে রাখবে কি করে।

মেয়েমানুষটা বলে, 'তোমার কি হচ্ছে বলো তো?'

সে চমকে ওঠে, 'কেন কেন?

'অমন ধারা পাগল পাগল চোখে দেখো কেন, বল দিনি? আমার ডর লাগে '

সে জবাব না দিয়ে হা হা করে হাসতে হাসতে ছুটে যায় শস্য ক্ষেতের ভিতর দিয়ে।

শূন্য থালা হাতে মেয়েমানুষটা ভয় আর ত্রাস নিয়ে তাকিয়ে থাকে সেইদিকে।

সে জানে, মানুষটা এই মাঠ আর শস্যক্ষেতকে নিজের চেয়ে বেশী ভালবাসে।

কে জানে, এই মাঠই গুণ করল নাকি তাকে? অবশেষে তারা ঠিক ঠিক সময় হাজির হয়ে যায়। কালোবাবুদের লোকেরা। হাতে কাস্তে। ধান কাটায় নেমে যাবে তারা। তারা এসে হাঁক দেয়, 'কই গো পাহারাদার। কুথাকে গেলে বটেক।'

সাড়া না পেয়ে তারা এগিয়ে গিয়ে দেখে, বিশাল ধুকুরীয়া মাঠে একা একটা টঙ।

আর টঙের পাশটি ঘেঁসে নেংটি পরা সিড়িঙ্গাপারা মানুষ। কেমন একরোখা চোখে ধানকাটা দলটার দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে আছে।

ধানকাটারা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসে। কেউ গলায় রস লাগিয়ে বলে 'তেবে যে শুনেছিলাম তুমি কুথা থিকে একটা জ্যান্ত মেয়েছেলে ভাগিয়ে এনেছো?'

এবারেও জবাব না পেয়ে আর তার রোখা ভঙ্গির দিকে তাকিয়ে অন্যজন বলে, 'থাক তেবে, ওসব রসরঙের কথা। ধান কাটতে এয়েছি ধান কেটে চলে যাবো।' এবং তারা ধান কাটায় লেগে যেতেই বিস্ময়কর ঘটনাটি ঘটে। সে শূন্যে লাফিয়ে উঠে জিভ আর টাকরার কৌশলে সেই অবিশ্বাস্য ধ্বনিলহরী বাতাসে ছুঁড়ে দেয়।

উর......র... র......রা... আ...... আ

বাঁকানো শরীর সোজা করে ধানকাটারা দাঁড়িয়ে যায়। কেউ বলে 'আমরা কি পাখি নাকি যে, তাড়াচ্ছো?'

সে এবার দু'হাত তুলে তেড়ে যায়।

'হটো হটো সব ভাগো।'

ধান কাটারা হাসে। বাঃ সিড়িঙ্গাপারা পাহারাদারটি তো বেশ রসিক আছে। পরমুহূর্তেই তারা দেখে সে এক বল্লম হাতে তেড়ে আসছে। লোকেরা ঘাবড়ে খানিক পিছু হটে। একজন চেঁচিয়ে বলে, 'জানো তো হে, আমরা কালোবাবুর লোক বট্টে।'

সে দ্বিগুণ চেঁচিয়ে হাঁকে, 'হটো, হটো সব। ভাগো।'

উদ্যত বল্লমের মুখে ধানকাটারা পরম বিস্ময় নিয়ে ফিরে যায়। আর মেয়েমানুষটা ছুটে এসে তার একটা হাত চেপে ধরে।

'কি সব্বোনাশ কইরলে তুমি বল দিনি, কি সব্বোনাশ কইরলে। ওরা যে সব কালোবাবুর লোক গো—কালোবাবুর লোক।'

এই মেয়েমানুষের গলার আর্তস্বর পাকা ধান ক্ষেতের উপর অকাল বর্ষণের ন্যায় ছড়িয়ে যায়। আর সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এক বল্লম হাতে।

তখন আর এক বিত্তান্ত ছড়িয়ে যায় লোকালয়ে।

এক জবর খবর হে, জবর খবর।'

লোকালয়ের লোকেরা জড়ো হয়ে যায়।

'কি বটে হে, কি?'

'কালোবাবুদের ধুকুরীয়া মাঠ, আর সেই যে সিড়িঙ্গাপারা পাহারাদার—'

'হ্যাঁ, তার আবার নতুন কি হলো?'

'আহা, শোনই না। সে বেটা বল্লম দেখিয়ে ধুকুরীয়া মাঠ থেকে কালোবাবুর ধানকাটা মুনিষদের হটিয়ে দিয়েছে।'

'কেন কেন?'

'বলে কিনা, ধুকুরীয়া মাঠের সব ফসল তার।'

খানিক সময় লোকালয়ের লোকদের মুখে কথা সরে না। এমন মহাবাক্যি কে কবে শুনেছে, পাহারাদার সব ফসলের দাবি করে। তারা ভেবে পায় না, লোকটা কি পাগল লোকটা বদমাস না অন্যকিছু। তবে এবার আর কালো-বাবুদের রোষ থেকে পাহারাদার ব্যাটার ছাড়ান নেই। অমন যে ডাকসাইটে গোঁয়ার ছিটু প্রধান সে অবধি লোকটার পরিণতি ভেবে ভয়ে সিঁটিয়ে যায়।

কেবল নিয়াজপুরের সেই কেমন যেন মাস্টার আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলে, 'আমি জানতাম, এরকম হবে। ঠিক যেমনটি পড়েছিলাম তাই। মানুষের ইতিহাসে এই রকমই লেখা আছে। মানুষ এলে প্রকৃতির টানে একজন মেয়েমানুষ এসে যায়। আর তাদের প্রয়োজনের চাওয়া থেকে বসতি গড়ে ওঠে। আর বসতিকে বাঁচাতে গেলে শস্যের দখল তো নিতেই হবে।'

সামনে কালোবাবুদের তিনজন লাঠিয়াল, তার পিছনে ধানকাটারা, আর তারও পিছনে ভিড় করে আসে লোকালয়ের কৌতূহলী লোকেরা। তারা দেখে কাকাতুয়ার মত লেংটি পরা এক পাহারাদার বল্লম উচিয়ে দাঁড়িয়ে। পাশে মেয়েমানুষটা। কালোবাবুদের তিন লাঠিয়াল এগিয়ে যেতে গিয়ে মুহূর্তকাল থমকে দাঁড়ায়। তাদের মধ্যে এক অন্নময় প্রান্তর।

অহিংসা

অবশেষে ওটা পাওয়া গেলো।

দীর্ঘ আট ন' মাস মন বড় উচাটন ছিলো নন্দকিশোরের। দিনেরাতে দুচোখের পাতা এক করতে পারছিলো না সে। যুগলকিশোরের মন্দিরেও দু দণ্ড থিতু হয়ে বসতে পারছিলো না। সাধে কি আর গোঁসাই বলেছেন, বিষয় হলো বিষ। কিন্তু ব্যাখ্যা করে সাথে সাথে একথাও বলেছেন, বিষ ছেড়ে রাখতে নেই। তাকে আত্মস্থ করো। কণ্ঠস্থ করো। তাকে ছেড়ে রাখলেই অনর্থ ঘটাবে। বিষকে মন্থন করেই তো অমৃত। বিষয়কে সদাসদ বিবেচনায় ব্যবহার করেই তো বিষয়োত্তীর্ণ হওয়া। অর্থাৎ মুক্তি।

আহা, কী কথা। কথা তো নয়, যেন অমৃত। গোঁসাইকে স্মরণ করে সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ বোধ করলো নন্দকিশোর। গোঁসাইয়ের প্রতিটি আদেশই অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করে চলে সে। সদাসদ বিবেচনায়ই বিষয়কে ব্যবহার করছে নন্দকিশোর। বংশানুক্রমিক দানধ্যান তাদের কম নয়। দাতব্য চিকিৎসালয়, যদিও প্রাচীন কবিরাজী মতেই ব্যবস্থাদি, কেননা আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলি বলতে গেলে ঘৃণার চোখেই দেখে নন্দকিশোর, বাড়ীর ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষে গ্রাম এমন কি পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের নিঃস্ব দুঃখীদের বস্ত্র বিতরণ মাসান্তে একবার বৈষ্ণব সেবা, সর্বোপরি আছেন গৃহদেবতা যুগলকিশোর। পাকা মন্দির, বাঁধানো ঘাট, পুকুর, আমজামের স্নিগ্ধ ছায়ায় ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত। সেবাইত, নিত্য ভোগ, স্বর্ণালংকার, ঠাকুরকে নিবেদিত দুইশত বিঘা ধান্য জমি। অনন্যোপায় আত্মীয়-স্বজনও প্রতিপালিত হয় তার সংসারের স্নেহচ্ছায়ায়। এই সবই তো তার বিষয়কে সদাসদ বিবেচনায় কাজে খাটানোর প্রমাণ।

আর বিষয়। বুকের গভীর থেকে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করলো নন্দকিশোর। ছেলেবেলায় তাকে নিয়ে প্রায়শই এদিক ওদিক ভ্রমণ করতেন

পিতৃদেব। তিনি যে রাস্তায়ই যেতেন তাকে একটা প্রশ্ন করতেন, 'বাবা নন্দ, কতদূর দেখতে পাচ্ছ তুমি?'

নন্দকিশোর যতদূর দৃষ্টি চলে তাকিয়ে বলতো, 'ওই-ই আকাশটা যেখানেই নেমে গেছে সেই অবধি।'

প্রসন্ন মুখের উপর হৃষ্ট হেসে পিতৃদেব বলতেন, 'যা তুমি দেখতে পাচ্ছ আর যা দেখতে পাচ্ছ না সবই তোমাদের বাবা। সব চিনে বুঝে নাও। বিষয়কে প্রহরীর মত আগলাতে শেখো।'

আর এখন! বাল্যস্মৃতি স্মরণে নন্দকিশোর খেদাক্ত হলো। পিতৃদেবরা দুই ভাই ছিলেন। বিষয় প্রথম দ্বিখণ্ডিত হলো সেখানে। তার চার ভাই। পিতৃদেব মৃত্যুর সময় তাকে আবার চতুর্খণ্ড করে গেলেন। খণ্ডিত অংশ সেই অখণ্ডের তুলনায় কত অকিঞ্চিৎকর। ঠাকুরের বিষয় বাদ দিলে, তার নিজের ভাগে চারশত বিঘা ধান্য জমি, কিছু বাগান, পুকুর আর কিছু ঝিলবিল। চারশত বিঘার মধ্যে একশত বিঘা অবশ্য তার নিজ প্রচেষ্টায় অর্জিত। কিন্তু এই সমস্তই সেই অখণ্ডের তুলনায় কত অকিঞ্চিৎকর।

এর মধ্য থেকেই একটা দার্শনিক চিন্তা নন্দকিশোরের মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করলো। হায়, মানুষও তো তার অখণ্ড সত্তাকে প্রতিনিয়ত খণ্ড খণ্ড করে চলেছে। লোভে, ক্রোধে, কামে, ঘৃণায় প্রতিমুহূর্তে খণ্ড খণ্ড হচ্ছে মানুষ। এই খণ্ড-বিখণ্ড মানুষের পরিণতি কি? এই এক মহা জিজ্ঞাসার মুখে দাঁড়িয়ে নিজেকে বড় অসহায় বোধ করতে লাগলো নন্দকিশোর।

গোঁসাই থাকলে বলতেন, খণ্ড থেকে অখণ্ডের দিকে যাত্রা করতে শেখো। তবেই সার্থকতা। গোঁসাই-এর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে নন্দকিশোর। তার অভিপ্রায়ও তো খণ্ড থেকে অখণ্ডের দিকেই।

আর এই মহৎ অভিপ্রায়ের জন্যই তো যত ঝামেলা। যত বিপত্তি। নন্দকিশোর খুব মর্মাহত বোধ করলো। মানুষের মধ্যে লোভ ক্রোধ বড় বেশী মাত্রায় প্রকটিত হয়ে পড়েছে। পূর্বজন্মের অর্জিত ফল মানুষকে যে ইহজন্মেই ভোগ করতে হয় এই চির সত্য থেকে ক্রমশঃই দূরে যাচ্ছে মানুষ। ন্যায় অন্যায় ভুলে গিয়ে অন্যের সম্পদের দিকে লোভাতুর হাত বাড়াচ্ছে।

কপাল বলে একটা কথা আছে। তার লিখন পালটানো কি মানুষের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে? না কি দঙ্গল বেঁধে অন্যের সম্পদ জবরদখল করলেই

রাতারাতি কপালের লেখা পালটায়। সে তো ব্রজকিশোর চৌধুরীর সন্তান নন্দকিশোর না হয়ে সনাতন দাসের ছেলে নবীন দাস হতে পারতো। তবে হলো না কেন? পূর্ব জন্মের পাপপুণ্য ইহজন্মের কপালে লেখা থাকে বলেই সে ব্রজকিশোরের ছেলে নন্দকিশোর আর সনাতন দাসের ছেলে নবীন দাস। মূর্খ মূর্খ। সত্যের পিছনে না ছুটে যারা লোভের, ক্রোধের পিছনে ছোটে তাদের নিয়তিতাড়িত মূর্খ ছাড়া আর কিই বা বলা যায়।

আর তা ছাড়া ব্যাপারটা যে কত বড় অকৃতজ্ঞতার তা কল্পনায় ভাবতেও কষ্ট হয় নন্দকিশোরের। সনাতন দাসের ছেলে নবীন দাস, যার অস্থি মাংস রক্ত পুষ্টিলাভ করছে নন্দকিশোরের অন্নে, আর তার কাছ থেকেই কিনা এত বড় কৃতঘ্নতা! মাথার চুল থেকে পায়ের নখ অবধি যার কৃতজ্ঞতায় বিনীত থাকার কথা তারই কি না এত বড় ঔদ্ধত্য!

ঘটনাটা ঘটবার আগেই সনাতন দাসকে ডাকিয়েছিলো নন্দকিশোর।

'কি সব শুনছি সনাতন?'

চির অভ্যাস মত দূর থেকে প্রণাম করে সনাতন বললো, 'আজ্ঞে!'

সনাতন দাস বৃদ্ধ। মাথায় চুল পাকা। সারা মুখময় খোঁচা খোঁচা সাদা দাড়ি। ভাঙ্গাচোরা মুখ। শরীর শুধুই অস্থিময়। বয়সের এই অপরাহ্নে শরীরে যে প্রশান্তি থাকার কথা সেখানে একটা জ্বালাময় রুক্ষতাই শুধু আছে।

আবাল্যের পরিচিত সনাতনকে ভালো করে এখন একবার বুঝে নিতে চাইলো নন্দকিশোর। কৃতঘ্নতার বিষ এই মরণোন্মুখ বৃদ্ধের মধ্যেও কতখানি কাজ করছে তাকে সঠিক পরিমাপ করতে।

'তুমি কিছু জানো না?'

'আজ্ঞে না।'

একটু কাল গম্ভীর মুখে চুপ করে থাকলো নন্দকিশোর। সম্ভবতঃ ভেবে নিলো কেমন করে প্রসঙ্গটা উত্থাপন করলে এই বৃদ্ধের কাছ থেকে তার মনের উদ্বেগ এবং ভয়টাকে আড়াল করা যায়।

'ছেলের মতিগতির খবর রাখো কিছু?'

'আজ্ঞে, তেমন কিছু তো নজরে পড়েনি।'

'তোমার নজর এখন আর ঠিক নেই সনাতন।'

'আজ্ঞে, তা হবে। বয়স তো কম হলো না। আর টাকা পয়সার অভাবে

চোখের ছানিটাও কাটতে পারছি না। নজরের বেশ গোলমাল হয়েছে বটে।

সনাতনের কথায় বেশ আশ্চর্য হলো নন্দকিশোর। তাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটানা এতগুলি কথা কোনদিন বলতে পারেনি সনাতন। পাঁচটা কথা বলতে দশবার হোঁচট খেয়েছে। বেশ অবাক বোধ করলো নন্দকিশোর।

গলাটাকে যথাসাধ্য ভারী করে বললো, 'আমি সে নজরের কথা বলিনি সনাতন। ছেলে আজকাল কি করে না করে তার হদিশ রাখো ?

'আজ্ঞে, বাইরে কি করে না করে, জোয়ান সমর্থ ছেলে, তার খবর আর আমি বুড়ো মানুষ কেমন করে রাখবো! তবে আপনাদের চরণ সেবার পুণ্যফলে আমার ঘরে অবাধ্য নয়।'

ছেলের জন্য সনাতনের গৌরব অগৌরবে নন্দকিশোরের অবশ্য কিছু আসে যায় না। কিন্তু যে অগৌরবজনক কাজের মতলবটা তলে তলে নবীন ভাবছে, তার ক্ষতির দায়টা তো এসে বাজছে নন্দকিশোরের গায়ে। না, না এত বড় ক্ষতি প্রাণ থাকতে নন্দকিশোর মেনে নিতে পারে না। এই দুঃসাহসের মূলোচ্ছেদ করে দিতে না পারলে বাড়তে বাড়তে তা একদিন অনেক দূর গড়াবে।

আর ছেলের কাজকারবারের পিছনে যে সনাতনের সায় আছে তা বুঝতে এখন আর কোন অসুবিধা হচ্ছে না নন্দকিশোরের। এই অকৃতজ্ঞ বৃদ্ধের মুখোমুখি দাঁড়াতে রীতিমত ঘৃণাবোধ করছে নন্দকিশোর। তার পিতৃদেব ব্রজকিশোরের ক্ষমা না পেলে অনেকদিন আগেই সনাতনকে পরিবার পরিজন নিয়ে ভিটে-মাটি হারিয়ে পথের ভিখারী হতে হতো। আর সেই সনাতন কিনা তলে তলে তার এত বড় শত্রুতার সামিল হয়েছে।

গলাটাকে রীতিমত প্রভুর মত করে নন্দকিশোর ডাকলো, 'সনাতন!'

'আজ্ঞে!' বিনীতই মনে হলো সনাতনের গলা।

'আমরা যে বৈষ্ণব পরিবার সেটা তুমি নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি ?

'আজ্ঞে, এ তল্লাটে সেটা ভুলবে কে ?

'ক্ষমাই তো বৈষ্ণবের ধর্ম, সনাতন ?'

সনাতন মাথা নিচু করে বসে থাকলো। বৃদ্ধ বুঝে উঠতে পারলো না, চৌধুরীমশায় ঠিক কি বলতে চাইছেন। দশ গাঁয়ের গরীব মানুষের সঙ্গে মিলে মিশে তার ছেলে নবীন যা করতে চলেছে তার খবর যে সে কিছু কিছু

রাখে না তাও নয়। সেজন্য ভয়ও আছে তার। কিন্তু তবুও তার সব খোয়ানো বৃদ্ধ বুকের হাহাকারের মধ্যে একটা ক্ষীণ আশা যেন মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে।

এসব নিয়ে অনেক কথাও হয়েছে তার ছেলের সঙ্গে। মতান্তর অবধি।

'এ সব ঠিক নয় নবীন। আমাদের কপালের ফের খণ্ডাবে কে?'

'তুমি কপাল কপাল করো না তো বাবা, শুনলে আমার রাগ হয়। একজন মেরে মেরে তোমার কপাল ভাঙবে আর তুমি সেই ভাঙা কপাল চেপে ধরে বলবে, কপালের দোষ খণ্ডাবে কে!'

নবীনের কথাগুলি কেমন অচেনা। ভয় ভয়ও লাগে। তবু আজকাল নবীনের কথা শুনতে ভালো লাগে তার। নবীনকে সে লেখাপড়া শেখায়নি। সে সঙ্গতিও নেই। তবু কি সুন্দর বাবুদের ঘরের লেখাপড়া জানা ছেলেদের মত কথা বলে নবীন।

'কিন্তু সেজন্য এ-ভাবে কপাল ফিরাতে হবে?'

গলার জোর দিয়ে নবীন বললো, 'হ্যাঁ। ঠিক যেভাবে কপাল ভেঙে ছিলো, সেইভাবেই কপাল জুড়তে হবে।'

নবীন এত ভালো ভালো কথা বলে সনাতনের আবার কেমনও লাগে। ইস্কুল কলেজে না পড়ে এত ভালো কথা বলা কি উচিত! ছেলেটা যে কোথায় যায়, কার কাছে এসব শেখে কে জানে। কেমন করে যে দিনকাল পালটে যাচ্ছে সে বুঝতে পারছে না। পাল্টানো দিনের গনগনে তাতটা এসে মাঝে মাঝে গায়ে সেঁকা দিচ্ছে।

'কিন্তু এতো বেআইনী কাজ।'

'সারাটা গাঁয়ের এতগুলি মানুষের মধ্যে সত্যি সত্যি একমাত্র চৌধুরীদের কাজে লাগে বলেই ঐটে আমরা ভাঙবো'। নতুন আইন বানাবো আমরা। ছেলের উপর রাগ হয় সনাতনের। চেঁচিয়ে বলে, 'চাষার ছেলে চাষা, হদ্দ মুখ্যু, তুই অত বড় বড় কথা শিখলি কোথা থেকে রে! আইন বানানেওলা এলেন উনি। আইন যেন ইচ্ছে করলেই মানুষ বানাতে পারে। ছেলের হাতের মোয়া!' নবীনের গলাও কিছু উঁচু পর্দায় উঠে যায়।

'একটা বলদ কেনার টাকা ধার নিয়ে তোমার পাঁচ পাঁচ বিঘা জমি চৌধুরীদের হাতে চলে যায় কোন আইনে? তা হলে সেই আইনটা কি তোমার জন্যে?'

'সে তো তোদের জন্যে? তোদের এক গোষ্ঠীর পেট ভরাতে গিয়ে জমি জিরেত সব খুইয়ে হাত পা ধুয়ে নামেই শুধু চাষা! রাক্ষুসে গোষ্ঠীর পেট—'

বলতে বলতে ক্ষোভে দুঃখে গলা বুজে আসে সনাতনের। আর কথা বলতে পারে না। গলা দিয়ে একটা ঘড়ঘড় আওয়াজ হয়। পোড়া চোখ ফেটে জল আসে জোয়ারের মত। আস্তে আস্তে সরে যায় নবীন। এখন আর বাপের সঙ্গে কথা বলা যাবে না। জমির কথা উঠলেই কেঁদে কেটে একাকার কাণ্ড করে তার বাপ। বাপের যন্ত্রণা, বাপের ভয় দুটোই বুঝতে পারে নবীন।

আর নবীন চোখের আড়াল হলেই শিরা-ওঠা ফাটা হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে সনাতন ভাবে, ছেলেকে অমন রেগে মেগে কথা না বলাই উচিত ছিলো তার। আর কেন যে ছাই কাঁদে। সে কি ছেলের কথায়, নাকি জমি খোয়ানোর দুঃখে? কি জানি!

তবে দক্ষিণের বিলের ধারের সেই পাঁচ বিঘা জমি খোয়ানোর দুঃখ মরলেও কোনদিন ভুলবে না সনাতন।

সনাতনকে চুপ করে থাকতে দেখে নন্দকিশোর আবার জিজ্ঞাসা করলো 'কই, জবাব দাও সনাতন, ক্ষমাই তো বৈষ্ণবের ধর্ম?'

সনাতন এবারেও চুপ করে থাকলো।

'আমার বাবা তোমাকে ক্ষমা করে অন্যায় করেছিলেন, না?' গলা ক্রমশই রুষ্ট হয়ে উঠলো নন্দকিশোরের। 'আমার বাবা আদালতের ডিক্রী জারী করলে তোমার অত বড় দেনা শুধু পাঁচ বিঘে জমিতে শোধ হতো না, ভিটে মাটিতে টান পড়তো। তা তিনি তোমার ভিটে মাটি ছাড় দিয়ে বৈষ্ণবের মত কাজ করেননি, না?'

সনাতন এবারও কোন উত্তর করলো না। সে অনুভব করলো, মরা শরীরের গভীর থেকে একটা ঢেউ আসছে। যে কোন প্রসঙ্গেই ঐ পাঁচ বিঘে জমির কথা উঠলেই তার এমন হয়। দক্ষিণের বিলের ধারের ঐ জমিটুকুই তার শেষ সম্বল ছিল। বিলের জলের সেঁচে সোনা ফলতো জমিতে।

বৃদ্ধকে চুপ করে থাকতে দেখে রিপুর তাড়না মুক্ত পরম বৈষ্ণব নন্দকিশোরের সাত্ত্বিক শরীরের মধ্যে একটা রাগ যেন কোথা থেকে রি-রি করে উঠলো। প্রায় চিৎকার করে নন্দকিশোর বললো, 'ছেলেকে সমঝে দিয়ো সনাতন, একদল

ছোটলোককে ফুসলিয়ে নিয়ে আমার জমির ত্রিসীমানায় যেন না ঘেঁসে। ফল খুব খারাপ হবে। বৈষ্ণব বলে ডাকাতকে ক্ষমা করবো না।

সনাতনের ভিতরের ঠেলা ওঠা ঢেউটা যেন হঠাৎ বাঁধ ভাঙ্গা হয়ে গেলো। আকস্মিকভাবে নন্দকিশোরকে চমকে দিয়ে হাত-পা ছুঁড়ে চেঁচিয়ে উঠলো সনাতন, 'কিন্তু একটা বলদ কেনার টাকা—'

তারপর হঠাৎ থেমে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো। কান্না ভাঙ্গা গলায় বললো, 'আজ্ঞে, ছেলেকে আমি নিশ্চয়ই সমঝে দেবো। নিশ্চয়ই –'

কাঁপতে কাঁপতে রোদের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলে গেলো সনাতন। সে কি রাগে, ঘৃণায়, না দুঃখে, কে জানে।

অবশেষে ওটা পাওয়া গেলো।

ঘটনাটা ঘটে যাবার পর এই আট ন' মাস বড় অস্বস্তিতে কাটিয়েছে নন্দকিশোর। দিনে রাতে ঘুম হয়নি। একটু হৈচৈ কানে এলেই লাফিয়ে লাফিয়ে উঠেছে। ছুটে গেছে ছাদে। চোখের উপর হাত রেখে ফাঁকা মাঠের যতদূর দৃষ্টি চলে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে, কোথাও ঝাঁকে ঝাঁকে দল বাঁধা রিপুর তাড়নায় ছুটে আসা মানুষগুলিকে দেখা যায় কিনা। আর ফাঁকা ফাঁকা অসহায় লেগেছে। নেই, হাতের কাছে ওটা নেই।

গোঁসাই একবার তাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'বলো তো, পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা কঠিন কাজটি কি ?'

নন্দকিশোরের মাথায় হাজার হাজার কঠিন কাজ ভিড় করে এলো। ঠিক বুঝে উঠতে পারলো না কোনটি বলা সঠিক হবে।

প্রসন্ন মুখমণ্ডলের উপর স্মিত হেসে গোঁসাই বললেন, 'পারলে না তো। তারপর চোখ বুজে ধ্যানমগ্ন কণ্ঠে বললেন, স্বধর্মে স্থিত থাকাটাই সর্বাপেক্ষা কঠিন কাজ। এই দেখো না কেন, তুমি পরম বৈষ্ণব, তোমাকে স্বধর্মচ্যুত করার জন্য রিপুময় মানুষদের প্রচেষ্টার অন্ত নেই।'

গোঁসাই অন্তর্যামী। তিনি যেন আঁচ করতে পেরেছেন তার সংকট কিভাবে এগিয়ে আসছে। বিনয়কাতর কণ্ঠে নন্দকিশোর বললো, 'ঈর্ষাকাতর মানুষেরা আমার জমিজমা জবরদখলের ভয় দেখাচ্ছে, গুরুদেব।'

গোঁসাই একটু ব্যথিত হাসলেন।

'এ শুধু তোমার একার সমস্যা নয়, নন্দ ! এই এক দূষিত বাতাস বইছে এখন সর্বত্র।'

আকুল কণ্ঠে নন্দকিশোর বললো, 'এ ক্ষেত্রে আমার কর্তব্য কি ?'

গোঁসাই চোখ বুজলেন। নিজের অন্তরে ডুবে তিনি অন্তর্যামী হবেন। আকুল আগ্রহে নন্দকিশোর অপেক্ষা করতে লাগলো।

গোঁসাই চোখ খুললেন।

'নন্দ, ধর তোমার এক ছটাকও বিষয় নেই।'

হতচকিত নন্দকিশোর বললো, 'আজ্ঞে, সে কি করে হবে !'

নন্দকিশোরের বালকসুলভ উদ্বেগ প্রত্যক্ষ করে গোঁসাই হাসলেন। বললেন, 'আমি তোমাকে শুধু ধরতে বলেছি। ধর, যদি এক ছটাকও বিষয় না থাকে, তা হলে ?'

তা হলে কি হবে, সেই শূন্যতার ভয়াবহ কথা কল্পনা করে নন্দকিশোর শোকাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে গোঁসাই এর দিকে তাকালো।

আবার চোখ বুজলেন গোঁসাই।

'তা হলে এই দেবসেবা, নিঃস্ব দুঃখীদের দান ধ্যান, দাতব্য চিকিৎসালয়, বৈষ্ণব সেবা, অনাথ আত্মীয়স্বজন প্রতিপালন, এসব কি তুমি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে ?

'আজ্ঞে না।'—বিমূঢ় নন্দকিশোর জবাব দিলো।

'তা হলে এক্ষেত্রে তোমার ধর্মরক্ষা আর বিষয় রক্ষা একীভূত হয়ে গেলো।'

নন্দকিশোরের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

'সুতরাং বিষয় রক্ষার জন্য যে কোন উপায় তুমি অবলম্বন করতে পারো। তাতে তোমার ধর্মহানি হবে না।'

নন্দকিশোরের মুখ দিয়ে কোন বাক্ নিষ্পত্তি হলো না। শুধু কণ্ঠনালী থেকে একটা আঁ আঁ শব্দ বেরিয়ে এলো। সর্বাঙ্গে পুলকাবেশ নিয়ে সটান গুরুদেবের পায়ের উপর পড়ে গেলো নন্দকিশোর।

কত বড় পাপবোধ আর দ্বন্দ্ব থেকে যে গুরুদেব তাকে রক্ষা করেছেন, তার বুঝি কোন তুলনা হয় না। সে জন্যই সেদিন নির্ভাবনায় গুলি চালাতে পেরেছে নন্দকিশোর। তার ইচ্ছে ছিলো, কৃতঘ্ন নবীনের দেহটাকে মাঠের উপর শুইয়ে দেবার। কিন্তু সেটাকে বন্দুকের পাল্লার মধ্যে পাওয়া যায়নি। তা হলেও বেশ

কয়েকজনকে সেদিন জখম করেছে নন্দকিশোর। অন্যের জমির উপর হানাদারীর ফলটা হাতে হাতে দিয়ে দিয়েছে। এতটুকু অনুশোচনা বোধ করেনি নন্দকিশোর। যদিও কিছু জমি হাত ছাড়া হয়ে যাবার শোকটা তার বুকের সঙ্গে লেপটে আছে, তথাপি ওদের সমঝে দেবার তৃপ্তিটা তাকে বেশ আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

গোঁসাই তাকে দ্বন্দ্ব মুক্ত করেছেন। অকারণ অনুশোচনার হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। বিষয়রক্ষা আর ধর্মরক্ষাকে একটি বিন্দুতে মিলিয়ে দিয়েছেন। অন্যথায় সে যে কত বড় বৈষ্ণব তার প্রমাণ এ তল্লাটে কেনা জানে। সে বারের সেই ঘটনাটা তাকে কি কম অনুশোচনায় দগ্ধ করেছে।

ব্যাপারটা ঘটিয়েছিলো ছোট ছেলে কল্যাণকিশোর। তিন ছেলের মধ্যে ছোটটিকেই সে শহরে রেখে লেখাপড়া শেখাচ্ছে। কেননা দিনকাল পালটে অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। পাল্টানো দিনকালের সঙ্গে একটা ছেলে অন্তত পরিচয় রাখুক। ছোট ছেলে কল্যাণকিশোরকে দিয়ে শহরে একটা ব্যবসাবাণিজ্য ফাঁদবার ইচ্ছে আছে তার। সেই ভাবেই তাকে গড়ে তুলবার জন্য শহরে রেখে পড়াশুনা করানো।

বন্ধু বান্ধব নিয়ে বেড়াতে এসে সকলের অজান্তে দক্ষিণের বিল থেকে গাদা খানেক বেলে হাঁস মেরে নিয়ে এলো কল্যাণকিশোর।

মৃত রক্তমাখা হাঁসগুলির দিকে তাকিয়ে রক্তের মধ্যে একটা তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করলো নন্দকিশোর।

'এ তুই কী করেছিস্ কল্যাণ!'

বন্ধুদের সামনে বাপের এই পুরোনো ছিঁচ কাঁদুনে ঢঙে ভীষণ অসম্মান বোধ করলো কল্যাণ। রুষ্ট গলায় বললো, 'কেন, বাড়ীর কেউ মাংস খায় না বলে আমার বন্ধুরা, আমি, কেউ মাংস খাবো না?'

'ছি ছি ছি'—শরীর কাঁপতে লাগলো নন্দকিশোরের। সোজা চোখের ভিতর থেকে ঝর ঝর করে চোখের জল নেমে এলো দুই গাল প্লাবিত করে। 'তুই কি ভুলে গেছিস্, আমাদের পরিবারে জীবহত্যা গুরুতর পাপ!'

বন্ধুদের সামনে ভয়ানক বেকায়দায় পড়ে গেলো কল্যাণকিশোর। বাবা কাঁদছে, মা কাঁদছে, পিসীমা কাঁদছে, আরো দু-তিনটি সধবা বিধবা, সকলের সঙ্গে সম্পর্কগুলিও ঠিক জানেনা সে, তারা কাঁদছে, দুটো ধুমসো ধুমসো হাক,

চাষা দাদা কাঁদছে। সে একটা কাণ্ড বটে। বন্ধুবান্ধবরা হতচকিতভাবে পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে। কল্যাণও কিছুটা হতবুদ্ধি হয়ে গেলো। সে বলতে গেলে প্রায় ছোটবেলা থেকেই তাদের পরিবারের প্রাত্যহিক আচার আচরণের প্রভাবের বাইরে। শহরের বন্ধুদের সামনে এই ধরনের বেইজ্জতে ভয়ানক রাগ চড়ে গেলো কল্যাণকিশোরের।

'ধুত্তোর!'—হাঁসগুলিকে টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিলো বাইরে। গলাটা বেশ চড়িয়ে বললো, 'বছরে কত লোককে ভিটে ছাড়াচ্ছে ঠিক নেই, কত লোকের ঠেঙিয়ে মাথা ফাটাচ্ছে ঠিক নেই, কটা পাখির জন্য ছিঁচ কাঁদুনী—যত সব লোক দেখানো ঢঙ।

বন্ধুদের নিয়ে দুমদাম করে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেলো কল্যাণ-কিশোর। ছেলের কথায় দুঃখের চাইতেও বেশী দুশ্চিন্তা বোধ করলো নন্দ-কিশোর। ছেলেটির মধ্যে তামসিক শক্তির প্রভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। গোঁসাইর কাছে তাড়াতাড়ি একটা দীক্ষার ব্যবস্থা করিয়ে দিতে হবে ওর। ছেলের জীবহত্যার পাপস্খালন করার জন্য সস্ত্রীক নন্দকিশোর উপবাস করলো। সারাটা দিন যুগলকিশোরের মন্দিরেই কাটলো তার। রাতে পাঁচজন বৈষ্ণব সেবা করিয়ে তবেই অন্নজল স্পর্শ করলো স্বামী স্ত্রী।

ছেলেটার জন্য বড় দুশ্চিন্তা হচ্ছে। তাদের বংশের এত বড় দানধ্যান ছেলেটার নজরে এলো না। বিষয়রক্ষা তথা ধর্মরক্ষার জন্য তার যে কঠোরতা সেটাকেই কল্যাণ বড় করে দেখলো। শহরে রেখে যে ওকে মানুষ করানো হচ্ছে, যখন যা চাইছে পাচ্ছে, এসবের রসদ আসছে কোথা থেকে সে হিসাব করে কি ও। এ ও এক ধরনের অকৃতজ্ঞতা।

ক্রমশই বড় অসন্তোষ বোধ জমা হচ্ছে নন্দকিশোরের মধ্যে। চতুর্দিকেই যেন অকৃতজ্ঞতা ভীড় করে আছে। যারা তার দুয়ারে এসে হাত পেতে দাঁড়াতো, তারাই রাতারাতি সেই হাতে লাঠি নিয়ে তার জমির উপর এসে দাঁড়িয়েছে! আজ তার বিষয় এবং ধর্ম বিপন্ন হবার মুখে। যত সব অকৃতজ্ঞ ছোটলোকের দল।

আর থানার দারোগাটাই কি কম অকৃতজ্ঞ। হামলা হলো আমার বাড়ীতে, আর সিজ্‌ করে নিলো আমার বন্দুকটাই। নন্দকিশোর অবশ্য এ নিয়ে কড়া কড়া কথা শোনাতে ছাড়েনি।

'কোন যুক্তিতে আপনি আমার বন্দুকটা সিজ্ করলেন? অতগুলি হিংস্র জানোয়ারের মুখে আমার বিষয় সম্পত্তি, আমার পরিবারের এতগুলি প্রাণকে আপনি নিরস্ত্র করে রেখে এলেন?'

থানার দারোগা অর্থাৎ ও সি. জবাব দিলো, 'আপনি অকারণে আমার উপর রাগ করছেন। মাঠে গুলি চালাবার পর হাজার পাঁচেক লোক আপনার বাড়ী ঘেরাও করে ফেলেছিলো। সেদিন যে আপনার আরো বড় ক্ষতি হতে না দিয়ে, আপনাকে অ্যারেস্ট না করে শুধু বন্দুকটা নিয়ে এসে অত বড় রাগী মবকে হটিয়ে দিতে পেরেছি, সেজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন।'

উদ্বেগাকুল গলায় নন্দকিশোর বললো, 'পরমবৈষ্ণব হওয়া সত্বেও, আজ আমার ধর্মরক্ষার জন্যই অস্ত্র কাছে রাখা প্রয়োজন।'

'সেটা তো আমি বুঝেছি, কিন্তু এই সরকারের পলিসি যে অন্যরকম। শুধু কি আপনার, গোপালপুরের গগনবাবুদের, মাঝদির অনন্ত সরকারের কাঞ্চননগরের মুখুজ্জেদের, সকলেরই বন্দুক সিজ্ড।' তারপর একটু থেমে খুব গোপন খবর দেবার ভঙ্গিতে বললো, 'ভাববেন না, এই সরকার আর বেশী দিন নেই। হয়ে এসেছে। তখন বন্দুক ফিরে পেতে দেরী লাগবে না। আর এটাও দেখবেন, আমরা খুব একটা অকৃতজ্ঞ নই।'

তবুও হাতে না পেতে পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারেনি নন্দকিশোর। দিনে রাতে ঘুম হয়নি। চমকে চমকে উঠে ছাদে গেছে। চারদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে। আর অধীর অপেক্ষা করেছে। কত দিন বাকী, কত দিন!

অবশেষে সরকার ভেঙ্গে গেল এবং বন্দুকটাও ফিরে পাওয়া গেল। গৃহত্যাগী পুত্রকে ফিরে পাবার মত অপত্যস্নেহে ওটাকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরলো নন্দকিশোর। দীর্ঘ আট ন' মাস বাদে এই প্রথম সে একটু মুক্তির নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করলো। আর একটু মুক্তি বাকী আছে। দক্ষিণের বিলের ধারে তার স্ত্রীর নামের যে জমিটা বেদখল হয়ে গেছে, বর্ষার মরশুমের আগেই সেটা ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে হবে।

যুগলকিশোরের মন্দিরের বাঁধানো চত্বরে এসে বসলো নন্দকিশোর, চতুর্দিকে আমজামের স্নিগ্ধছায়া। পড়ন্তবেলায় গাছে গাছে পাখি ডাকছে। সামনে টলটলে পুকুরের জলে কয়েকটি হাঁস ভেসে বেড়াচ্ছে। ক্রমশই নন্দকিশোরের মন পবিত্র ভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে উঠলো। চোখের জলে দুই গাল

খুয়ে যেতে লাগলো। জীবজগতের জন্য বড মায়া বোধ করতে লাগলো নন্দকিশোর।

আহা, সব যদি এমনি অহিংস প্রেমময় হয়ে উঠতো। লোভ হিংসা, ক্রোধ মানুষের সত্তাকে খণ্ড খণ্ড করছে। বড বেশী বিষাক্ত হাওয়া বইছে।

গোঁসাইর কথা স্মরণে এলো।

'তোমার ধর্মরক্ষা আর বিষয়রক্ষা একীভূত হয়ে গেছে।' মনে মনে ধর্মরক্ষা তথা বিষয়রক্ষার জন্য একটা কঠোর প্রতিজ্ঞা করে পরম বৈষ্ণব নন্দকিশোর এই শান্ত সুন্দর পরিবেশে দুই চোখের পাতা এক করে যেন ধ্যানস্থ হলো।

প্রতিদ্বন্দ্বী

এমনিতেই রাসুর আজ বাৎসরিক মনখারাপের দিন, তদুপরি ধানকলে পা দিয়েই তার মেজাজ বাঁশের ডগায় চেপে গেলো। শালা, যেদিকে তোমার দৃষ্টি ফেরানো থাকবে সেই দিকেই অন্ধকার। সে প্রায় ডাকাত-পড়া গলায় হাঁকড়ে উঠলো, 'এ্যাই শালা কানা কেষ্টা! কাজের ভাতার!'

থাক দিয়ে রাখা খান বিশেক ধানের বস্তার আড়াল থেকে কানা কেষ্টা মুখ বার করলো। তার চোখ মোটে একটা। আর সেই এক চোখেই সে দুনিয়ার তাবৎ দৃশ্য, ঘটনা এবং মানুষকে দুবেলা এফোঁড় ওফোঁড় করে। পলক তাকিয়েই সে বুঝে নেয় মালিকের মেজাজ আজ পাগলা ষাঁড়। সে মোলায়েম গলায় সাড়া দেয়, 'যাই আজ্ঞে!'

—আহা-হা প্রাণ জুড়িয়ে গেলো আমার!

ধানের বস্তার আড়াল থেকে অল্প অপরাধীর মত এক পা দু পা করে কানা কেষ্টা সামনে বেরিয়ে এলো।

'মেশিন চালু করিসনি কেন এখনো? কাল ডেলিভারি দেবো আমার মুণ্ডু! ইদ্রিস কোথায়?

—ডিজেলের খোঁজে গেছে।

—নাকি ধেনো টেনে কাঠের পুলের তলায় পড়ে আছে? শালা যত্ত মাতাল আর গেঁজাড়ু নিয়ে আমার কারবার হয়েছে।

কানা কেষ্টা বুঝলো শেষ বিশেষণটা তার দিকে লক্ষ করেই ছোড়া। সে গলায় বিনয় বসিয়ে বলে, 'আজ্ঞে না, সত্যি সত্যি ডিজেলের খোঁজে গেছে। না পেলে মেশিন চালু করা যাবে না।'

দাঁত মুখ খিঁচিয়ে রাসু বললো, ডিজেল নেই ,আমাকে শনিবার বলতে কি

হয়েছিলো ? যত্ত সব ! কাল বিশ কুইন্টাল মাল ডেলিভারি দেবার কথা। শালা ইজ্জৎ থাকবে আমার !'

যেন ডিজেল না পাবার অপরাধটা তার নিজের, এমন একটা মুখভঙ্গি করে কানা কেষ্টা মালিকের তেলচিটে ময়লা গদী, কাঠেরহাত বাক্সে ঝাড়পোঁছ করতে লেগে গেলো। পেছনের জানলাটাও শেকল নামিয়ে খুলে দিলো। খোলা জানলা দিয়ে খানিক সময় তাকিয়ে থেকে রাম্বর মেজাজে আবার নতুন করে আগুনের তাত পড়লো।

সে চিড়বিড়িয়ে উঠলো, এ আপদ আবার কোত্থেকে জুটলো এখানে ! ব্যাপারটা কানা কেষ্টার জানা ! তড়িঘড়ি জানলাটা খোলার পেছনে তার কিচলেমি বুদ্ধিটা হলো যাতে রাম্বর চোখ ঐ আপদের দিকে ফেরে। এতে দুটো কাজ হবে। রাম্বর মেজাজ খারাপের প্রসঙ্গ পালটাবে আর তার বাৎসরিক মন খারাপের কারণটার ওপর একটা হুলও ফোটানো হবে।

সে মুখে বললো, 'আজ্ঞে কাল রাত থেকে এসে জুটেছে।'

-- তাড়াসনি এখনো।

—আজ্ঞে কি করে তাড়াবো ?

-- তুই আজ্ঞে ফাজ্ঞে ছেড়ে সোজা করে বল, এখনো তাড়াসনি কেন ?

কেষ্টার একটা চোখ নেচে উঠলো। তার ভেতরটা চিরলে দেখা যেতো হাসি পাক দিচ্ছে ক্রুর মত। হুলটা তবে ঠিকই ফুটেছে। আড়ালে হলে আর ইদ্রিস থাকলে সে এখন এক পাক নেচে নিতো। রাম্বর ওপর খুব রাগ আছে তার। লোকটা তাকে অন্নের শেকলে বেঁধে রেখেছে। তা না হলে কবে মুখে একদলা থুথু ছিটিয়ে মাঠের আল ধরে হাঁটা দিতো। কিন্তু সে উপায় নেই। জীবন রক্ষা জীবের নিয়ম। আর রক্ষার ব্যবস্থাপত্র রাম্বুদের হাতে থাকলে কেষ্টারা আর স্বেচ্ছাদাস হবার হাত থেকে কি করে রেহাই পায় !

কেষ্টা বিনীত গলায় বললো, 'গাছতলাটা তো আমাদের এরিয়ার মধ্যে পড়ছে না। ওটা সরকারী জায়গা !'

—আই বাপ, তুই কি সদরে ওকালতির খাতায় নাম লিখিয়েছিস নাকি ! গরম চোখ কপালে তুলে রাম্বু বলে, 'মেরে তাড়াতে পারিসনি ?'

—আজ্ঞে মেয়েছেলে যে।

রাম্বু খুবই বিরক্তি বোধ করে। ভালো আপদ এসে জুটলো তার চোখের

সামনে। অষ্টপ্রহর এগুলি চোখের কোলে বসে থাকবে। আর রাসুর বাৎসরিক মন খারাপটা প্রাত্যহিক মন খারাপে গিয়ে দাঁড়াবে। তার বাৎসরিক মন খারাপের ঠিক বিপরীত চিত্র বলেই সব সময় কাঁটা খচখচাবে রাসুর মনে। না না, যেমন করেই হোক তাড়াতে হবে মাগীটাকে। গোটা আট দশেক ছাওপনা নিয়ে কি রকম জাঁকিয়ে বসেছে গাছতলাটায়। ইট বসিয়ে উনুনও পেতেছে দেখছি। কটা তলকেলো মাটির হাঁড়িও গলায় দড়ি দেবার মত করে ঝুলছে গাছের নীচু ডাল থেকে। ছাওপনা কটা এদিক ওদিক ধুলোয় খেলছে। রাসু চোখ দিয়ে গোনার চেষ্টা করলো। সাতটা। দুএকটা আরো আরো এদিক সেদিক থাকতেও পারে। বুকের ভেতর থেকে হুস্ করে খানিক বাতাস ছাড়লো রাসু।

তার বউটা? প্রতি বছর একটা করে বিয়োচ্ছে, কিন্তু মরা। সুতরাং বছরে ঐ একটা দিন রাসুর বিশেষ মন খারাপ হয়। বংশ রক্ষার চিন্তা তাকে ঘণ্টা কয়েক কব্জা করে রাখে। তারপর যে কে সেই। বিষয় তাকে বিষয়াস্তরিত করে। সংসারে ভালোবাসার একটাই বস্তু আছে। সেটা হলো বিষয়। দেখে শুনে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, বাড়িয়ে যে কি সুখ তা রাসু রক্তে রক্তে জানে। সুতরাং বংশ রক্ষার চিন্তা বেশীক্ষণ রাসুর মনে দখল রাখতে পারে না।

ডাক্তার দেখিয়ে চিকিচ্ছেপত্র করাবার কথা তার মাঝে মধ্যে মনে হতো। কিন্তু সেই বিপজ্জনক চিন্তা রাসু অচিরেই তাড়িয়েছে। মৃত সন্তানের কারণ স্বরূপ ডাক্তারের আঙ্গুলটা তার দিকেই উঠবে সে জানে। মত্ত যৌবনের সদাচার রাসুর মধ্যে যে কিছু নষ্ট বীজমন্ত্র রেখে গেছে এতে কোন সন্দেহ নেই। রাসুর অক্ষমতা বউয়ের কাছে ফাঁস হয়ে গেলে আর রক্ষা নেই। বউ তার একে খাণ্ডারনী, তার ওপর অপুত্রক জোতদার সুরথ সামন্তর মেয়ে। কাজে কাজেই রাসু পুত্র কামনায় বউকে দিয়ে দান্‌শাফকিরের পিপুলগাছের ডালে লাল ন্যাকড়া দিয়ে ঢিল ঝুলিয়েছে, সতীমায়ের থানের ধুলোয় কবচ ঝুলিয়েছে, গুচ্ছের তুক তাক ঝাড়ফুঁক করিয়েছে বউকে, কিন্তু ভুলেও কখনো ডাক্তারের ত্রিসীমানায় ঘেঁসেনি।

এই একটা মৌলিক কারণ দেখিয়েই রাসু তার খাণ্ডারনী বউকে জব্দ করে রেখেছে। যে নারী বংশের ধারাবাহিকতা রক্ষায় অক্ষম, সংসারে তার আসন তো সর্বক্ষণই নড়চড়ে। বউকে এই নড়চড়ে আসনে বসিয়ে রেখে রাসু তার ক্রিয়া কর্ম চালিয়ে যায়।

কোন সঙ্গত কারণে বউ ফোঁস করলেই রাস্থ একটা বড় করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, 'আমার আর কি ! একটা ছেলে নেই পুলে নেই !'

বউয়ের দুর্বলতম জায়গায় কাঁটাটি বিঁধিয়ে দিয়ে সে আড় চোখে তাকায়। জোঁকের মুখে নুনের মত কাজ হয়। বউয়ের রণরঙ্গিণী মূর্তিটা মুহূর্তে ভিজে ন্যাতার মত মিইয়ে যায়। ঠোঁটের নীচে বিজয়ীর হাসি চেপে রেখে রাস্থ নিজের কর্মে ফেরে।

কিন্তু তাই বলে কি সন্তানের বাপ হবার ইচ্ছে নেই রাস্থর ? খুবই আছে। তাই ইচ্ছের সঙ্গে নিজের অক্ষমতার যে বিরোধ সেই বিরোধ থেকেই রাস্থর মধ্যে কিছু মানসিক ভারসাম্যের অভাব ঘটেছে। রাস্থর পঞ্চভূতের শরীরে যে রিপু সমূহ তার মধ্যে বাছাই করা দু তিনটি একেবারে উগ্রচণ্ডা হয়ে উঠেছে। কাম ক্রোধ আর লোভে রাস্থ প্রায় জর্জরিত।

একে সে পিতৃ সূত্রে সম্পদশালী, উপরন্তু নিজেও করিতকর্মা। বাপের রেখে যাওয়া বাড়ন্ত চন্দ্রকলাকে সে ক্রমাগত পূর্ণিমার দিকেই নিয়ে চলেছে। এ হেন রাস্থ তিন রিপুকে দমন না করে জোগান দেবে এটাই তো স্বাভাবিক। তবে সম্প্রতি ঐ লোভ রিপুটির জোগান অব্যাহত রাখতে গিয়ে কিছু ঝামেলা ঝঞ্ঝাট পাকিয়ে উঠছে। সেই সুবাদেই ঘন ঘন সদরে যেতে হচ্ছে তাকে। উকিল, পুলিশ আর শ্বশুর সুরথ সামন্তর সঙ্গে শলা পরামর্শে তার সময় যাচ্ছে বেশী। ফলে সব দিকে নজর থাকছে না। আর নজর ছাড়া হলেই শালাদের পোয়াবারো।

তিনদিন সে নজর দিতে পারেনি। এদিকে ডিজেল নেই। মেশিন বন্ধ। ধানের বস্তা জমে পাহাড় হয়ে আছে। লোককে টাইমলি ডেলিভারি দেওয়া যাবে না। ইজ্জত নিয়ে কথা। ক্রোধ রিপুটি একেবারে তরতর করে রাস্থর মাথায় চেপে বসেছে। তার ওপর এই এক ফালতু কাঁটা এসে বিঁধে আছে চোখের ওপর। তার অক্ষমতাকে যেন ভেংচি কাটার জন্যেই মাগীটা গুচ্ছের কিলবিলে ছাওপনা নিয়ে ঘাঁটি গেড়েছে তার মুখের সামনে। রাস্থর মাথার মধ্যে একটা ছোটখাটো অগ্নিকুণ্ড জ্বলতে লাগলো।

নাঃ, এটাকে এখান থেকে হটাতেই হবে ! দুনিয়ার সব চুলো কি খতম যে এখানে এসে জুতে হবে ? আর জায়গা নেই কোথাও। মরার পক্ষে এটা কি এতই মনোরম জায়গা নাকি !

সে হাঁক পাড়লো, 'কেষ্টা !'

ধানের বস্তার আড়াল থেকে কানা কেষ্টা সাড়া দিলো, 'যাই।'

সে এতক্ষণ আড়াল থেকে সব লক্ষ করে এক চোখে হাসছিলো। মালিকের মুখের নানা বিভঙ্গ থেকে সে পড়ে নিচ্ছিলো ভেতরের কথাবার্তা। কাটা ঘায়ে লবণ মরিচের ঘাস্‌টানটা তা হলে জুতসই-ই হয়েছে। তার অক্ষম রাগ এই খাতে বইতে শুরু করলো। আহা হা ইদ্রিস থাকলে তিন চোখে এক মজা দেখা যেতো।

কানা কেষ্টা সামনে এসে দাঁড়ালো। রাসু আঙুল তুলে বললো, 'যা, শুয়োরের পাল আর মাগীটাকে যে করে হোক এখান থেকে তাড়া।'

বুকের হাসি বুকে চেপে কানা কেষ্টা বাধ্য ভঙ্গিতে বেরিয়ে গেলো।

জানলা দিয়ে রাসু নজর করলো, কেষ্টা হাত পা নেড়ে মেয়েমানুষটাকে কি সব বলছে। অঙ্গভঙ্গি দেখা ছাড়া সে তার কিছুই কানে শুনতে পেলো না।

খানিক বাদে কেষ্টা ফিরে এলো।

—কিরে, কাজ হলো ? একটা ভিকিরী মেয়েছেলে আর গণ্ডা দেড়েক বাচ্চা কাচ্চার বিষয়ে ছঁদে রাসমোহনকে বেশ উৎকন্ঠিত মনে হলো। যেন পুবের নাবাল জমিটা নিয়ে অনেকদিন লড়ালড়ির পর এখন কোর্টের রায় শুনতে চাইছে সে। বাঃ বাঃ, খেলা তা হলে ভালোই জমতে চলেছে।

কেষ্টা নিজেকে সতর্ক করলো। ভেতরে যেন ফূর্তি বইতে শুরু করেছে, বাইরে ফাঁস হয়ে গেলে বিপদ। সে অপরাধীর মত মাটির দিকে মুখ নীচু করে বললো, 'আজ্ঞে না, হলো না।'

—কেন ? প্রায় গর্জন করে উঠলো রাসু।

—আমি বলতেই মেয়েছেলেটা খেঁকিয়ে উঠলো। ভগবানের গাছতলা, আমি এখানে থেকে যাবো কেনে ? কারু ঘরকে গিচি, না কারু পাক ধান মারিয়েচি।

শুনে রাসু স্তম্ভিত। তার যে এমন নামী দামী রাগ সেটাও কেমন যেন ভোঁতা হয়ে গেলো। বলে কি মেয়েছেলেটা। চাল নেই, চুলো নেই, এঁটো শালপাতা। সে কিনা ফড়াৎ করে উড়ে এসে পড়েছে রাসমোহনের মুখে। তাকে ভগমানের গাছতলা দেখাচ্ছে। একশো বছরের ভিটে মাটি থেকে কত ভগমানের সুপুত্তুরকে সে ঘাড় ধরে রাস্তায় বার করে দিয়েছে। এখন একটা রাস্তার মেয়েমানুষ এসে তাকে অপমান।

রক্তের মধ্যে ফণা তুলে ক্রোধের কাল কেউটে ফোঁস করে উঠলো। দাঁতে দাঁত চেপে সে সটান পা ছুঁড়লো।

—শুয়োরের বাচ্চা।

লাথিটা কোমর বরাবরই লাগলো কেষ্টার। এই প্রথম একটি ব্যথা বেদনাহীন লাথি উপভোগ করলো সে। আহা, হা কাটা ঘায়ে লঙ্কা মরিচ! কম যন্ত্রণা? লাথিটা যার পা থেকে এলো তার কি এখন কম যন্ত্রণা! সুখের লাথি খেয়ে এক চোখে নিঃশব্দে হাসতে হাসতে কানা কেষ্টা ধানের বস্তার আড়ালে চলে গেলো।

গাছতলাটার দিকে রক্তচোখ মেলে বসে রইল রাসমোহন।

পরদিন রাসমোহনের চোখ উঠলো কপালে।

একি কাণ্ড। গাছতলা থেকে হটা তো দূরে থাক স্থায়ী বন্দোবস্তের একটা পরিষ্কার ইঙ্গিত তার নজরে এলো। গাছতলায় ক খানা খুঁটির মাথায় একটা টুটা ফাটা পলিথেনের সিট খাটানো। তার তলায় হাঁড়িকুড়িগুলো বেশ পরিপাটি করে গুছিয়ে রাখা। কচিকাচা কটা ধুলোঘাঁটা খেলছে। মেয়েমানুষটা নেই। চরতে বেরিয়েছে বোধ হয়।

একটানা ঝুকঝুক শব্দ ছিটিয়ে তার ধানভাঙ্গা মেশিন চলেছে। টুলের উপর ভোম মেরে বসে আছে ইদ্রিস। মেকানিক কাম অপারেটর। বাটা সাত সকালেই এক পাইট খেনো মেরে এসেছে। টেনে হিঁচড়ে একটার পর একটা তুষের বস্তা বাইরে নিয়ে যাচ্ছে কানা কেষ্টা। কলটা কাজে গতিময়। ফাঁকিতে স্থবির নয়। তার অনুপস্থিতিতে শালারা কাজ করছে। এরকম ঘটনায় রাসুর খুশি হবারই কথা। কিন্তু তার মনটা নিমতেতো হয়ে গেলো।

বেআক্কেলে দৃশ্যটা তার চোখের ওপর উদোম হয়ে আছে। কোথাকার একটা হাড় হাভাতে মেয়েছেলে গুচ্ছের ন্যাংটো প্যাংটো ছেলেপিলে নিয়ে এখানে এসে তার বুকে কাঁটা হয়ে বিঁধে আছে। তাকালেই চোখ থেকে জ্বালাটা বুকে নেমে আসছে। ছ'বছরে ছটি মৃত সন্তানের ছটি বাৎসরিক শোক এককালীন জ্বালার রূপ নিচ্ছে বুকের মধ্যে। রাসু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, যে করেই হোক আপদ কটাকে এখান থেকে তাড়াতেই হবে। পৃথিবীতে ভগমানের গাছতলা অনেক আছে, যেটার তলায় খুশি গিয়ে মরুক।

সে রাসমোহন দাস। একশো বছরের শেকড় পোঁতা গাছ উপড়ে দিলো

কত। আর এ তো একটা শেকড়-বাকড়হীন পরগাছা। কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে বেশী বাড়াবাড়ি করতে গেলে দৃষ্টিকটু হয়ে যাবে হয়তো। রাসু ঠাণ্ডা মাথায় ভাবার চেষ্টা করে। সে এ তল্লাটের নামী দামী রাসমোহন দাস। একটা ভিকিরী মেয়েছেলে আর কটা নাকে পোঁটাতোলা কাচকাচার সঙ্গে সে লড়াইয়ে নেমেছে এই কথা বাইরে ফাঁস হয়ে গেলে তার ইজ্জত ভূমিশয্যা নেবে। তাছাড়া ইদ্রিস আর কেষ্টাটা যদি তার দুর্বল জায়গাটা ধরে ফেলে তা হলেই বিপদ। ও দুটোর তো চিলের স্বভাব। ছোঁ মেরে কথা তুলে নিয়ে পাঁচ কান করে দেবে দুনিয়াভর। না, ব্যাপারটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা ঠিক হবে না।

কাল অবশ্য একটু বাড়াবাড়িই হয়ে গেছে। একে সগু বাৎসরিক শোক, এসে দেখে মেশিন বন্ধ, তার ওপর চোখ গিয়ে পড়লো ছাওপোনা শুদ্ধ, মাগীটার উপর। তখন কি আর মেজাজ বশে রাখা চলে। মাঝখান থেকে লাথি খেয়ে মরলো কানা কেষ্টা। কালকের ঘটনাটা একটু হালকা করার মানসে রাসু ডাকলো, 'কেষ্টা!'

—যাই। তুষের বস্তা রেখে কাছে এলো কেষ্টা।

—এই নে। জিলিপী নিয়ে আয়। পাঁচ টাকা তার হাতে ধরিয়ে দিলো রাসু।

—ভজনের দোকান থেকে আনবি। গরম গরম।

নোটটা তুলে কেষ্টা বললো, 'পুরোটাই?'

প্রশ্রয়ের তাচ্ছিল্যে রাসু বললো, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, পুরোটাই। তোমার তো আবার দুচার খানায় পোষাবে না।'

ইদ্রিসের দিকে এক চোখের ইঙ্গিত ছুঁড়ে দিয়ে কেষ্টা বেরিয়ে গেলো। রাসমোহন লোকটাকে সে দুচোখে দেখতে পারে না বলেই যেন তার একটা চোখ কানা হয়ে আছে। অবশ্য এই তল্লাটে এমন গরীব মানুষ কেই বা আছে, যার চোখ রাসুর দিকে প্রসন্ন? কোনো চোখে ভয়, কোনো চোখে ঘৃণা, আবার কোনো চোখ বা রাগে দবদবায়। কেউ কিছু বলতে ভরসা পায় না। কারণ জীবকে আনন্দময় করে যে অন্ন, যা সংসারের চাকা ঘুরিয়ে তাকে বহমান রাখে তার হাতলটি রাসমোহন দাসের কঠিন মুঠিতে ধরা। সেই বাঁচায় মরায়, ওঠায় নাবায়, কেনায় বেচায়। এসব নিয়ে রাসমোহনই খেলে। সে তুখোড় খেলোয়াড়। তাকে আড়ালে ডাকাত বলে সামনে মান্যি করাটাই গরীবের

দস্তুর। সেই রাসমোহনকে যে কোন বেকায়দায় দেখলেই তার প্রাণ আনন্দে নেচে ওঠে।

কেষ্টা জানে কিবছর পুত্র শোক পায় রাসমোহন। সুতরাং একগাদা জ্যান্ত ছেলেপুলে সহ মেয়েমানুষটাকে সর্বক্ষণ চোখের সামনে দেখলে তার মনের হুনছাল উঠবেই। আর এটুকু উপভোগ করেই কেষ্টা তার মনের রাগ ক্ষোভ মেটাতে চায়।

সে মনে মনে ঠিক করে মেয়েমানুষটাকে পাকাপোক্তভাবে ঐখানেই গেড়ে বসাতে হবে। অন্তত একটা জ্বালার হুল ফুটে থাক রাসমোহনের বুকের মধ্যে। জিলিপী খেতে খেতে সে একটা চোখ আধ বোজা করে ভাবে। মেয়েমানুষটাকে স্থায়ীকরণের উপায় হাতড়াতে থাকে নিজের মাথার মধ্যে।

গাছতলা থেকে গলগল করে ধুঁয়ো উঠছে। মানে উনুনে হাঁড়ি চাপালো। কচিকাঁচা কটার এতক্ষণের চেল্লাচেল্লি বন্ধ। তারা খেলা ভেঙ্গে দিয়ে উনুনে চাপা মাটির হাঁড়ির চারপাশে উদগ্রীব চোখ নিয়ে ঘিরে বসেছে। হাঁড়ির মধ্যে তাদের জন্য আর এক ম্যাজিকের খেলা। কেলো হাঁড়িটার ভেতর থেকে কখন একরাশ সাদা হাসি উথলে উঠবে সেই ম্যাজিকের জন্য উত্তেজনায় অস্থির হয়ে আছে লাংটো প্যাংটোগুলি। মেয়েমানুষটা এই খেলা বানাবার একাগ্রতায় যেন বিশ্বজগৎ ভুলে তন্ময় হয়ে আছে।

রাসমোহনের চোখ দুটো আবার জ্বালা করে উঠলো। এই আপদ বিদায় না করলেই নয়। বেশীক্ষণ সহ্য হচ্ছে না তার চোখে। দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা সুপরির কুচির মত সামান্য অথচ চূড়ান্ত বিরক্তিকর দৃশ্যটাকে অচিরাৎ ঝেড়ে ফেলা দরকার। সে নিজেকে সংযত করে শান্ত গলায় ডাকলো, 'কেষ্টা।'

—বলুন আজ্ঞে। বিনীত হাস্যে কেষ্টা সামনে এলো।

—কি করা যায় বলদিনি? বন্ধুর কাছে পরামর্শ চাইবার মত শোনালো রাসমোহনের গলা। কেষ্ট বুঝলো, পাতা নড়েছে। বাঘ এবার গুটিগুটি ফাঁদের দিকে আসছে। সে খুব বোকা বোকা মুখ করে গাছতলার দিকে আঙ্গুল তুলে বললো, ঐটের কথা বলছেন তো? রাসমোহন আপাত নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বললো, উটকো ঝামেলা জুটেছে। দেখবি, এবার ঝঞ্ঝাট হবে। চোট্টামিটি ছিঁচকেমিটি না করলে অতগুলো পেট ভরবে কিসে? আজ এটা পাবি না কাল ওটা পাবি না—ঝামেলা!

মাথা চুলকে কেষ্টা বললো, 'তা ঠিক বলেছেন।'

—সেই জন্মেই বলছি, সময় থাকতে এখনো তাড়া। দেখছিস তো কেমন কাঠি পুঁতে মাথা গোঁজার ব্যবস্থা হচ্ছে।

—আজ্ঞে, ঐ দেখেই তো সকালবেলা তেড়েফুঁড়ে গিয়েছিলাম। ইচ্ছে ছিলো লাথি মেরে সংসার পাতার দফারফা করে দিয়ে আসবো।

—তারপর? গলায় বেশ উত্তেজনা টের পাওয়া গেলো রাসমোহনের।

ভেতরে ক্রূ হাসলো কানা কেষ্টা। হায় হায়, যতই দেয়ালা করো, জ্বালা, বড় জ্বালা। চাপা থাকে না। মাথার মধ্যে গল্পটা দ্রুত গুছিয়ে নেয় কেষ্টা। গলায় রাগ আর বিরক্তি ঢেলে বললো, 'গিয়ে দেখি সনাতন পাত্র হাত নেড়ে নেড়ে মেয়েমানুষটাকে কি সব বোঝাচ্ছে।'

—সে হারামজাদা আবার ভিকিরীর আস্তানায় মাথা গলিয়েছে! বোমার আওয়াজ হলো রাসমোহনের গলায়। সে আবার রিপু তাড়িত। ক্রোধ একেবারে তরতর করে তার মাথায় চেপে বসলো। লাল আভা ছিটকে এলো চোখে।

গল্পটা ছেড়ে কানা কেষ্টা এবার আলগোছে দাঁড়ালো। সে ভালোই জানে, এই গল্পের সত্যাসত্য নির্ণয় হওয়া খুব কঠিন। রাসমোহন আর সনাতন পাত্র দুটি সমান্তরাল রেখা। স্বর্গে কিংবা নরকে কোথাও গিয়ে ও দুটো মিলবে না। কাজেই ঘটনাটা নির্জলা মিথ্যে হলেও তার কোন ভয় নেই। বরঞ্চ গোদের ওপর বিষ ফোঁড়ার মত ঘটনাটা লাগসই হয়েছে। পলতেয় আগুন দিয়ে এখন তার খালি আওয়াজ শোনার পালা। এবং শোনাও গেলো। রাসমোহন গর্জন করে বললো, হারামজাদাটা ক্ষেত মজুর ক্ষেপাচ্ছে ক্ষেপাক। সে আমি সময় মত বুঝে নেবো। কিন্তু এখানে গাছতলায়ও চিমটি কাটতে এসেছে।

ইদ্রিসকে চোখ মটকে ধানের বস্তার আড়ালে চলে গেলো কানা কেষ্টা। আওয়াজ টাওয়াজগুলো আড়াল থেকে শুনতেই মজা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আর কোন আওয়াজ এলো না।

হঠাৎ গুম মেরে গেলো রাসমোহন।

ব্যাপারটা তাকে ভাবিয়ে তুলেছে। রাসমোহনকে অপমানিত করার জন্মে গোটাটাই সনাতনের পরিকল্পনা নয় তো। কিন্তু সনাতন আর যাই করুক এমন একটা বাজে ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে আসবে এটা বিশ্বাস করা কঠিন।

এদিকে তবে সে গাছতলায় হাজির হলো কি করে ? কি করেই বা জানলো জন দেড়েক কচিকাঁচা শুদ্ধ, মেয়েছেলেটা রামমোহনের বিরক্তির কারণ হয়েছে। তাকে এখান থেকে হটাতে চাইছে রামমোহন। নাকি কানাটা ফাঁস করে দিয়ে এসেছে তার মনের ভাবটা ? অসম্ভব নয়। ডেকে ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করলে হয়। কিন্তু না, তাতে তার দুর্বলতা আরো বেশী প্রকাশ হয়ে যাবে। পচা দড়ির ফাঁসে হাসফাঁস করতে লাগলো রামমোহন। আর সেই সঙ্গে রাগও চড়ে গেলো। এই বাজে অথচ বিশ্রী ব্যাপারটায় তাকে জিততেই হবে। না জিততে পারলে সে আনন্দমোহনের ছেলে রামমোহনই নয়।

রাগের মাথায় প্রতিজ্ঞা করে আর একটা ফাঁসে আটকালো রামমোহন। ছাওপনা সমেত মেয়েছেলেটাকে কিভাবে হটানো। লোকজন ডেকে লাঠি পেটা করে কিংবা পুলিশ ডেকে তো আর একাজ করা চলে না। লোকে শুনলে হাসবে। একে ভিকিরী তায় কটা কচিকাঁচা আব একটা মেয়েছেলে। না, তাতে মান থাকবে না। তাছাড়া এ লড়াইটা তার এত ভেতরের ব্যাপার যে একে প্রকাশ্যও করা চলে না। এমন কি বউকে পর্যন্ত বলা চলে না। রাগ আব বিরক্তিতে ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগলো রামমোহনের মাথা।

আসলে কিছু ধরতে না পারলে সে টান মেরে ওপড়াবে কি করে। যা ধরা যায় না তা ওপড়াবে কি করে রামমোহন ? সে এতকাল যাদের উপড়েছে বা ওপড়াচ্ছে তাদের ধরবাব মত কারু হয়তো তিন বিঘে জমি আছে একটু ভিটে আছে অথবা দেড়শো টাকা কর্জ আছে। কিন্তু এই মেয়েছেলেটার তো এসব কিছুই নেই। এমন কি শরীরে যৌবনটা পর্যন্ত নেই। বাপ ঠাকুর্দার বয়সেও সে এমন জিনিস ওপড়াবার কথা শোনে নি। তা হলে ? তবে কি নামী দামী রামমোহন দাসকে হেরে যেতে হবে একটা ভিখমাগা হাড়হাভাতে মেয়েছেলে আর কটা কচিকাঁচার কাছে ? রামমোহনের মাথার মধ্যে যাত্রার যুদ্ধের কনসার্ট বাজতে লাগলো। সে ডিসট্রিক বোর্ডের সরল লম্বা রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে দাতে দাঁত চেপে বসে রইলো।

খানিক বাদে সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো। হয়েছে। রাস্তা মিলে গেছে। কাঁটা ফুটলে যেমন কাঁটার মত কিছু দিয়ে তুলতে হয়, এমন জিনিসকে ওপড়াতে গেলে তেমন জিনিসটাই চাই।

বেরিয়ে যেতে যেতে রামমোহন বললো, 'দেখে শুনে কাজ করিস ইদ্রিস। আমি কাল সন্ধ্যেবেলা আসবো।'

রামমোহন বেরিয়ে যেতেই কানা কেষ্টা আর ইদ্রিস হাসিতে ফেটে পড়লো। কেষ্টা বুকে হাত দিয়ে অভিনয়ের ভঙ্গিতে বললো, 'জ্বালা, বড় জ্বালা।'

আবার হাসি।

হাসি থামলে কেষ্টা আবার বললো, 'যাই. মা জননীকে খানিকটা খুদকুঁড়ো দিয়ে আসি। আর বলে আসি, মা আমরা তোমার অন্নের যোগান দেবো। তুমি কি বচ্ছর একটি করে সন্তান দাও আর রামুর বুকে জ্বলা দাও। ভগবানের গাছতলা ছেড়ে যেন এক পাও কোথাও যেও না।'

তাদের হাসির শব্দে ধানভাঙ্গা মেশিনের আওয়াজ ডুবে গেলো।

মধ্য দুপুরের রোদে গাঁয়ের শ্মশান খাঁ খাঁ করছে।

এদিক ওদিক দুএকটা পাখি ডাকছে। টুপটাপ দুএকটা পাতা খসছে। মন্দিরের পুরনো ভাঙ্গা চাতালে কড়া রোদের মধ্যে চিৎ হয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছিলো ছাগু পাগলা। রামমোহন ডাকলে, 'ছাগু, এই ছাগু।'

ঝটিতে লাফিয়ে উঠলো ছাগু। কয়েক মুহূর্ত খুব বিহ্বল ভঙ্গিতে রামমোহনের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর ভয়ার্ত ভাবে ছুটে কাল কি পরশু নিভেছে এমন একটা চিতার উপর উঠে দাঁড়িয়ে থাকলো।

রামমোহন ডাকলো, 'এদিকে আয়. কথা আছে।'

মিষ্টি মিষ্টি হেসে ছাগু বললো 'আমি এখন চিতায় উঠে গেছি। আমাকে তুমি আর কিছুই করতে পারবে না।'

রামমোহন হাসলো।

—তোকে আবার আমি কি করবো।

—হুঁ হুঁ বাবা, বিশ্বাস নেই। বিজ্ঞের মত ছাগু বললো, 'লোকে বলে তোমার বাপ নাকি আমার বাপের বারোটা বাজিয়েছিলো। আর তুমি এসেছো আমার বারোটা বাজাতে?' তারপর গলায় স্বর তুলে বললো, 'হবে না। আমি এখন চিতায় গেছি—হবে না, হবে না।'

রামমোহন রাগ চাপলো। ছাগুটা সর্বক্ষণের পাগল নয়। খানিক ভালো, খানিক পাগল। কাজটা ওকে দিয়েই করাতে হবে। ছাগু রাতের বেলা খানিক

তাণ্ডব করে এলেই ছাওপনা নিয়ে মাগীটা ভাগার রাস্তা পাবে না। আর যদি এ সবের পেছনে সনাতন থেকেও থাকে, জানবে পাগলের কাণ্ড।

পকেট থেকে বাংলা মালের বোতলটা বার করলো রাসমোহন। সামনে ধরে বললো, 'এই দেখ, তোর জন্যে কি এনেছি।'

রাসমোহন জানে, ছানু পাগল। তার ওপর আবার নেশার পাগল। ছানু চোখ বড় করে খানিক তাকিয়ে থাকলো। তারপর তিন লাফে দৌড়ে এলো। বাচ্চাদের মত দুহাত বাড়িয়ে বললো, 'দাও, দাও মাইরি।'

—দেবো। আগে শোন।

—বলো।

ছানু থপ্ করে বসলো। এখন আর তার হাবভাবে তাকে পাগল বলা যাবে না। আসলে ছানু পাগলামি আর পাগলামিহীনতার সীমারেখা ধরে টলতে টলতে হাঁটে। যখন যেদিকে টলে তখন তেমন ভাব।

সব শুনে সে বলে, 'ও, এই কাজ। সে আমি ঠিক করে দেবো। এমন পাগল নাচন নাচবো না, ও মাগী গাছতলা ছেড়ে খালের ওপারে ভেগে যাবে।'

— কাজটা ঠিক ঠাক হয়ে গেলে এরকম আরো দুটো পাবি।

বোতলটা ছানুর হাতে দিলে রাসমোহন। বোতলটা দুহাতে আঁকড়ে ধরে খানিক সময় খুব গম্ভীর মুখে দম ধরে বসে রইল ছানু। রাসমোহনের মনে হলো, পাগলটা আবার ভাবছে না তো, নামী দামী রাসমোহন দাসের সঙ্গে ভিকিরী মেয়েছেলের আবার কিসের সম্পর্ক, কিসের বিবাদ। সে দেখেছে পাগলেরা খুব অন্তর দৃষ্টি সম্পন্ন হয়। অথবা অন্তর দৃষ্টিসম্পন্ন হলেই লোকেরা পাগল হয়।

ছানু খুব শান্ত গলায় বললো, 'চিন্তা নেই। কাল সন্ধ্যের পরেই কাজটা করে দেবো।' রাসমোহন ওঠবার মুখেই ছানু খপ করে তার পায়ে হাত দিয়ে যাত্রার ঢঙে বললো, 'গুরু, তোমারে প্রণাম।'

একটা কুকুর শ্মশানটাকে আড়াআড়িভাবে ছেদ করে দৌড়ে চলে গেলো।

সন্ধ্যে থেকেই রীতিমত উৎকণ্ঠা নিয়ে ধানকলে বসে আছে রাসমোহন। নিজেকে নানা কাজে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করলেও মনটা পড়ে আছে গাছতলায় কি ঘটে সেইদিকে। পাগলা ছানুটা আবার বোতল টেনে কোথাও না লটকে

যায়। তা হলে তো সব ভেস্তে গেলো। যেখানকার কাঁটা সেখানেই বিঁধে রইলো।

মেশিন চলছে ঝুক্ঝুক্ ঝুক্ঝুক্। ইদ্রিস যথারীতি ভোম মেরে টুলে বসে আছে। গুদাম ঘরের কোনায় বস্তা ভাঁজ করছে কানা কেষ্টা।

ঘটনাটা আর এমন কি। কটা বাচ্চা কাচ্চা আর একটা মেয়েছেলে। তাও স্রেফ্ বেওয়ারিশ। ভিকিরী। কিন্তু ভেতরে খুব উত্তেজনা বোধ করছে রাসমোহন। সে কত লোকের মাথা ফাটিয়েছে, ভিটে ছাড়া করেছে, জমি কেড়েছে, কোর্ট কাছারি করে জেল খাটিয়েছে, তাতেও যেন তার উত্তেজনা এত প্রবল ছিলো না। জীবের জীবন কি জটিল! সামান্য একটি কাঁটার খোঁচা তাকে দুদিন ধরে পাগল করে রেখেছে।

মেশিনের শব্দে রাসমোহনের দীর্ঘ নিঃশ্বাসটা শোনা গেল না।

হঠাৎ বাইরে অন্ধকার কাঁপানো চিৎকারে রাসমোহন ইদ্রিস কানা কেষ্টা সবাই একসঙ্গে চমকে উঠলো।

বিকট চিৎকার করতে করতে এদিকে ছুটে আসছে পাগলা ছানু।

—পালাও, পালাও! মা নেমেছেন গাছতলায়। সব ভাগো।

চিৎকাব করতে করতে পাগলা ছানু আলুথালুভাবে ধানকলে ঢুকে গেলো। তার ছেঁড়া কাপড়ের একটা প্রান্ত মাটিতে লোটাচ্ছে; জটপাকানো চুল মুখময় ছড়ানো। রক্তাভ দুই চোখ।

সে একটা খালি বোতল ঠক করে রাসমোহনের সামনে নামিয়ে রাখলো।

—আমার দ্বারা হলো না গুরু। এই রইলো তোমার মাল।

দাঁতে দাঁত চেপে রাসমোহন ধমক দিলো, 'এ্যাই ছেনো।'

বিকৃত ঘড়ঘড়ে গলায় বিকট চিৎকার করে ছানু বললো, 'ভাগো বাপ, কেটে পড়ো। স্বচক্ষে দেখা। মা গাছতলায় দাঁড়িয়ে। ন্যাংটো। হাতে খাঁড়া, মুখে রক্ত। ভাগো, সব ভাগো।'

যেমন ঢুকেছিলো ছানু, তেমনি ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলো। রাসমোহন ইদ্রিস কানা কেষ্টা স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাকলো। শুধু কানা কেষ্টার একটা চোখের ধারালো দৃষ্টি এসে বিঁধে থাকলো রাসমোহনের বুকের কাছটায়।

পরদিন প্রকাশ্য দিবালোকে স্বয়ং মা জননীকেই গাছতলায় ছেঁড়া কানি পরে বসে দেখা গেলো। খুঁটির গায়ে খেজুর পাতার বেড়া উঠেছে। কেনো হাঁড়ি কটি যত্ন করে গোছানো। ন্যাংটো প্যাংটো ছেলে-পেলেগুলি ধুলোয় ধূসরিত। কালকের তুলনায় আজ অনেক বেশী স্থায়ী মনে হচ্ছে গাছতলার বাসিন্দাদের।

কি জানি বাবা।

হেরে যাচ্ছে নাকি রাসমোহন দাস।

যদিও নিরপেক্ষ

'শুনছ, বাসনার মা, শুনছ!' রীতিমত ভয় পেয়ে গেছেন নিশানাথ। শেষ 'শুনছ'টা, তাঁর গলা দিয়ে তিন খণ্ডে ভেঙে বেরুলো। ছোট মেয়েটার ওপাশে বাসনার মা, অর্থাৎ নিশানাথের স্ত্রী সুহাসিনী তখন গভীর ঘুমে। মস্ত পরিবারের কায়ক্লেশে চলার মত অবস্থা। কাজেই গতর খরচ করে সুহাসিনীকে অনেক জিনিস পুষিয়ে নিতে হয়। তাই সারাদিন পরে, রাত বারোটায় বিছানায় গা ছাড়লে এক ডাকে চট্‌পট সাড়া দিয়ে উঠে বসা সুহাসিনীর পক্ষে বেশ অসাধ্য ব্যাপার। আর তাছাড়া সুহাসিনী একটু ঘুমকাতুরে। বিয়ের পর থেকেই দেখে আসছেন নিশানাথ।

ভয়ার্ত নিশানাথ আবার কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করলেন। রাত কত হয়েছে বলা মুস্‌কিল! ঘন অন্ধকার সব কিছুর অবয়বকে গ্রাস করেছে। ঘুমন্ত মানুষের টানা টানা লম্বা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ছাড়া কোথাও কোন শব্দ নেই। তবে কি স্বপ্নের ঘোরে শব্দটা শুনলেন নিশানাথ। না কি গত কয়েকদিনের সেই সব রহস্যময় অদৃশ্য ব্যাপার স্যাপারের পর তাঁর চোখ এবং কান কিছু দেখবার এবং শোনবার জন্য আগে থেকেই তৈরী হয়ে আছে। এরকম হয় বলে তো শোনা গেছে। কে জানে হতেও পারে তাঁর মন নিঃশব্দের ভিতর শব্দ শুনছে। শূন্যতার মধ্যে অবয়ব দেখছে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই আবার শব্দটা শোনা গেল। ঠক্ ঠকাস্, ঠক্ ঠকাস্। অন্ধকারের মধ্যে শরীরময় চম্‌কে উঠলেন নিশানাথ। হৃৎপিণ্ডের অস্বাভাবিক শব্দটা তাঁর কানে হাজার গুণ জোরে বাজতে লাগলো। না, তবে তো স্বপ্ন নয়। এই তো তিনি জেগে আছেন। তবে কি সেই রহস্যময় ব্যাপারটাই ক্রমাগত কয়েকদিন ধরে তাকে অনুসরণ করে করে আজ মধ্যরাতে দরজায় এসে ঘা দিয়েছে! এ কদিন সে সুযোগ খুঁজেছে; সুবিধে করতে পারে নি। আজ একেবারে

-কৃতসংকল্প হয়ে সে দরজার ওপাশে এসে দাঁড়িয়েছে। দরজায় ঘা দিয়ে ডাকছে, এসো, বাইরে বেরিয়ে এসো। আজ তোমার নিস্তার নেই।

দাঁতে দাঁত চেপে নিশানাথ বিছানার ওপর নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন। যেন তিনি সামান্য একটু আঙুল নাড়লেই সে দেখতে পাবে। ঈষৎ শব্দ হলেই সে শুনতে পাবে।

ঠক্ ঠকাস্। ঠক ঠকাস্। শব্দটা যেন এবার একটু বেশ জোরে শোনা গেলো। আসলে ক্রমাগত আঘাত করে করে লোকটা ধৈর্য হারিয়ে ফেলছে। রাগ বেড়ে উঠছে তার। নিশানাথ বাবু স্পষ্ট দেখতে পেলেন পা-কামড়ানো চোঙা প্যান্ট, আর টাইট কালো গেঞ্জির ভিতর দিয়ে একটা শরীর ফুলে উঠছে। তার খাঁজকাটা ভারী মুখে চোয়াল অবধি নেমে আসা জুল্‌পীর হিংস্রতায় তাকে মনে হচ্ছে পৃথিবীর শেষ করুণাহীন মানুষের মত। ওর হাতে কি ওটা, ছুরি না পিস্তল! না কি বাচ্চাদের বলের মতো আঙুলের অবহেলায় ধরে আছে বোমাটা, যা তাঁর আটচল্লিশ বছরের প্রচেষ্টার দেহটাকে চোখের পলকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারে। সর্বনাশ! নিশানাথবাবু চোখ বুজলেন। আজ যদি নিজের মধ্যে তিনি নিজে ক্ষয় হয়ে যেতে পারতেন তা হলে ঐ মারাত্মক লোকটার হাত থেকে রক্ষা পেতেন।

কিন্তু তা সম্ভব নয়। এবং লোকটার ধৈর্য শেষ হয়ে আসছে। এখুনি সে তার প্রচণ্ড পশুশক্তির জোরে দরজার খিলটা ভেঙে ফেলবে। একটা মত্ত অন্ধকারের মত ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াবে। হলদেটে দাঁত মেলে নিশানাথকে শেষ বারের মত বিদ্রুপ করে নিয়ে সে হাত তুলবে। হাতে ছুরি পিস্তল কিংবা বোমা।

'বাঁচাও'! আর্ত চীৎকার করে নিশানাথ বাবু বাড়ীর সবাইকে ডাকতে চাইলেন। কিন্তু তাঁর শুকনো ঘরঘরে গলা দিয়ে প্রকৃতপক্ষে কোন আওয়াজই হলো না। ঘেমে নেয়ে উঠলেন তিনি। অথচ জিবটা শুকনো পাতার মত মচমচে।

অদ্ভুত নিষ্ঠুর তাঁর বাড়ীর লোকজন। নিশানাথবাবু মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষছেন, অথচ বাড়ীর সবাই অকাতরে ঘুমিয়ে আছে। পাশের ঘরে তিন মেয়ে এবং বিধবা পিসীমা। বারান্দার খুপরিতে বড়ো দুই ছেলে। এ ঘরে তাঁর স্ত্রী, ছোট মেয়ে এবং ছোট ছেলে। সবাই মিলে জেগে উঠে আলো জালিয়ে হৈ হৈ করে পাড়া প্রতিবেশীদের জাগিয়ে দিলে হয়তো লোকটাকে

ঠেকানো যেতো। অথচ কারুর জাগবার কোন লক্ষণ নেই। ঠক্ ঠকাস্, ঠক্ ঠকাস্। শব্দটা এবার আরো জোরে হলো। দরজাটা যেন মড়মড় করে উঠলো। শরীরের সমস্ত শক্তি সংহত করে প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলেন নিশানাথবাবু. 'সুহাস···বিমল···বাঁচাও···!'

সম্ভবত নিশানাথবাবুর গলাটা খুব উঁচু পর্দায় উঠে থাকবে, তা না হলে সুহাসিনী অমন ধড়ফড় করে জেগে উঠবে কেন। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়ার ফলে ঘুমন্ত মানুষকে বোবায় পাওয়ার মত সুহাসিনী হাউমাউ করে উঠলেন। 'ওগো, কি হলো গো, কি হলো!' পাশের ঘর থেকে বুড়ী পিসীমার গলা পাওয়া গেল, ওরে নিশা, কি হলো রে?' বারান্দার খুপরি থেকে চেঁচিয়ে বিমল বললো –'কি হযেছে মা, এত চেঁচামেচি কিসের?' ইতিমধ্যে সুহাসিনী ঘুমচোখে অবশ শরীরে দেওয়াল হাতড়ে হাতড়ে সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে ফেলেছেন। এবং আলো জ্বালিয়ে বিছানার দিকে তাকিয়ে সুহাসিনী বাড়ী মাথায় করে চেঁচিয়ে উঠলেন—'ওরে তোরা শিগগীর আয়, সব্বোনাশ হলো!' সুহাসিনীর আর্ত চীৎকারে বাড়ীর অবশিষ্টদেরও জেগে উঠতে দেরী হলো না। সকলে হুড়মুড় করে এসে এই ঘরে ঢুকলো।

'কি হয়েছে কি?'

'কি ব্যাপার?'

বিছানার দিকে তাকিয়ে সকলে মুহূর্তকাল থমকে গেলো। বিছানার ওপর নিশানাথবাবু বসে আছেন। অস্বাভাবিক ত্রাসে চোখ দুটি বিস্ফারিত। সমস্ত মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম। শরীরটা যেন নিথর হয়ে আছে।

বিমলই প্রথম এগিয়ে নিশানাথবাবুর গায়ে হাত রেখে ডাকলো, 'বাবা বাবা, কি হয়েছে তোমার?'

একজন অপ্রকৃতিস্থ মানুষের মত বড়ো ছেলের দিকে তাকিয়ে নিশানাথবাবু বিড়বিড় করে বললেন –'সে চলে গেছে?'

'কে চলে গেছে? কার কথা বলছো?'

বুড়ী পিসীমা কপাল চাপড়ে হা হা করে উঠলো, 'হা আমার পোড়া কপাল! ওরে নিশা, তোর কি হলো রে! যম আমাকে চোখেও দেখে না!'

বিমল ধমকে উঠলো, 'থামো তো তোমরা, চুপ করো। তুমি কার কথা বলছো বাবা, কার চলে যাবার কথা বলছো?'

আলো লোকজন এবং সর্বোপরি পিসীমার কপাল চাপড়ানোর ফলে নিশানাথবাবুর যেন কিছুটা সম্বিত ফিরে এলো। ঘরের সবাইকে এক পলক দেখে নিয়ে দরজার দিকে একটা আঙুল তুলে বললেন, 'দরজার কড়া নাড়ছিলো —সেই লোকটা, যে আমাকে অফিসের রাস্তায় বাজারের রাস্তায় সব সময় ফলো করছে!'

এই একটি মাত্র কথায় মুহূর্তে ঘরের আবহাওয়াটা পাল্টে গেলো। সকলেরই ঘুম লেপ্টানো বিরক্ত উৎকণ্ঠিত মুখে-চোখে চাপা হাসির ঝিলিক দেখা গেলো। বিমল কোনক্রমে হাসি চেপে নিয়ে খটাং করে দরজার খিলটা খুলে ফেললো। বাইরে থেকে একপাক ঘুরে এসে বললো 'কই, কে কড়া নাড়ছিলো দরজায়? কেউ কোথাও নেই তো!'

এরপর নিয়ম মাফিক নিশানাথবাবুর লজ্জা পাওয়া উচিত। মাঝরাতে এরকম একটা কাণ্ডের জন্য সংকোচ আশাই স্বাভাবিক। কিন্তু নিশানাথবাবুর সমস্ত মুখে ভয় এবং দুশ্চিন্তার ছাপই যেন স্পষ্ট হয়ে রইলো। নিশানাথবাবু আস্তে আস্তে বললেন, 'ঠিক আছে, তোরা সব শুয়ে পড গিয়ে।'

হাসি চেপে ছেলেমেয়েরা একে একে ঘর ছেড়ে গেলো।

কিছুদিন যাবৎই তারা বাবার এই ধরনের ছেলেমানুষী আতঙ্কের সঙ্গে পরিচিত। অদ্ভুত একটা ভয়ের বাতিক ঢুকেছে বাবার মাথায়। সবসময়েই তাঁর মনে হচ্ছে কে যেন তাকে অনুসরণ করছে। এবং যে অনুসরণ করছে, তার হাতে ছুরি পিস্তল কিংবা বোমা ইত্যাকার মারাত্মক অস্ত্র সব সময়েই থাকে, এটা তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস।

সুহাসিনী অবশ্য বলেছিলো, 'ব্যাপারটা নিয়ে হাসাহাসি না করে একটু খোঁজখবর নিয়েই দেখ না তোরা। মানুষটা যখন অত করে বলছে!'

ধমকে উঠেছিলো বিমল, 'তুমি থামো তো মা, পৃথিবীতে লোকের আর কাজ নেই। বোমা-পিস্তল নিয়ে বাবার পিছনে ফলো করে বেড়াবে! বাবার মত নিরীহ লোক দেখাতে পারো এ তল্লাটে? কাউকে কোনদিন একটা চড় মেরেছে বাবা, একটা রেগে কথা বলেছে?'

'তা তো বুঝলাম। কিন্তু মানুষটাই বা অত করে বলছে কেন? কই, কোনদিন তো এসব কথা আগে বলেনি?

'বলছো যখন খোঁজ নেব। তবে এটা বুঝতে পারছো না, সারাদিন কাগজে

খুনোখুনির ঘটনা পড়ছেন। পাঁচজন লোকের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে এইসব খুনজখমের ঘটনা নিয়েই। মনের মধ্যে একটা ভয় ঢোকা তো স্বাভাবিক।'

হবেও বা। বিমলের কথা ফেলে দিতে পারেননি সুহাসিনী। এইসব খুনোখুনী রক্তারক্তির কাণ্ডই তো হচ্ছে চারদিকে। আর স্বামীকে তো তিনি ভালো করেই জানেন। নির্বিরোধ নিরীহ স্বভাবের মানুষ। কারো সঙ্গে মতবিরোধের সামান্য ঘটনা ঘটলেই বিরোধ বাঁচাতে মাথা নীচু করে সরে এসেছেন। এমন লোকের শত্রু না থাকাটাই স্বাভাবিক। হয়তো নেহাতই মনের ভয়। সুতরাং সুহাসিনীও এটাকে গুরুত্ব দেবার প্রয়োজন মনে করেননি।

সবাই চলে যেতে সুহাসিনী দরজার খিল তুলে দিয়ে পাশে তক্তোপোশের ওপর বসে বললেন 'শব্দটা তুমি স্বপ্নের মধ্যে শোননি তো?'

নিশানাথবাবু স্ত্রীর দিকে তাকালেন। মনে হলো অন্য সকলের মতই এই ব্যাপারটা নিয়ে সুহাসিনীরও ঠোঁটের নীচে টিপে রাখা হাসি টলটল করছে। কিন্তু তিনি তো স্পষ্ট জেগে থেকেই শব্দটা শুনেছেন। অফিসের পথে, বাজারের রাস্তায় তার উপস্থিতি তো স্পষ্টভাবেই টের পেয়েছেন তিনি। সে সব কি মিথ্যে! তিনি কি বুজরুক না পাগল! আর তার বয়সটাও তো পঞ্চাশ ধরোধরো। মাথায় এখনো কোন ব্যামো ধরেনি। যেমন করেই হোক এত বড় রাবণের গুষ্টিকে তো তিনি খাইয়ে পরিয়ে আসছেন। নিজের জন্যে ভাবেন না তিনি। যদিও জীবমাত্রেরই মৃত্যুভয় কমবেশি আছে। কিন্তু হঠাৎ একটা কিছু হয়ে গেলে কোথায় দাঁড়াবে ওরা সব। অথচ ব্যাপারটাকে সবাই পরিহাসের চোখে দেখতে শুরু করেছে। অন্য সকলের কথা তিনি ধরেন না. ছেলেমেয়েরা বড় হলে পাখা গজায়, কিন্তু সুহাসিনী কি করে এমন মারাত্মক একটা ব্যাপারকে ঠাট্টা হিসাবে নিতে পারলো! সুহাসিনীকে খুব নিষ্ঠুর মনে হলো তাঁর। এই মুহূর্তে একটা অদ্ভুত অবসাদ আচ্ছন্ন করলো নিশানাথবাবুকে। গম্ভীর গলায় খুব আস্তে আস্তে নিশানাথবাবু বললেন 'তুমি শুয়ে পড়ো'।

এই দ্যাখো, রাগ করলে তো!' স্বামীর গায়ে একটা হাত রাখলেন সুহাসিনী। সামান্য হেসে বললেন—'সে যাই বলো বাপু, তুমি কিন্তু একটু ভীতু আছো। সেই বিয়ে হওয়া তক দেখে আসছি। পুরুষ মানুষের অত ভয় ভালো না। আর তাছাড়া তুমি তো বুড়োদের দলে, তোমার অত ভয় কিসে। এখন তো বিমল অমলদের বয়সী ছেলেদেরই ভয় বেশী।'

একটু রূঢ় গলায় নিশানাথ বললেন 'তুমি কি মনে করো, নিজের ছায়া দেখে ভয় পাচ্ছি আমি ?

'কিন্তু তোমার পেছনে খামোকা লোকই বা লাগতে যাবে কেন ? তুমি তো কারু ক্ষতি করোনি ! কারু সঙ্গে তো ঝগড়াঝাটি মারামারি করোনি ! তবে অমনি অমনি তোমার সঙ্গে শত্রুতা করতে যাবে কে ?' যেন স্বামীর মনের ভয় কাটাবার জন্যই জোর দিয়ে কথাগুলি বললেন সুহাসিনী।

নিশানাথ বললেন 'কি জানি এই যে এখনো বেঁচে আছি এটাই হয়তো কাউকে শত্রু করে তুলেছে। ওই যে আমি, চোট্টামি ছ্যাঁচড়ামি না করে খেটেখুটে দু-মুঠো ভাল ভাত খেয়ে থাকছি ওটাই হয়তো কাউকে শত্রু করে তুলছে। হয়তো আরো সব অন্য ব্যাপার-ট্যাপার আছে।

'কি জানি বাপু অতশত আমি বুঝিও না।' সুহাসিনী উঠে গিয়ে আলো নিভিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমি আর জেগে থাকতে পারছি না। তুমিও শুয়ে পড়ো। ভেবে ভেবে আর মাথা গরম করো না।'

সুহাসিনী শুয়ে পড়ার পর, আরো কিছু সময় বসে থাকলেন নিশানাথ। তারপর আস্তে আস্তে শুয়ে চোখ বুজলেন। আজ আর ঘুম আসবার কোন সম্ভাবনা নেই। উপরন্তু চোখ বুজতেই কান অসম্ভব সতর্ক হয়ে উঠলো নিশানাথ-বাবুর। মনে হলো চারদিকের এই নিরবং ব অন্ধকারেব মধ্যে বহুদূর থেকে টিপেটিপে আসা একটা পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। পা কামড়ানো সরু প্যাণ্ট, কালো টাইট গেঞ্জি, চোয়ালের ওপর তাণ্ডবের মত একজোড়া জুলপী, হাতে ছুরি, পিস্তল কিংবা বোমা—সে এগিয়ে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দরজায় তার হিংস্র করাঘাত বেজে উঠবে।

প্রথম যেদিন ব্যাপারটা টের পাওয়া গেল সেদিন প্রচণ্ড দমচাপা উৎকণ্ঠা, আতঙ্ক নিয়ে বাড়ী ফিরলেন নিশানাথ। তাঁর চেহারার মধ্যে এই আতঙ্কের ছাপ এমনই স্পষ্ট ছিলো যে বাড়ীর কারুরই চোখ এড়ালো না।

উদ্বেগপূর্ণ গলায় সুহাসিনী জিজ্ঞেস করলেন, 'কিগো, শরীর টরীর খারাপ করেনি তো তোমার ?'

'ন্‌না !'

'তবে অমন লাগছে কেন তোমাকে ?'

শুকনো গলায় নিশানাথ বললেন, 'খুব বিপদের মধ্যে পড়া গেছে।'

'কি রকম ?, সুহাসিনী প্রায় আঁতকে উঠলেন। বড় বিপদ বলতে তিনি দুটি জিনিসই বোঝেন। এক স্বামীর শরীর, দ্বিতীয়ত অফিসের চাকরি। এই দুটোকে জড়িয়েই তাঁর জোড়াতালি দেওয়া সংসারের ভালোমন্দ, হাসি-কান্না। প্রথমটা যখন নয়, তখন নিশ্চয়ই দ্বিতীয়টা। অর্থাৎ অফিসে কিছু একটা গোলমাল হয়েছে।

নিশানাথ বললেন 'কে যেন আমাকে ফলো করছে।'

'তার মানে ?'

নিশানাথ বুঝলেন কথাটা ঠিক ধরতে পারেনি সুহাসিনী। সহজ করে বললেন 'আমার পিছনে লোক লেগেছে'।

'কেন ?' সুহাসিনী আরো অবাক হয়ে গেলেন।

'বোধহয় খুনটুন কবার মতলব আছে !'

'সেকি গো ?' – সুহাসিনী আর্তনাদ করে উঠলেন। বললেন—'তুমি কারো সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি কিছু করোনি তো ?'

'কার সঙ্গে আবার ঝগড়া করবো ?'

'তবে ?'

'সেটা তো আমিও বুঝতে পারছি না !'—খুব ভীত এবং অসহায় শোনালো নিশানাথবাবুর গলা। প্রকৃতপক্ষে তিনিও বুঝে উঠতে পারছেন না, এর পিছনে কি আছে। জ্ঞানত তিনি কারো সঙ্গে ঝগড়া করেননি, কারো সঙ্গে মনোমালিন্য হয়নি। তবে ?

সুহাসিনী বললেন – কি হবে তবে ? চারদিকে যা রক্তারক্তি খুনোখুনি কাণ্ড, আমার বাপু বুক কাঁপছে !'

'বুক কি আমারই কাঁপছে না ! কিন্তু কি যে করি। বাজারটা না হয় অমল কিংবা বিমল করে দিলো, কিন্তু আমার অফিসটা তো অমল বিমল করে দিয়ে আসতে পারবে না। আর বাসস্ট্যাণ্ডে যাবার তো ঐ একটাই রাস্তা।

'পুলিশকে সব জানালে হয় না ?'

পুলিশ ! খেপেছো ? হয়তো উল্‌টে আমাকেই ধরে নিয়ে চলে যাবে।'

'কেন ?'

'বুঝতে পারছো না—পুলিশ ভাববে, নিশ্চয়ই আমি এমন কিছু করি, যার জন্যে অন্যেরা আমাকে খুন করার চেষ্টা করছে। তার মানে আমি হলাম

বিপজ্জনক লোক। আর বিপজ্জনক লোককে কি পুলিশ বাইরে ছেড়ে রাখবে ?

এ কথাটারও মাথামুণ্ডু কিছু মাথায় ঢুকলো না সুহাসিনীর। কোনো কিছু ভেবে উঠতে না পেরে বললেন, 'দাঁড়াও বিমলকে ডাকি।'

বড়ছেলের ওপর একটু বেশী মাত্রায় নির্ভর করেন সুহাসিনী। বিমল অবশ্য ছেলে হিসাবে ভালো। ধীর, স্থির, সাহসী, বয়স অনুপাতে বুদ্ধিসুদ্ধি ধরেও বেশী।

সব শুনে বিমল বললে 'তোমার পিছনে লোক ফলো করতে যাবে কেন ?'

'সেটা তো আমিও বুঝতে পারছি না !'

'যে ফলো করেছিলো, তাকে কি তুমি দেখেছো ?'

'না, পরিষ্কার কিছু দেখিনি। আমি পিছন ফিরে তাকাতেই চট্ করে আড়ালে চলে গেলো। নয়ন কুণ্ডু লেন থেকে আমাদের গলির মুখে পড়তেই বাঁ দিকে যে বন্ধ পান সিগারেটের গুমটিটা আছে, মনে হলো ওর আড়ালে চলে গেলো।

'কিন্তু তোমার তো মনের ভুলও হতে পারে।'

'না, মনের ভুল নয়।' মাথা নাড়লেন নিশানাথবাবু। আমার বেশ স্পষ্ট মনে হলো, চোঙা প্যাণ্ট, আর কালো রঙের টাইট গেঞ্জি পরা চোয়াড়ে লোকটা আমি তাকাতেই চট্ করে গুমটির আড়ালে গা ঢাকা দিলো। মনে হয় ওর হাতে ছোরা কিংবা পিস্তল কিছু একটা ছিলো।

হ্যাঁ, সেটা তো ওদের নিজেদেরও কোন ব্যাপারে হতে পারে। এতে কি করে প্রমাণ হয় লোকটা তোমাকেই ফলো করেছিলো ?'

'আমি তাকাতেই ও সরে যাবে কেন ?' তবে নিজের মনের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা, তার উপর ছেলের জেরায় বিরক্ত নিশানাথবাবুর গলা বেশ একটু রুষ্ট শোনালো।

বিমল বুঝলো, এ ব্যাপারে এখন আর কথা না বাড়ানোই ভালো। সে সরে গিয়ে মাকে বললো ওটা বাবার মনের ভ্রম। বাবার মতো নিরীহ নির্ঝঞ্ঝাট লোককে কি স্বার্থে কে মারবে ?'

'তবু একটু খোঁজখবর নিয়ে দেখ না তোরা। যা দিনকাল বিশ্বাস নেই কিছুতেই।'

'বলছো যখন খোঁজ নেবো। তবে ...'

খোঁজ অবশ্য বিমল নিয়েছে। বাপকে না জানিয়ে দুভাই পিছন পিছন অফিস অবধি গেছে। আবার ছুটি হলে পিছন পিছন বাড়ী অবধি এসেছে। এবং সেদিনও যথারীতি নিশানাথবাবু আতঙ্কগ্রস্তের মত জানিয়েছেন সেই অনুসরণকারী ভয়ঙ্কর আততায়ীর কথা। বিমল এবং বাড়ীসুদ্ধ সবাই নিশ্চিন্ত হয়েছে ভয়টা নিশানাথবাবুর নেহাতই মনের। কিন্তু এটাতো ভালো নয়। এই ভয়টা ক্রমাগত স্নায়ুগুলিকে চাপ দিয়ে দিয়ে বিকল করে দিতে পারে। ফলে তার থেকে একটা গুরুতর কিছু ঘটে যাওয়া আশ্চর্য নয়। বিমল বুঝলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাপের মনের ভয়টা কাটানো দরকার। ঠাণ্ডা মাথায় নরম গলায় বিমল জিজ্ঞাসা করলো—'তুমি কি আজ লোকটাকে দেখতে পেয়েছিলে ?

'না। আমি তাকাতেই চট্ করে আড়ালে সরে গেল' তবে কোনো সন্দেহ নেই, সেই লোকটাই। সেই টাইট্ প্যান্ট, কালো গেঞ্জি পরা।'

'কিন্তু তোমার পিছনে লোক ঘুরবেই বা কেন ?'

'আমিও তো তাই ভাবছি।'

'স্বার্থ নিয়ে তোমার সঙ্গে কারু ঝগড়া হয়নি।'

'না'।

'তুমি তো কোন রাজনৈতিক দলেরও লোক নয় !

'কস্মিনকালেও না।'

'তবেই বুঝে দেখো. তোমার মতো নির্ঝঞ্ঝাট নিরপেক্ষ লোককে কেউ খুন করবার চেষ্টা করবে কেন ? কি স্বার্থে ?

কপাল টিপে নিশানাথবাবু খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। যে যতো অবিশ্বাস করুক, তিনি তো প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে যন্ত্রনাদায়কভাবে অনুভব করছেন সেই অনুসরণকারী আততায়ীকে। সে হয়তো সঠিক সুযোগের অপেক্ষা করছে। এবং সেই সুযোগ এলেই হয়তো সে তাঁর চূড়ান্ত মুহূর্তটিকে ঘনিয়ে তুলবে। হিংস্র হাতের ছুরি বিঁধে যাবে তার পিঠে, কিংবা সিসের গুলি এসে ভেদ করবে তাঁর হৃদপিণ্ড, অথবা বোমা ফাটার বিকট শব্দের সঙ্গে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে তাঁর এই আটচল্লিশ বছরের দেহটা এত দুংখের মধ্যেও যাকে তিনি ভালোবাসেন। একটা মস্ত বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে হয়তো এত বড় সংসারটা পাক খেতে খেতে তলিয়ে যাবে রসাতলে।

'বিমল !' হঠাৎ নিশানাথবাবু চমকে উঠলেন। চমকে উঠলো বিমলও।

জিজ্ঞাসু চোখে বাপের দিকে তাকালো। কথাটা হঠাৎই মনে পড়লো নিশানাথবাবুর বিদ্যুৎচমকের মতো। খুব অবসন্ন গলায় নিশানাথবাবু বললেন, 'আমি যে ওদের ডেমনেস্ট্রেশনে গিয়েছিলাম—গত বছর।'

'সে তো তোমার অফিসের।'

'হ্যাঁ।'

'সেখানে তো অফিসসুদ্ধু সবাই গিয়েছিলো। তা হলে তো সবার পেছনেই...'

'কি জানি, কিছু বুঝতে পারছি না—কিছুই বুঝতে পারছি না আমি।' খুব অস্থির গলায় কথাগুলি বললেন নিশানাথবাবু। দু আঙুলে কপাল টিপে ধরলেন। অসহ্য যন্ত্রণায় তাঁর মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে।

বিমল খুব কোমল গলায় বললো—'মনের অকারণ ভয়টা তুমি ঝেড়ে ফেলো বাবা। ওটা নেহাতই তোমার মনের ভয়।'

তারপর ১৯৭২ সালের একদিন বিকেলে, সেদিন সোমবার কিংবা মঙ্গলবার অথবা শুক্রবার, নয়ন কুণ্ডু লেনের বন্ধ পানের গুমটির কাছে একজন প্রায় প্রৌঢ় খুন হয়ে যাওয়া মানুষের লাশ পাওয়া গেলো। লোকটি অমল-বিমলের বাবাও হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। খবরটা শোনামাত্র বিমল ছুটলো দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে, নয়ন কুণ্ডু লেনের সেই বন্ধ পানের গুমটিটার দিকে। তার বাবাও যে প্রায় প্রৌঢ়, তার বাবারও যে মাথায় কাঁচাপাকা চুল, তার বাবারও যে চোখে চশমা, পরনে ঢোলা পাঞ্জাবী, তার বাবারও যে—

তবে নিশানাথবাবু কিন্তু নিরীহ, নির্ঝঞ্ঝাট এবং নিরপেক্ষ ছিলেন।

কুঁড়োরামের দিব্যজ্ঞান

কুঁড়োরামের বউ মারা গেলো।

ফলিডল খেয়েছিলো শেষ রাতে। ব্রাহ্মমুহূর্তে দেহ রক্ষা হলো। কাঁদতে গিয়ে কুঁড়োরামের প্রথম চোটেই মনে পড়ে যায়—একটা পেট কমলো। সম্ভবত এই শুভ চিন্তায় তার আর কাঁদা হলো না। আসলে জীবন ধারণের মৌলিক প্রমাদ ক্ষুধা প্রতিহত করবার সামান্যতম ব্যবস্থা থাকলে, প্রোটিন ভিটামিনের ছিটে ফোঁটা সাহচর্য লাভ করলে জীবের শরীরে যে শোকজনিত বা আনন্দজনিত নিঃসরণ ঘটে তা এই কুঁড়োরামের ক্ষেত্রে দূর অস্ত। ফলে অনেকক্ষণ কাঁদার চেষ্টা করে সে বিফল হয়। খস্‌খসে চামড়ায় ঢাকা হাড়ের কাঠামোটির কোথায় যে সেই প্রয়োজনীয় অশ্রুজল নামক মহার্ঘ বস্তুটি আছে কত চেষ্টায় সে তার নাগাল পেলো না। বোবা ঘোলাটে চোখ দুটি মেলে সে কোথায় যেন তাকিয়ে রইলো।

পাড়া প্রতিবেশীদের আসা যাওয়া চলতে লাগলো। কোন কোন কোমল স্বভাবা নারী মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদলো। কুঁড়োরামের কাছে সবটাই ছায়া ছায়া ধূসর। অনেকটা অর্ধ সত্য ঘটনার মত। তখন তাকে প্রাচীন ভারতের দিব্যজ্ঞানী ঋষিদের মতই মহান মহিমায় প্রতিষ্ঠিত মনে হলো। শোকে দুঃখে সমান সমাহিত। তবে এক্ষেত্রে কুঁড়োরামের অধিক মহিমা প্রাপ্য। দীর্ঘ তপস্যায় ঋষিদের যা আয়ত্ব করতে হয়েছিল, তা কুঁড়োরামের অধিগত হয়েছে ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে। মাত্র তেত্রিশ বৎসরের সময়সীমায়। শোকদুঃখাভিভূত হতে এই সময়কাল নেহাৎই অত্যল্প। সর্বোপরি নিজস্ব প্রয়াস ব্যতিরেকেই সে সাধনমার্গের এই চূড়ান্ত বিন্দুটিতে হাজির হয়ে গেছে। সেও এক রহস্য।

এই সময় কে একজন ঘোষণা করে, এই কুঁড়ো, পুলিশ এয়েচে। লাশ চালান হবে।

মুহূর্তে কুঁড়োরামের নিরবলম্ব ভাবটি কাটে। প্রাচীন ঋষিদের সময় বৃটিশতত্ত্বাবধানে নির্মিত পুলিশ ছিলো না। থাকলে তপোভঙ্গের হিড়িক পড়তো। এই কুঁড়োরামও পুলিশ শ্রবণ মাত্র সিদ্ধধাম থেকে চকিতে তার অজগণ্ড গ্রামের হতকুচ্ছিৎ কুঁড়েঘরের দাওয়ায় প্রত্যাবর্তন করে।

সে যে সম্যক জাগতিক হতে পেরেছে তার প্রমাণ মেলে হাত কচলানোর মধ্যে। মনে হয় পূর্বের কোন অভিজ্ঞতা তাকে শিখিয়েছে, পুলিশ মৃত্যুর চেয়েও মারাত্মক। সুতরাং সে হাত জোড় করে বলে, আজ্ঞে, আমি তো কোন দোষ করি নাই!

একশত তেত্রিশ বছরের অভিজ্ঞ পুলিশ তৎক্ষণাৎ বোঝে এই মনুষ্যসদৃশটি মানবকুলোদ্ভব নয়। তারা অন্য দিকে তাকিয়ে বলে, লাশ কোথায়, দেখি?

কয়েকজন পুলিশকে পথ দেখিয়ে ঘরের ভিতর নিয়ে যায়। ঠাঠা দুপুরে সাত সেলের টর্চলাইট থেকে সুতীব্র আলো ফেলে পুলিশ ঘরে ঢোকে।

একপাশে ছেঁড়া কানি ঢাকা দেওয়া ক্ষুদ্রাকার লাশ দেখে পুলিশ বলে, বাচ্চা নাকি?

—না, পাঁচ ছেলেমেয়ের মা।

পুলিশ ঘাড় ঘুরিয়ে এই মন্তব্যের মালিককে অনুসন্ধান করে। এবং সব কটি মুখকেই এই বাক্য ত্যাগের অনুপযুক্ত মনে হয়। ফলে অনাবশ্যক মেজাজে সঙ্গে আসা ছিটু ডোমকে ধমক দিয়ে বলে, লাশ রেডি কর।

তারপর বাইরে এসে জানতে চায়, এই লাশের মালিক কে?

এই প্রথম পুলিশের জিজ্ঞাসা এক মহা দার্শনিক অর্থে রূপান্তরিত হয়। সত্যি তো, মৃত্যুর পরে কে আর কার অধীন! কিন্তু এই অজগণ্ড গ্রামের হাঘরে মানুষরা তা বোঝে না।

তারা লাশের মালিককে পিঠে হাত দিয়ে পুলিশের সামনে ঠেলে দেয়।

বলে, এই যে—কুঁড়োরাম। কুঁড়োরাম বাদ্যকর।

পুলিশ তাকে দেখে শুনে যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হয়। ধমক দিয়ে বলে, সদরে লাশ চালান যাবে কিসে? গরুর গাড়ী কই?

এবার কুঁড়োরামের মাথায় ব্রহ্মাণ্ডটি ভেঙ্গে পড়ে। গরুর গাড়ী নামক বিলাসিতা তার স্বপনের মধ্যেও ধরা পড়ে না। বড় জোতের মালিকের বউ ছেলেমেয়েকে সে অবশ্য মাঝে মধ্যে গরুর গাড়ী চেপে ভিনগাঁয়ে যেতে

দেখেছে। ব্যাস, এই অবধি। সুতরাং পুলিশের এই সরল বাংলা বাক্যটি তার মাথায় ঢোকে না। তখন প্রাঞ্জল অনুবাদের জন্য দু'একজন এগিয়ে আসে। ব্যাপারটা তাকে বোঝায়।

কুঁড়োরাম হাত উলটে বলে, কুথায় পাবো ?

অনুবাদকরা বলে, তা বল্লে তো পুলিশ ছাড়বে না। একবার যখন গরুর গাড়ী চেয়েছে, দিতেই হবে।

কুঁড়োরাম চোখে অন্ধকার দেখে। সে জন্মাবধি পদাতিক। গরুর গাড়ী যদিও গাড়ী এবং গরুর বাস্তব সমাহার তথাপি ব্যাপারটা তার কাছে অলীক মনে হয়।

কেউ একজন সমস্যা নিরসনের পরামর্শ দেয়, বড় জোত্‌মালিকের কাছে গিয়ে দেখ্ না। হাতে পায়ে ধরলে ঠিক পেয়ে যাবি।

পুলিশ রেগে গিয়ে বলে, এসব উজবুক দিয়ে কোন কাজ হবে না। তোমরা কেউ একজন গিয়ে ব্যবস্থা দেখো।

কিন্তু কারু নড়বার লক্ষণ দেখা যায় না।

তখন পাড়ার তিন-মাথা-এক থেঁতু বুড়ো খ্যানখ্যানে গলায় বলে, তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা দেখ্ কুঁড়ো। লাশ একে বাসী হলো। সদর সারতে পচন ধরবে। তোর পাপ হবে না !

পাপের কথায় নড়ে চড়ে ওঠে কুঁড়োরাম। পাপ ! সে তো পুলিশের মতই ভয়ঙ্কর। তবে পুলিশ ইহকালে, পাপ পরকালে। দুটোই গুরুত্বপূর্ণ।

কুঁড়োরাম কম্পিত চরণে বড় জোত্‌মালিকের বাড়ীর দিকে রওনা দেয়।

বিষয়টা বোঝাতে অনেকটা সময় লাগে।

ছোঁয়াছুঁয়ির হাত থেকে বাঁচতে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে বড় জোত্‌মালিক সব শোনে।

তারপর বলে, তোরা তো সব এক নম্বর বজ্জাত !

শুনে মাটির উপর বসে পড়ে কুঁড়োরাম। একে তার দায়, তার উপর সামনে অপ্রসন্ন জোত্‌মালিক।

সর্বোপরি দেহটিকে খাড়া রাখতে গেলে যে অন্নজলের মুখ দেখা দরকার তার সঙ্গে কুঁড়োরামের প্রায় দুদিন ধরে বিবাদ। সুতরাং শরীরটিকে ভূমিশয্যার হাত থেকে বাঁচাতে পায়ের সঙ্গে তার দুটো হাতও দরকার হয়ে পড়লো।

বড় জোত্‌মালিক বোঝে, বেটা এখন খুব ভূঁয়ে লোটানো বিনয় দেখাচ্ছে। বিপদে শয়তানও থুতু চাটে। সে চোখ গরম করে বলে, তোদের উপকার করে লাভ কি!

কুঁড়োরাম চিঁ চিঁ করে জানায়, আজ্ঞে, লাশ একে বাসী হলো, সদর সারতে পচন ধরবে। আমার পাপ হবে আজ্ঞে।

—তাতে আমার কি?

কথা হিসাবে এটা অবশ্য ঠিকই। লাশ পচবে কুঁড়োরামের বউয়ের আর পাপ হবে কি বড় জোত্‌মালিকের?

কুঁড়োরাম দুটো হাত দিয়ে কাল্পনিক পায়ে ধরার ভঙ্গি করে। একটি গরুর গাড়ী দিয়ে তাকে এই বিপদ এবং পাপ থেকে তিনিই যে উদ্ধার করতে পারেন সেটা মূকাভিনয় দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করে।

বড় মালিক খানিক সময় কি ভাবে। তারপর বলে, গাড়ী দিতে পারি, এক শর্তে। কুঁড়োরাম জিজ্ঞাসু মুখ তোলে।

—তোকে মরা বউয়ের নামে কিরা কথা দিতে হবে।

অগোছালো স্নায়ুগুলিকে যথাসাধ্য সংযত করে বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করে কুঁড়োরাম। শর্ত, মরা বউয়ের নামে কিরা. তা হলে কি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু! কি হতে পারে? বড় জোত্‌মালিকের শর্ত মানেই কিছু ধাঁধার ব্যাপার। কিন্তু তার আর আছেটা কি? যার কিছুই নেই তার শর্তে ভয়টা কিসেব।

কুঁড়োরাম এমন করে মাটি ছোঁয় যেন বা মরা বউয়ের চিবুকে হাত রেখেছে। তারপর বলে, আজ্ঞে, মরা বউয়ের কিরা, আপনার কথা রাখবো।

আপাতত তাকে পুলিশ আর পাপে ছুঁয়ে আছে। এই দুটোর হাত থেকে ছাড়ান চাই। বড জোত্‌মালিক বলে, বর্গার টাইমে তোকে সেটেলমেণ্ট অফিসে গিয়ে বলতে হবে, তুই আমার জমি ভাগে করিস্‌ না, তুই আমার মাইনে করা লোক।

বাক্যটি কুঁড়োরামকে এফোঁড় ওফোঁড় করে। পেটে ভাতজল না থাকায় সে এই বিপজ্জনক দিকটাকে স্মৃতি থেকে খুঁজে আনতে পারে নি। সে বোঝে, তাব হয়ে গেলো। সংসারের সোনা সমুদ্দুরে একটি মাত্র কুটো তার হাতে ধরা ছিলো, সেটি তার বউয়ের সঙ্গেই সংসার ত্যাগ করলো।

ইহকালের সর্বস্বের বিনিময়ে পরলোক ঠিক রাখার ব্যবস্থা করে কুঁড়োরাম ফিরলো। বড় জোত্‌মালিক তার সার গোবর টানাটানি করার টুটা ফাটা গাড়ীটা দিয়েছে। বলদ দুটি কুঁড়োরামের আনুপাতিক। চালক পাওয়া যায়নি। কেউ এই মড়া নিয়ে তিরিশ মাইল ঠ্যাঙাতে রাজী নয়।

ছেঁড়া কানি আর নারকোলের দড়ি দিয়ে জম্পেশ করে লাশ বেঁধে গরুর গাড়ীতে ফেলে ছিটু ডোম বলে, দুখানা ট্যাকা ফ্যালো বাত্তিকরেব পে !

কুঁড়োরাম বোবা চোখে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়।

ছিটু ডোম দু আঙুল তুলে বলে, দুট্যাকা গো। ইটা দস্তুর বটে। মোর পাওনা।

কুঁড়োরাম হাত ওলটায়। অর্থাৎ কিছুই নেই।

—তাহলে তো লাশ আমাকে ফের ঘরে ফেলতে হয়।

ছিটু তার আশু কর্তব্যের কথা ঘোষণা করে। কুঁড়োরাম পষ্টাপষ্টি বুঝে যায়, পাপের হাত থেকে তার ছাড়ান নেই। পাপ তাকে ধরলো বলে।

কিন্তু এই মুহূর্তে পুলিশ আবার তাকে ধরে। একটু চাপা গলায় আর এক আইন সঙ্গত প্রস্তাব দেয়, কুড়িটা টাকা ছাড়ো হে !

নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ না থাকায় কুঁড়োরাম ঝপ করে প্রশ্ন করে ফেলে, কেনো ?

পুলিশ অবাক হয়। এরকম গাড়োল তাদের কখনো চোখে পড়েছিলো কিনা মনে আনতে পারে না। তারা চোখ উঁচুতে এবং গলা নিচুতে রেখে বলে, তোকে আমরা চালান দিতে পারি, জানিস। তুই যে বউকে ফলিডল দিয়ে মারিসনি তার প্রমাণ কি ?

কুঁড়োরাম আবার বোকামি করে। বলে, আমি সত্যি সত্যি মারিনি !

একশো তেত্রিশ বছরের অভিজ্ঞ পুলিশ চোখ চাওয়া চাওয়ি করে। এরকম লোকের সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেন চালানো খুবই মুসকিল। তথাপি ধমক দেয়, সে তো দশটা খুন করে এসে লোকে বলে—আমি খুন করিনি।

কুঁড়োরাম খুনী হলেও হতে পারে—এর সপক্ষে যুক্তিটা অকাট্য। সুতরাং কুড়ি টাকার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

পুলিশ আবার হিসাব দাখিল করে, বাড়তি পনের টাকা ট্যাঁকে গুঁজে নিয়ে যেও কিন্তু। ডাক্তারকে দশ আর ডোম্‌নীকে পাঁচ না দিলে লাশ চেরাই হবে না।

ফলে সাঁইত্রিশ টাকার একটা বিকট অঙ্ক কুঁড়োরামের সামনে হাঁ করে দাঁড়ায়। সে বোঝে, লাশ তার ঘরে পচবে। পাপ আর পুলিশ তাকে ছাড়বে না।

এদিকে খেঁদু বুড়োর গলা খ্যান খ্যানায়, আ কুঁড়ো, মরা ঘরে রেখে আর কত পাপ করবি!

তখন আর একজন পরামর্শ দেয়, কুঞ্জর কাছে যা কুঁড়ো। চোখে আবার অন্ধকার দেখে কুঁড়োরাম। কুঞ্জ মানে যমের অধিক কিছু। একবার টাকা নিলে এজন্মে আর ছাড়ান নেই। আর কুঞ্জ তাকে টাকা দেবেই বা কেন।

তথাপি তাকে কুঞ্জর কাছেই যেতে হয়।

শুনে কুঞ্জ বলে, তোকে ট্যাকা দিলে শোধ হবে কি করে?

সুতরাং এক ফুঁয়ে বাতি নিভে যায়। এর চাইতে বড় সত্য কুঞ্জ ও কুঁড়োরামের কাছে আর কিছু নেই।

কুঁড়োরাম কাকুতি মিনতি করে। হাতে পায়ে ধরতে চায়। সমস্ত রকম দীনতার লক্ষণ প্রকাশ করে।

শেষে বিরক্ত কুঞ্জ বলে, দিতে পারি, তবে—

বোকা হাবা কুঁড়োরাম বোঝে, শত। জন্ম থেকে তো শতেরই শরশয্যা কিন্তু তার তো বিনিময় যোগ্য কিছু নেই। তার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে।

কুঞ্জ বলে, চল্লিশটা টাকা দিতে পারি, যদি তোর ঘরের পিছনের সেগুন গাছটা বিক্রী করিস্।

আবার স্মৃতির বিশ্বাসঘাতকতা। কুঁড়োরাম ভাবে, তার যে কত সম্পদ আছে সে হিসাব সে নিজে না জানলেও বড় জোত্‌মালিক আর কুঞ্জ ঠিক জানে।

কাজেই আশৈশব ছায়াদাত্রীকে সে চল্লিশ টাকায় বেচে দেয়।

ছিটু ডোমকে দুই, পুলিশকে কুড়ি, বাচ্চাকাচ্চাদের জন্য সদু খুড়ীর হাতে দুই দিয়ে অবশিষ্ট ষোল টাকা ট্যাঁকে গুঁজে কুড়োরাম তার ইহকালকে বউয়ের লাশের সঙ্গে নারকোল দড়ি দিয়ে বেঁধে সদরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

তার পিছনে পড়ে থাকে একটি অজ গণ্ডগ্রাম। যেখানে দুটি মাত্র মহাবৃক্ষ মাথায় আকাশ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। বড় জোত্‌মালিক আর কুঞ্জ। বাদবাকি সব আগাছা। জন্মাচ্ছে, ঝরছে, মরছে। হিসাব বহির্ভূত!

যাত্রাকালে খেঁদু বুড়োর গলা ক্যানেস্তারার মত বেজে ওঠে, শিব,শিব!

কুঁড়োরাম সদরে পৌছায় মধ্যরাতে। হাসপাতালের পেছন দিকটায় এসে গাড়ী খোলে সে। গরু দুটিকে গাছের সঙ্গে বাঁধে। সে তার বউয়ের লাশ আর গরু পাহারা দেবার জন্য গাড়ীর চাকায় হেলান দিয়ে বিনিদ্র রাত্রি যাপন করে। ক্লান্তি এবং ঘুম সারা রাত্রি তার উপর উৎপীড়ন করে। তবু সে ঘুমোতে পারে না। গরু দুটি কেউ খুলে নিয়ে গেলে তার আর কিছু বাকি থাকবে না।

ভোর হলে সে টের পায়, পাকস্থলীর এ রকম শূন্যতায় এক মড়া ছাড়া আর কারো পক্ষে নিরুপদ্রবে শুয়ে থাকা সম্ভব নয়। যোল টাকার থেকে একটি টাকা বার করে সে সামনের দোকান থেকে পঞ্চাশ পয়সার জিলিপী কিনে খেয়ে এক পেট জল খায়।

ফল দেখা দেয় হাতে হাতে। পাঁচ মিনিটের মাথায় তার হড হড করে বমি হতে থাকে। প্রাণপণ চেষ্টায় সে পঞ্চাশটি পয়সাকে পাকস্থলীতে ধরে রাখতে পারে না। জিলিপী, জল পিত্ত রসে জারিত হয়ে সবটাই মাটিতে পড়ে। এবার অসহনীয় ক্ষুধার সঙ্গে বমির ধকল যুক্ত হয়। তার শরীরে অবসন্নতা আরো ঘনিয়ে ওঠে।

এইখানে কুঁড়োরাম ভারতীয় জীবনের মহান উত্তরাধিকার হারায়। উপবাস জীবের শরীরকে নির্লোভ, নিষ্কাম আর নির্মেদ করে। কুঁড়োরাম নির্মেদ বটে, তবে নির্লোভ আর নিষ্কাম নয়। হলে সে বউয়ের লাশ ফেলে রেখে জিলিপী খেতো না।

এই সময় হাসপাতালের কেউ একজন এসে বলে, লাশ ঐ মড়া কাটা ঘরের বারান্দায় নামিয়ে রেখে এসো। কাটা ছেঁড়া করতে সেই তিনটে।

কুঁড়োরাম বউয়ের পচে ওঠা লাশ পাঁজাকোলা করে নিয়ে যেতে গিয়ে তিনবার নামায় আর হাঁপায়। মরার পরে ওজন বাড়লেও তার বউয়ের তো এতটা ভারী হবার কথা নয়। পাঁচটি সন্তানের প্রসব আর নিরন্তর ক্ষুধা তো তার অস্থি মজ্জা মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছে। ক্ষয় পেতে পেতে সে ছোট্টটি হয়ে গেছে, এতটুকুন। কুঁড়োরাম বোঝে, তার শক্তিহীনতাই বউয়ের লাশকে ভারী করেছে। সে লাশ রেখে এসে গরু দুটিকে চোখের

উপর ধরে বসে। তার মাথার ভিতরটা জটপাকানো আর ধোঁয়াটে। সে কোন দিকে না তাকিয়ে একদিকে তাকিয়ে বসে থাকে।

খাড়া হয়ে থাকা গাছের ছায়ারা ক্রমশ ভূতলশায়ী হয়। অর্থাৎ সূর্য ক্রমান্বয়ে পশ্চিমগামী। বাড়তি পঞ্চাশ পয়সার সঞ্চয় খরচ করতে কুঁড়োরামের ভরসা হয় না। কি জানি, কখন কিসে লাগে। এখন আর তার ক্ষিধের অনুভূতি নেই। মনে হয়, কোন্ এক অজানা ছিদ্রপথ দিয়ে তার বোধশক্তি ঝরে গিয়ে তাকে একেবারে শূন্য করে ফেলেছে।

ঠিক তখনই তার ডাক আসে। সে ডাক্তারকে ডোমনী আর ডোমনীকে ডাক্তার ভেবে দুজনকেই অপমানিত করে। দুজনের কাছ থেকেই গাল খায়। পাঁচ ও দশটাকা তারা পদমর্যাদা অনুসারে ভাগ করে নেয়।

পোড়াবার অনুমতি পত্র আর লাশ নিয়ে কুঁড়োরামের এবার ফেরার পালা। গাড়ী জুত্‌তে গিয়ে কুঁড়োরামের ভিরমি লাগার দাখিল। একি, বলদ দুটির জায়গায় বড় জোতমালিক আর কুঞ্জ দাড়িয়ে আছে! সে হাত জোড় করে জড়ানো গলায় বলে বলে, আজ্ঞে গরীবের তরে আপনারা এলেন শেষকালটায়। বড় জোত্‌মালিক রাগী গলায় বলে, তোকে ফলিডল দিয়েছিলাম ক্ষেতের পোকা মারাব জন্য। তোর বউ কেন সেটা খেয়ে দিলো?

ওলটানো জিভকে কোনক্রমে বশে এনে কুঁড়োরাম বলে, এবারকার মত ক্ষমা কইরে দিন আজ্ঞে। বউটা আমার ঐ রকম। ক্ষিধে পেলে কি খাচ্ছে সে জ্ঞান থাকে না। কিন্তু বলদ দুটি গেলো কোথায়?

তখনই বুকে মুখে লেজের ঝাপ্‌টা খায় কুঁড়োরাম। তবে কি সে এখন দিব্যজ্ঞানের কাছাকাছি! সমস্ত জীবকে একীভূত দেখছে। তারপর সে গোঙানো স্বরে বলদ দুটির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাদের গাড়ীতে জোতে। নিজেকে গাড়ীর মাথায় তুলে দেয়।

প্রকৃতিজাত শক্তিতে বলদ দুটি গত রাতের পথ ধরে ফিরতে থাকে। পথের দুধারে অনেক আলোকিত দোকান পাট থাকে, পথে পথচারী থাকে, কিন্তু কুঁড়োরাম কিছু দেখতে পায় না। পথচারীরা নাকে রুমাল দিয়ে বা নাক টিপে তিন লাফে দূরে পালায়। কুঁড়োরাম দেখতে পায় না। কুঁড়োরাম বুঝতে পারে না, তার বউয়ের লাশ এখন গন্ধের উৎস। সদরের পথে পথে সে অযাচিত গন্ধ বিলাতে থাকে।

তারপর একসময় সদরের পথ শেষ হয়। অভ্যাসবশত গরু দুটি মাঠের একটা দিক ধরে নেমে পড়ে। দূর দিগন্ত রেখার ওপার থেকে এসময় একটা প্রকাণ্ড চাঁদ উঠে এসে গরুর গাড়ী, পচন ধরা লাশ আর কুঁড়োরামকে অভ্যর্থনা জানায়।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে দিব্যজ্ঞানী হবার পূর্বক্ষণে মহাপুরুষদের যা যা হয় কুঁড়োরামেরও সেই সব সুরু হয়ে যায়। এখানে অবশ্য বিজ্ঞানের একটু ইয়ার্কি মারার সুযোগ থাকে। দীর্ঘ অনাহারে অবশ স্নায়ুমণ্ডলী, বিবশ মস্তিষ্ক। ফলে নাকি হ্যালুসিনেশন্ না বিকার দর্শন কি সব ঘটে। কিন্তু ইয়ার্কিতে ভারতের আত্মিক সম্পদ টস্‌কায় না। এ সময় মহাপুরুষরা যা যা দেখে কুঁড়োরামও তাই তাই দেখে।

প্রথমে একটি অপূর্ব নারী মূর্তি। রূপ লাবণ্য আর যৌবন অকল্পনীয়। সে নাচের মুদ্রায় মদন ভস্ম করে ক্রমশ নিকটবর্তী হতে থাকে। কুঁড়োরামের মনে হয় সে নিজের বুকে ঢাক বাজাচ্ছে।

সেই রূপবর্তী আরো কাছে এলে কুঁড়োরাম বিস্ময়োক্তি করে, আজ্ঞে আপনি! নারী অথবা বড় জোত্‌মালিক দীঘল চোখে বিদ্যুৎ হানে। ছল করে আঁচল ফেলে দিয়ে বাঁকা হেসে বলে, সেটেলমেণ্ট অফিসে যাবি তো? জিজ্ঞেস করলে বলবি—জমি ভাগ চাষ করিস না। তুই আমার মাইনে করা লোক।

কুঁড়োরাম অটল ভঙ্গিতে বলে, না।

কটাক্ষ বাড়ে, ছলকলা বাড়ে, নাচের মুদ্রা তীব্রতর হয়।

—বলবি, তুই আমার মাইনে করা মুনিষ।

—না! কুঁড়োরাম অটল।

রমণী দূরে যায়। কাছে আসে। কাছে আসে। দূরে যায়।

ইতিমধ্যে জাগতিক নিয়ম কার্যকরী হওয়ায় লাশ গন্ধ ছাড়ে। গন্ধ ছড়ায়। প্রলুব্ধ করে। দুটি শিয়াল মন্থরগতি গাড়ীর পশ্চাতে লাইন লাগায়। লাশের ফাটা ত্বক থেকে ঝরে পড়া রস চাটতে চাটতে তারা অনুবর্তী হয়। পুলকিত জ্যোৎস্নার সঙ্গে হু হু করা দক্ষিণের বাতাস এসে মেশে। লাশের শরীর থেকে ছোঁ মেরে গন্ধ তুলে নিয়ে গ্রাম গ্রামান্তরের উপর দিয়ে হাওয়া বইতে থাকে।

আবার নারী মূর্তি। আবার নাচ। আবার ছলাকলা। রক্ত উতরোল করা সেই নারী কাছাকাছি হলে কুঁড়োরাম পুনরায় বিস্মিত হয়ে বলে, আজ্ঞে আপনিও!

চোখ অন্ধ করা সুন্দরী অথবা কুঞ্জ আঁচলের আড়াল থেকে একটি কুঠার বার করে। মদির কণ্ঠে বলে, চল্লিশ টাকার সুদ হয়েছে চল্লিশ টাকা। গাছ বাবদ চল্লিশ বাদ যাবে। বাকি চল্লিশ তুই অল্পে অল্পে শুধবি।

তারপর একটি কটাক্ষ ছুড়ে বলে, গাছটা তাহলে কেটে নিলাম।

অটল কুঁড়োরাম ঘোষণা করে, না!

নাচ হৃদয় বিদারী হয়। ছলাকলা তুঙ্গে ওঠে।

—গাছটা তা হলে কেটে নিলাম।

—না! কুঁড়োরাম সমান অটল থাকে।

গরুর গাড়ী সমান মন্থর গতিতে চলে। লাশের গন্ধ বাতাসের পিঠে ভর করে উড়ে যায় লোকদের দিকে।

কুঁড়োরাম এবার মহাপুরুষদের ন্যায় দর্শনের দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করে।

চতুর্দিকে আগুনের ঝড়।

অমঙ্গলসূচক ধ্বনি সচল মনকে সন্ত্রস্ত করে তুলছে। মাটির উপর গুমগুম পা ফেলে কারা যেন সব এগিয়ে আসছে। বড বড় সব মূর্তির চোখের গর্ত থেকে আগুন ছিটুছে। হাঁ করা মুখের মধ্যে ছুরির মত চকচকে দাঁত। তীক্ষ্ণ মুখ বল্লমের মত লম্বা লম্বা নখ! কুঁড়োরামকে চারদিক ঘিরে তারা এগোয়।

আরো কাছে এলে কুঁড়োরাম দেখে একজন বড় জোত্‌মালিক, অন্যজন কুঞ্জ। সঙ্গে হাতে বন্দুক মাথায় টুপি সব উলঙ্গ পুলিশ।

সে বলে আজ্ঞে, আপনাদের এরকম বেশ!

তাদের ধাতব অট্টহাসি বাতাসে ফটাফট বাজতে থাকে। পুলিশরা তাকে ভেংচি কাটে। বন্দুক দেখায়।

বড় জোত্‌মালিক গর্জন করে, তোকে বলতেই হবে, তুই আমার মাইনে করা মুনিষ।

কুঞ্জ চিৎকার করে, এই গাছ আমি কাটলাম।

কুঁড়োরাম কঠিন গলায় বলে, না, কিছুতেই না। না, কিছুতেই না!

তার এই অস্বীকৃতিমূলক বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে কৃষ্ণ আর বড় জোত্-মালিক তাকে নখে ছিঁড়তে আসে।

পুলিশদের গলা থেকে বিকট আওয়াজ হয়। ওরা বন্দুকের নল ঘুরিয়ে দেয় কুঁড়োরামের দিকে।

লাশের গন্ধ বাতাসে ভাসে।

পরদিন ছমছম ভোরে অজগণ্ড গ্রামের হাঘরে গাঁয়ের লোকেরা গরু, গাড়ী, অর্দ্ধমৃত কুঁড়োরাম আর বউয়ের আধপচা লাশ আবিষ্কার করে। ওরা কুঁড়োরামকে নামিয়ে নিয়ে অন্নজলের মুখ দেখায়। নাকে ছেঁড়া গামছা বেঁধে বউয়ের পচা লাশ দাহ করে।

ঠিক তিনমাসের মাথায় কুঁড়োরাম বড় জোত্মালিকের সঙ্গে সেটেলমেন্ট অফিসে যায়। সে মহাপুরুষ নয় বলেই মরা বউয়ের নামে করা কিরা রক্ষা করে। বড় জোত্মালিকের জমি বর্গা হয় না। সে কৃষ্ণকে অবাধে সেগুন গাছ কেটে নিয়ে যেতে দেয়। এবং সুদের চল্লিশ টাকা আস্তে আস্তে শুধবে বলে কথা দেয়।

পার্থিব অপার্থিব বলতে কুঁড়োরামের আর কিছুই থাকে না। সে বর্গার জমি, ঘরের পিছনের সেগুন গাছ, বউ, লোভ মোহ মায়া সবই হারায়। সব হারিয়ে পরম জ্ঞানীর মত সে আবিষ্কার করে, তার বুকের নীচে ধারালো কুঠারের মত কি যেন একটা চকচক করছে।

সে নিজে বুঝতে পারে না।

অন্যেরা টের পায়, সেটি ঘৃণা।

মারাত্মক ঘৃণা!

ঘৃণা থেকেই নাকি ক্রোধের জন্ম।

ফলত কুঁড়োরাম সহনশীল ভারতীয় সমাজের মহান উত্তরাধিকার হারায়।

ক্ষেতু বাগ্‌দীর স্বাধীনতা

রাগে গজগজ করে উদাসী।

একে বুড়ো হলে মানুষের মাথায় নানান বাতিক ঘুষরো পোকার মত কুরকুর করে, তায় শহর থেকে বাবুরা এসে এমন কাণ্ড বাধিয়ে রেখে গেল, মরণ হয়েছে উদাসীর। দাওয়ায় বসে বুড়ো এখন অষ্টপ্রহর ট্যাকস্ ট্যাকস্ করে ডাক পাড়ছে, 'উদাসী! অ উদাসী! কমনে গেলি রে উদাসী।'

উদাসী ঝামটা মারে, 'যোমে খায়নি এখুনো। কি বইলবেক বলো?'

'আঃ, আগ কইরছিস কেন বটে।'—অবশিষ্ট কটি দাঁতের নড়বড়ে দুর্বল পাহারা অগ্রাহ্য করে বুড়োর জিভ ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে লোল হয় বলে প্রায় সব কথাই জড়ানো এবং অস্পষ্ট। উদাসী ছাড়া অন্যের পক্ষে বোঝা কষ্টকর। বুড়ো বিড়বিড় করে বলে, 'তা ইখানে যে কাণ্ডখানা হলেক, মোর পাঁচকুড়ি বয়সে কখনো দেখি নাই বটে।'

'তেবে আর কি, ঐ খোয়ারিতেই পেট ভরুক।'—মুখ ঝামটা দেয় উদাসী। বুড়োর গলায় এক ধবনের শব্দ হয়, যেটাকে অনায়াসে গোঙানী বলে মনে হতে পারে। আসলে সেটা তৃপ্তিসূচক। উদাসী বোঝে।

বুঝে মুখ বাঁকায়, 'মরণ দেখো দিনি বুড়োর।'

কাঁপা কাঁপা হাতে হাতছানি দেয় বুড়ো। জরায় মরা স্বরকে যথাসাধ্য কোমল করে ডাকে, 'অ উদাসী, আয় আয়। টুকুন কাছে আয় মা।'

উদাসী তার মরা ছেলের বেধবা বউ। এমনিতে মেয়েটা বড় চোপাবাজ। তবে বড় ভাল। তাদের ছোট জাতের মধ্যে বেধবাদের বিয়েতে না-নিষেধ নেই। কিন্তু মেয়েটা তাকে ছেড়ে যায়নি। নিজের সোমত্থ শরীরের জ্বালা যন্ত্রনা সয়ে সোয়ামীর আধমরা বাপকে আগ্‌লে রেখেছে।

উদাসী কাছে এলে বুড়ো খুব চিন্তিত গলায় বলে, 'তা হ্যা রে উদাসী,

বাবুরা যে মোর হাতে দড়ি ধরিয়ে দিলেক, আর আমি টেইনে পরে বাঁশের মাতায় তুইলে দিনু—যেটা বাতাসে পত্‌পত্‌ কইবে উড়তে লাগলো, বলি সিটাই তো সাদিনোতা না কি?—বলেই বুড়ো হাঁ করে। কানে খাটো বলে বুড়োর এই হাঁ করে কথা শোনার মুদ্রাদোষ দাঁড়িয়ে গেছে।

এই এক বাক্যি শুনে শুনে ক'দিনে উদাসীর কান পচা। সে তেতো বিরক্ত হয়ে বলে, 'তুমি আর মোকে জ্বালিও না দিনি বাপু। আমি কি নেকাপড়া জানা বাবুদের ঝিয়ারী, যে তুমার জবাব ফসফস কইরে দিয়ে দুবো?'

বুড়ো একমত হয়ে মাথা নাড়ে, 'ইটা ঠিক কথা বুইলেছিস্ তুই। ই জবাবটা অতয় সোজা লয়। কতয় লিখাপড়া বাবুরা মাতা ঘামাই তেবে ইটা বার কইরেছে! হ্ হ্ বাবা।'

বিষয়টা বুড়োর কাছে যত দুর্বোধ্য ঠেকছে, ততই তার ভক্তি বাড়ছে। এটা হলো গিয়ে বোকাসোকা মানুষদের এক প্রকারের কাণ্ডন। বোঝা না গেলেই ভয়, ভক্তি। সেই রকমটাই হয়েছে বুড়োর। অথচ এধারে আবার ব্যাপারটা না জানলেও শান্তি নেই। মনে কাঁটা খচখচাচ্ছে। এই এক বিষম জ্বালার ছটফটানিতে পড়ে বুড়ো হাতের পাচ উদাসীকেই থেকে থেকে জ্বালিয়ে মারছে।

উদাসী বলে, 'তা তুমি সিদিন বাবুদের ঠেঁয়ে শুধালে নাই কেনে?'

'আই বাপ, কতয় লিখাপড়া লোক সব। কি বইল্‌তে কি বইলবো।'

'তেবে আর কি, দাবায় বইসে চিঁচাও। আকাশ খিকা কুমড়ো পানা জবাব ধপাস কইরে পড়বে। আমি বাপু এখন আর দাঁড়াতে লারছি। ফিরে পরে তো আবার আথায় আগুন দিতি হবে।' উদাসী আর দাঁড়ায় না।

এখানে বসে মাথার উকুন খোঁজার মত জবাব খুঁজলে তার চলবে না। ভোরে উঠে দুটি মানুষের পেটের খোরাক তাকে গতর খাটিয়ে আনতে হয়। তবে বলিহারি যাই বাবুদের। না হোক তার সোমসারে একটা ঝনঝাট বাধিয়ে রেখে গেলো। কাজটা তো বাবুরা নিজেদের হাতেই করতে পারতো। দড়ির সঙ্গে গেরো দেওয়া তিন রঙা কাপরে কালিটাকে সবাই মিলে চেঁচাতে চেঁচাতে টেনে বাঁশের মাথায় তোলা। এই সহজ কাজটাই এই ঘাটের মড়াকে দিয়ে করিয়ে উদাসীর জ্বালা বাড়িয়ে রেখে গেছে বাবুরা। নেকাপড়া জানা লোকেরা বড় খেয়ালী হয়।

উদাসী বেরিয়ে যেতেই বুড়ো দাওয়া থেকে হামাগুড়ি দিয়ে নামে। বেড়ার গা থেকে খুঁজে পেতে নিড়ানীটা নেয়। কোমরের কাছ থেকে শরীরটা ভেঙ্গে পড়াতে বুড়ো নিজেই একটা সমকোণ হয়ে হাঁটে। নিড়ানী হাতে বুড়ো বেগুন ক্ষেতে নামে। লেটকী মেরে মাটিতে বসে দুই ধার থেকে মাটি তুলে বেগুন গাছের গোড়ায় দিতে থাকে। তার ঝুলে পড়া জিভের অগ্রভাগ থেকে টসটস করে লালা ঝরে মাটির ওপর।

বাবুদের কাছে ধানের হিসেব করতে যাচ্ছিলো লাটু মাঝি। বেগুন ক্ষেতে বুড়োকে দেখে দাঁড়ায়। গলা চড়িয়ে ডাকে, 'ক্ষেতুদা নাকি গ! অ ক্ষেতুদা।'

বুড়ো প্রথমে মুখ তোলে। তারপর কাঁপা কাঁপা হাত রাখে চোখের ওপর। তাতেও যখন ডাক পাড়া মানুষটাকে চিনতে পারে না, কোমরের কানি সামলাতে সামলাতে কোনরকমে উঠে আসে। বেড়ার ধারে এসে বলে, 'অ, লাটু বটে।'

'হ্। তুমাকে দেইখে পরে ডাকলম।'

'তা কথাকে চললা বটে?'

'যাই, মেজবাবুর ঠেঁওয়ে ঘুরে আসি গ। এ সনে তো ধানের হিসাবটো দেখি নাই এখুনো।'

'হ্ হ্, সিটাতো দেখা নাগবেই।' বুড়ো হাঁ করে মাথা নাড়ে।

সকালের রোদ এখন চনচনিয়ে উঠেছে। চরাচরে এই রৌদ্রের উজ্জ্বল আভা। ফাঁকা ফাঁকা এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ঝুপরী ঝাপরা ঘর বাড়ী। একদল মানুষ যেন প্রাণপণ চেষ্টায় ঘর গৃহস্থালী গুছিয়ে উঠতে পারেনি। সব এই রকমই এলেবেলে।

মূল গ্রামটা থেকে পাড়াটা যেন একটু ঠেলে দেওয়া গোছের। সামনে একটা এঁদোপেদো বাগান। সেটা পেরিয়ে খানিকটা নাবাল জমি। তারপর একটু ওপরের দিকে উজিয়ে উঠলেই গ্রামের শুরু। সেখানে ঘর গৃহস্থালী একটু গোছগাছ করা। গোয়াল ঘর আর বসত ঘরকে আলাদা করা যায়। কয়ালবাবুদের কথা অবশ্য আলাদা। পাকা বাড়ি, বাগান, পুকুর, জমজমাট। এক মেজবাবু ছাড়া কয়ালবাবুদের আর কেউ এখানে থাকে না। দেখা-শোনার দায়দায়িত্ব সব মেজবাবুর ঘাড়ে। মানুষটি খুব মুরদদার। নানা ব্যাপারেই জড়িয়ে জাপটিয়ে আছেন। তবে দোষের মধ্যে একটু বদরাগী

গোছের। তার জমিই ভাগায় করে লাটু মাঝি। এ সনের হিসেবটা এখনো বাকী। সেই কারণেই যাওয়া। লাটু শুধোয়, বিড়ি খাবে নাকি গ ক্ষেতুদা?

'থাইকলে দাও কেনে এট্টা।'

ক্ষেতু বুড়ো বেড়ার ধারে বসে। বেশী সময় সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। লাটু কাপড়ের খুঁট খুলে বিড়ি আর দেশলাই বার করে। নিজে একটা ধরায়। বুড়োরটা ধরাতে গিয়ে গোটা তিনেক কাঠি খরচা হয়ে যায়। মনটা একটু খচখচ করে লাটুর। বিড়িটাকে জুত করতে নিয়ে সেটাকে লালায় মাখামাখি করে ফেলে বুড়ো। টানতে গেলেই কাশি পায়। তবু নেশার বস্তুটাকে মূল্যবান কোন সামগ্রীর মত আঁকড়ে থাকে।

মানুষটাকে দেখতে দেখতে লাটুর একটু কষ্ট লাগে। এত বড় জোয়ান ছেলেটা বেঘোরে মরলো। সে কষ্টের ঘা তো বড় কম নয়। অন্নের টান আর শোকের টান দুইই তোমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে কাবু করে ফেলবে জলদি জলদি। বয়স মানুষটাকে জবুথবু করে ফেলতে পারতো না কালো অমন করে চলে না গেলে। এখন যে করে কম্মে খাওয়াবে এমন লোকও তো নেই। থাকার মধ্যে ছেলের বেধবা বউ উদাসী। তা মেয়েছেলে মানুষ আর কত করবে! আর এ পাড়ায় তো সকলের ঘরেই এত বড় ছাঁদা যে আনার তর সয় না।

ক্ষেতু হঠাৎ জরার থাবায় কোঁচকানো মুখটাকে ওপরের দিকে তুলে বলে 'সি দিন তো তুমি সিথানে ছিলা হে লাটু?'

অন্যমনস্ক লাটু ঠাহর করতে না পেরে শুধোয়, 'কুথাকে?'

বুড়ো হাঁ করে দম টানে। তারপর বলে, 'অই যে হে—শহর থিকে বাবুরা এইসে পরে মোকে দে তোলালেক।'

'হ হ, ছিলম বটে ছিলম।' লাটুর যেন হঠাৎ একটা বড় ব্যাপার মনে পড়ে যায়।

গলায় শ্লেষ্মা পরিষ্কার করে বুড়ো খুব চিন্তিত গলায় বলে, 'তা হ্যাঁ হে, বাবুরা যে মোর হাতে দড়ি ধইরে দিলেক, আর আমি টেইনে পরে বাঁশের মাতায় তুইলে দিনু, যিটাগে তুমার বাতাসে পতপত কইরে উড়তে লাগলো, সিটাইতো স্বাদিনোতা, না কি? বলে বুড়ো শোনার অপেক্ষায় হাঁ করে

থাকে। এই প্রশ্নে খুব জটিল ধাঁধায় পড়ে লাটু মাঝি। এটাতো সে ভেবে দেখেনি। লাটু মাথা চুলকায়।

এসব নিয়ে যখন বাবুরা কথা চালাচালি করছিলো, সেও তখন মেজবাবুর ওখানেই হাজির। গাঁয়ের সব চাইতে বুড়ো মানুষের খোঁজ করছিলো বাবুরা। শহরের ঝকঝকে সব সুন্দর সুন্দর বাবু। দেখে চোখে ভড়কি লাগছিলো লাটুর। শহর থেকে বাবুরা এলেটেলেই মেজবাবু তাকে ফাই-ফরমাসের জন্য ডেকে পাঠান।

শুনে লাটুই প্রথম বলেছিলো, 'মোদের ইখানে তো সকলার চাইতে-বুড়ো মানুষ ক্ষেতুদা।'

'কে ক্ষেতুদা?'—চোখ কুঁচকে মনে করার চেষ্টায় ছিলেন মেজবাবু।

'মোদের নামু পাড়ার ক্ষেতু বাগদী। বহুৎ বয়েস হবেক মেজবাবু, লেকাজোকা নেই।'

'সেই যে জমির দাঙ্গায় মরেছিলো কালো, তার বাপ তো?'

'হ্ হ, সিই বটে।'

শুনে মেজবাবুর মুখ গহীন দীঘির জলের মত থমথমে হয়। লাটুর ভয় লাগছিলো। সে পূর্বাপর কিছু না ভেবেই নামটা বলেছিলো ক্ষেতুর। সে সরল সাপটা মানুষ। কি করে বুঝবে, ক্ষেতুর নাম এলে কালোর নাম আসে, কালোর নাম এলেই এক টুকরো জমি, মেজবাবু, একটা বন্দুকের আওয়াজ আর কালো বাগদীর বুকের ছ্যাঁদা দিয়ে গড়িয়ে পড়া রক্তের ধারা এসে যায়। আর এ সব এলে মেজবাবুর মেজাজ বশে থাকে কি করে?

বাবুদের দিকে ফিরে ভারী গলায় মেজবাবু বলেন, 'এতে ছোটলোকেরা আসকারা পেয়ে যাবে না? আপনারা তো গ্রামের মানুষের চরিত্র বোঝেন না।' মেজবাবুর কথার পিঠে বাবুরা কি সব বলাবলি করেছিলো। লাটু সব বোঝেনি। মেজবাবু ঠোঁট কামড়ে খানিকসময় কি ভেবে বলেছিলো, 'ঠিক আছে। তবে তাই করুন।'

সুতরাং গোড়া থেকেই ঘটনাটা জানা লাটুর। তার অন্তত জিনিসটা বলতে পারা উচিত। তা না হলে ক্ষেতুদা ভাবতে পারে, তুমি আগ বাড়িয়ে আমাকে খবরাখবর করলে, আর সেই তুমি কিনা জিনিসটার মানে জানো না।

লাট্টু খুব চিন্তিত গলায় বলে, 'কিন্তুন সিটা বাতাসে উড়তে লেগেছিল—মানে, তুমারে দিয়ে পরে যিটা তুলালেক, সিটারে তো বাবুরা পতাকা বইলেছেল।'

'অ!'—বুড়োর গলা বেশ হতাশ শোনায়। কথাটার এত সহজে নিস্পত্তি হওয়াতে তার ভাল লাগছে না। এতদিন ধরে ভেবে ভেবে সে যেটা বার করতে পারেনি, লাট্টু এসে সেটা ঝপাৎ করে বলে দিলো! বলে দিলেই হল আর কি! এ যেন ভিক্ষা ভাত কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ঝপাঝপ মেরে দিলাম এক পেট।

লালায় মাখামাখি বিড়ির টুকরাটা ছুঁড়ে দিয়ে বুড়ো উত্তেজিত কাঁপা গলায় বলে, 'তা'লে তুমি সাদিনোতা বল্বা কুনটারে? আর তো তুমার থাকলো সে বাঁশ আর দড়ি।'

'তা ঠিক।' লাট্টু মাথা নাড়ে। সাদিনোতা কথাটা সে শুনেছে বটে, কিন্তু কোনদিন জানা হয়নি জিনিসটা কি। তারও তো বয়স এই তিন কুড়ি দশ হলো। অবশ্য জানবার বুঝবার তার সময়ইবা কোথায়। পোড়া পেটের জন্য কি কিছু ভাববার উপায় আছে।

মুখে বলে, 'মোর মনে লয় ক্ষেতুদা, তুমার ঐ পতাকাটোর ভেতরেই সাদিনোতা জিনিসটা রয়েছে।'

এবার ভাঙ্গা বাড়িতে আলো পড়ার মত বুড়োর মুখে হাসি দেখা দেয়। জরাগ্রস্ত মুখে মনের জটিল সূক্ষ্ম কারিকুরি প্রতিফলিত হয় না। চামড়া টান থাকলে লাট্টু দেখতে পেতো ক্ষেতু বুড়োর মুখে কৌতুক আর অবিশ্বাস মাখামাখি হয়ে আছে।

এবার বুড়ো বলে, 'তা'লে তো জিনিসটারে দেইখতে পেতম। মোর কথা ছাড়, আমি লজর খেয়েছি। কিন্তুন তুমি দেইখতে পেছ কি জিনিসটা? লাট্টু অবশ্য মিথ্যে বলবে না। তিনটে রঙ ছাড়া সে কিছুই দেখেনি। এবং তার মধ্যেও এ সংশয় দেখা দেয়, জিনিসটা এর মধ্যে থাকলে কিভাবে থাকবে! তার সরল মস্তিষ্ক এর উপায় অন্ত খুঁজে পায় না। এসব কি তাদের ভাববার বিষয়। তাহলে বাবুরা রয়েছে কি জন্যে? বিধাতা সবাইকে সব কিছু জানাতে বোঝাতে চাইলে তাকে লাট্টু মাঝি বানাবে কেন? সংসারে কত কি কিছু হয়, তুমি সব জানতে বুঝতে চেয়ো না লাট্টু।

সে বলে, 'জিনিসটা অত সোজা লয় ক্ষেতুদা।'

বুড়োর খোলা চোখ দুটি প্রখর হয়ে ওঠে। লাটুর এই বুঝতে না পারার স্বীকারোক্তি তাকে ভেতরে ভেতরে খুশী করে। তার গলার মধ্যে গোঙানীর আওয়াজ শোনা যায়। ঝুলে পড়া জিভকে সুরুৎ করে মুখের মধ্যে টেনে নিয়ে দুটো নড়বড়ে দাঁতের ফাঁকে আটকে রাখে।

'আমিও তো সিটাই বুলছি হে। জিনিসটা অতয় সোজা হলে বাবুরা কঠিন মাথা ঘামাই বার কইরবে কেনে?'

'হুঁ হুঁ'—লাটু মাথা নাড়ে। এই মুহূর্তে তাকে বেশ চিন্তিত দেখায়। জিনিসটা বুঝতে না পারার অস্বস্তি তার রয়েই যায়। কথাটা সেও দু'চারবার শুনেছে অবশ্যি। বাবুদের ঠেয়েই শুনেছে। কিন্তু জিনিসটা যে কি তা কাউকে শুধোনোও হয়নি আর দেখাও হয়নি নিজের চোখে। অদেষ্ট অদেষ্ট! নিজেকে ধিক্কার দেয় লাটু। সে মনে মনে ঠিক করে, ধানের হিসেব টিসেব চুকে গেলে মেজবাবুকে একবার শুধোবে। মানুষটা জানে শোনে অনেক। আইন আদালত বোঝে। ইনজিরি নেকাপড়া জানে। জিনিসটা তাকে ভালোই মালুম করাতে পারবে মেজবাবু।

বুড়ো তার কালের চিহ্নে ভরা রেখা কুটিল মুখটাকে আরো কুঞ্চিত করে বলে, 'তা একখানা কাণ্ড হলেক বাবু। মোর পাঁচ কুড়ি বয়সে কখুনো দেখি নাই।'

'সিটা যা বইলেছ।'—বলার মধ্যে গর্ব ফোটে লাটুর। তারা নামু পাড়ার নীচু মানুষ। তাদের কে ডাকে খোঁজে? বাবুরা তো পাড়ার ভেতরেই পা রাখে না কখনো। প্রয়োজনে ডাঙার ওপর থেকে ডাক পাড়ে, ওরে লাটু, ওরে দীনু। অথবা মুনিষ মাইন্দোর দিয়ে ডাক পাঠায়। আর এবার কিনা বাবুরা তাদের পাড়ার ক্ষেতুদারে দিয়ে পতাকা তোলালে। এটা কি কম কথা বটে। মনের ভাব সে গলা চড়িয়ে বুড়োকে জানায়, 'তুমার জন্যি ইবারে মোদের পাড়ার মান উঁচা হলেক। সক্কলে তাই বলাবলি কইরতে নেগেছে।'

'তা বটে—তা বটে।' তামাকের নেশার মত এই প্রশংসা বাক্য খুব তারিয়ে উপভোগ করে ক্ষেতু। লাটু উঁচু পাড়ার দিকে যায়।

বুড়ো কাঁপতে কাঁপতে হামা দিয়ে দাওয়ায় ওঠে। নিশানটা সেই খানেই

পড়ে থাকে। দেহের বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্রের যে প্রক্রিয়া তা এখন আর বুড়োর মধ্যে সঠিকভাবে কার্যকর নয়। ফলে এক আধটা ঝোঁকের বিষয় ছাড়া এমনিতে সে কিছু মনে রাখতে পারে না। বুড়োর জগৎটা যেন শীতের গাঢ় কুয়াশা দিয়ে ঢাকা। এই কুয়াশার মধ্যে একটা আধটা অস্পষ্ট নড়ন চড়ন তাকে কখনো কখনো দূরের স্মৃতি মনে করায়।

খানিক আগের আবেগ এবং হাঁটা চলার পরিশ্রম তাকে ক্লান্ত করে ফেলেছে। পেটের মধ্যে খিদের জানান। উদাসী আসবে পেট পার করিয়ে। খেতে খেতে সখি গড়িয়ে যাবে পাকা তরমুজের মত। দিনবেলা খুঁটে একবেলা খাওয়া। এরকমই চলে আসছে। তবে খিদে হলো গিয়ে পশুর মত। সময় হলেই ডাকবে, গজাবে। অবসন্ন বুড়ো দাওয়ায় কাৎ হয়। তার ঝুলে পড়া জিভ থেকে লালা গড়িয়ে পড়তে থাকে দাওয়ার মাটিতে।

উদাসী ফেরে, উঠোনে অর্জুন গাছের মাথায় সূর্য।

বুড়ো কাৎ হয়ে দাওয়ায় পড়ে আছে। তার মুখ থেকে এক বিঘৎ তফাতে লালার মধ্যে এক থোক লাল পিঁপড়ে। অন্য যে কেউ এই দশা দেখলে বুড়োকে মৃত বলেই মনে করতো। কিন্তু উদাসী জানে, বুড়ো এখন নিদ্রায় আচ্ছন্ন। উদাসীর হাঁড়িতে চাল ফুটে ভাতের ভাপসা গন্ধ ছাড়লেই বুড়োও ঘুম ভাঙবে। এর ব্যত্যয় হয় না কোনদিন। বুড়োর এমনিতে কোন তালজ্ঞান নেই, অথচ ফোটা ভাতের গন্ধে কখনো ভুলচুক হয় না। মরণ, মরণ! যমেও ছোঁয় না বুড়োকে। হাড়ে বাতাস লাগতো উদাসীর। দিবা রাত্তির এত হ্যাপা পোহাতে হতো না তাকে। আপদ নিয়ে তার ঘরে বাইরে কোথাও শান্তি নেই।

আঁচলে বাঁধা ক্ষুদকুড়ো একটা কানাভাঙ্গা হাঁড়িতে ঢেলে রাখে উদাসী। পরনের ন্যাতাপাতা কাপড় তার গতরে কুলোয় না। যে আঁচলে বুক ঢেকে সে লজ্জা নিবারণ করে, সেই আঁচলে ক্ষুধার অন্ন বাঁধলে লজ্জা ঢাকার পক্ষে অকুলান হয়। কিন্তু পেটের কাছে লজ্জা সরম মাথা খেয়েছে যে। উঁচু পাড়া দিয়ে পেরুতে গিয়ে বাবু মানুষের চোখ তার বুকে বিঁধে থাকে। নিরুপায় উদাসী লজ্জা দিয়ে লজ্জা ঢেকে আঁচলে ক্ষুধার অন্ন বেঁধে ঘরে ফেরে। উনুনে আগুন দিয়ে ভাতের হাঁড়ি চাপায় উদাসী। ডোবা হাটকে আনা

গুগ্‌লী ভাঙতে বসে। কচি সজনে পাতা দিয়ে গুগ্‌লীর ঝোল। বুড়ো মাঝে মধ্যে তাকে খাওয়া নিয়েও জালায়। ভাতের থালা ঠেলে দিয়ে গজগজ করে, 'সইজনে পাতা আর গুগ্‌লী, সইজনে পাতা আর গুগ্‌লী! তুর আর কিছু আম্নার জুটে না বটে? ই আমি রোজ দিন খাবোক নাই।'

এই ক্ষুদকুড়ো সংগ্রহের অপমান, জালা উদাসীর গায়ে সগু সগু লেগে থাকে বলে সে মেজাজ ঠিক রাখতে পারে না। মুখ ঝাম্‌রিয়ে বলে, 'যাওনা—কে কুথায় তুমার জন্যি পরমান্ন নিয়ে বইসে আছে, যাওনা সিথানে! মোকে জালাতে লেগেছ কেনে?'

বুড়ো তখন দুলে দুলে বিলাপ শুরু করে। মরা ছেলে কালোকে ডেকে ভাঙা গলায় চেঁচায়, 'তু কুথাকে গেলি রে, বাপ্‌ আমার! মোকে কেউ খেতি দেয় না। বেটা থাকলি মোরে মুসুরীর ডাল এনে খাওয়াতো, তেল দিয়ে সুসনী সাক ভেইজে দিত।' বুড়োর এমনি ধারা বিলাপ শুনতে শুনতে উদাসীর মাথায় আথার আগুন জলে। ঢ্যামনা বুড়োর গলা টিপে ধরতে ইচ্ছে করে। পুতেরে অকালে খেয়ে এখন সোহাগ দেখো না! কিন্তু উদাসীর মাথার আগুন বুকে আসে। আর বুকের আগুন চোখে জল হয়। টপটপ করে ঝরে শাক অন্নের থালায়।

তার কানে বাজে গুলি খেয়ে উলটে পড়া একটা জোয়ান মানুষের আর্তনাদ—'উদাসী রে, মোর বুড়ো বাপেরে তুই দেখিস উদাসী। বুড়ো বাপেরে তুই দেখিস।'

উদাসীর ধনুকের মত বাঁকানো ঠোঁটে সংসারের তাবৎ কান্না ভেঙে যেতে থাকে। তার ঠোঁট বিড়বিড় করে: মরণকালে কেন তুমি মোরে ডাকতি গেলা? কেন? মোর জীবনটারে ফাঁসির দড়িতে লটকে গেলা তুমি।

কয়াল বাবুরা বলে, কালো জমির দাঙ্গায় মরেছে। সে মেয়েমানুষ বলে কি আর দাঙ্গার মানে বোঝে না? নিজের জমির উপর দাঁড়ালে দাঙ্গা হবে কেন? মেজবাবুর হাতের বন্দুক কালোর বুক ছ্যাঁদা করে দিলে তার নাম দাঙ্গা হবে কেন? কালোর হাতে কি অস্তর ছিলো? লাঙল বলদেরে কি কেউ অস্তর বলবে সংসারে? তবু কয়ালবাবুরা যখন দাঙ্গা বলেছে তখন দাঙ্গা।

উদাসীর ঠোঁট বিড়বিড় করে: সুখে বইছ, সুখে থাকো বাবুরা। তুমরা

রইছ বলে পিথিমীতে পাপপুণ্যি। সূয্যি উটে সূয্যি ডুবে। আমি ভামর দাঙ্গায় মরা কালো বাগদীর বেধবা বউ, মোরে মাঝে মধ্যে এট্টু, খুদকুঁড়ো দিয়ে দয়া করো। এই কুঁড়ো বেইরেছে যে ধান থিকে আর সিটা ফলেছে যে মাঠে, সি মাঠটা ছিটু বাগদী, তার ছেলা ক্ষেতু বাগদী, তার পুত কালো বাগদী এক সোময় নিজেদের বইলে ভাবতো, এই ডাহা মিথ্যে কথাটা আমি কাউরে বলতি যাবো না—কাউরে না।

এই সবের ফলে বউ আর শ্বশুর একটি নির্দিষ্ট শোকের বিন্দুতে পৌছে যায়। একজনের সশব্দে এবং অন্যজনের নিঃশব্দ বিলাপের সাক্ষী থাকে ভাতের থালা। তারপর একসময় এ সব থামে। ভাতের থালাকে কেউ এড়িয়ে যেতে পারে না বলেই—বুড়ো আর তার পুতের বউ সেই গলা জাউ সজনেপাতা গুগ্‌লীর ঝোল দিয়ে চেটেপুটে খায়।

লোকে বলতে বলে ফোটা ফুলের গন্ধ।

কিন্তু তামাম পৃথিবীতে ভাত ফোটার চাইতে সুগন্ধ আর কিসে আছে। সেই গন্ধ নাকে যেতেই বুড়ো গোঙাতে গোঙাতে উঠে বসে। দুর্বল ঘ্রাণ ইন্দ্রিয় ঘন ঘন টানে। কালের রথের চাকায় দাগানো তার মুখে জীবিত মানুষের লক্ষণসমূহ দেখা দেয়, 'উদাসী! অ উদাসী।'

শব্দ মিলিয়ে গেলেও তার অন্তর্ভুক্ত চংকারের মত খানিক আগের স্মৃতি উদাসীর মধ্যে রয়ে গেছে বলে তার চোপায় সংযম আসে। তার গলা যেন খানিক নিজেই শোনায়, 'বল বটে?'

'আন্না হইচে তুর?'

'ঝোল হলিই হুব।'

'আঃ!' লালায় জড়ানো জিভে শব্দ করে বুড়ো। মাংসহীন শুকনো মরা ডালের মত হাত দিয়ে দাওয়ায় খুঁটি ধরে নিজেকে সামান্য সোজা করে। শ্লেষ্মা জড়ানো গলনালীকে খাঁকারী দিয়ে পরিষ্কার করে বলে, 'মুসুর ডালের বাসটো বড্ড ভালো রে উদাসী।'

উদাসী বোঝে, বুড়োর মধ্যে এখন সার বেঁধে এসেছে লোভী পিঁপড়ের মত শতেক ইচ্ছেরা। তারই জানান দেবে বুড়ো এখন থেকে থেকে। বুড়ো বলে, 'আঃ কতয়দিন মুসুর ডাল খাই নাই। যেখন কালো ছেল, আইনতো মাঝে মাঝে।'

উদাসী জবাব দেয় না। এসব কথার আর কিই বা জবাব আছে। সে হাঁটুর ওপর চিবুক রেখে আথায় পাতা ঠেলে।

বুড়ো আবার গোঙায়, 'তেলায় ভাজা সুসনীশাক—আঃ। কালো খাইকলে খেতম।' কালো কালো আর কালো! বুক আর চোখ জলে উদাসীর। কথার মুখে হাত চাপা দেবার জন্য তাড়াতাড়ি বলে, চান কইরবে, না থাকবে?

বুড়ো বলে, 'থাক।'

উদাসী তাকে কখনো সখনো ডোবায় ধরে নিয়ে গিয়ে ঘসে মেজে চান করায়। তা না হলে চান করা না করা দুই-ই তার পক্ষে সমান। স্নানের সুফল কোনটাই তার বোধের মধ্যে আসে না।

ভাঙা কলাইয়ের থালায় ভাত ভাত বেড়ে দেয় উদাসী। ভাত অর্থে গলানো জাউ। ছোট ছোট সুরুৎ সুরুৎ শব্দে তাই পরম আগ্রহে খায় বুড়ো। এবং গরম জাউ খানিকটা পেটে যেতেই ঝিমুনী ভাবটা কেটে গিয়ে একটু চনমনে লাগে।

ইতিমধ্যে উদাসী পেছনের ডোবায় যায়। চারদিক নজর করে পরনের ন্যাতাটি খুলে রেখে হুড়মুড়িয়ে ডোবায় নামে। ডোবার জল সবুজে পানা। টলটলে নয়। উদাসীর অঙ্গে এখন জলের বসন। এই জলে এলেও মরণ, না এলেও মরণ। রোজই একবার জলে এসে মরে উদাসী। সেই যে মরেছে মানুষটা আর এই জল। এরা ছাড়া তার সর্ব অঙ্গে জড়ায় কে? তাই এই পচা ডোবার সবজে জল রোজই একবার টেনে আনে উদাসীকে। উদাসী জলে আসে মরা মানুষটার জন্য কাঁদতে।

ভাত নিয়ে বসে উদাসী।

বুড়ো বিড়বিড় করে. 'হুঁ হুঁ বাবা, অত্ত সোজা নয়! বুইঝলি উদাসী, মোদের লাটু—লাটুও বইলতে লারলে।'

উদাসী জিজ্ঞেস করে, 'কি বটে?'

'অই যে, বাবুরা মোকে দে তোলালেক—আহ্ অই যে রে, আমি টেইনে পরে বাঁশের মাথায় তুলে দিনু।'—দুর্বল স্মৃতি থেকে দুর্বলতর স্নায়ু প্রয়োজনীয় কথাটিকে বহন করে আনতে পারে না। বুড়ো চিমসানো

আঙুলে পাটের কেসোর মত মাথার চুল টানে। 'সেই তুমার গে সাদিনোতা তো ?'—উদাসী মনে করায়।

'হ্ হ্ বটে।' যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে পলাতক কথাটাকে নিজের কব্জায় রাখতে চায় বুড়ো। তারপর বলে, 'লাটুও, বইললে, জিনিসটা অত্তয় সোজা লয়।'

সেই দিন থেকে ইস্তক বুড়ো সাদিনোতা সাদিনোতা করে তার কানের পোকা বার করে দিচ্ছে। পেটের জ্বালার সঙ্গে এসব উদাসীর আর ভালো লাগে না। আজ দু মুঠো কুড়িয়ে আনলে তার কালকের ভাবনা। তাকে তো আর বাবুদের মত ফুলফুল কথা নিয়ে থাকলে চলবে না। বুড়ো খুব আপশোষ ভরা গলায় বলে, 'পাঁচকুড়ি বয়স হলেক, এখনো জিনিসটা যে কি তা জাইনলমও না দেইখলমও না। অদেষ্ট—অদেষ্ট !'

বুড়োর বিড়বিড়ানিতে উদাসী আর কান দেয় না। সে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে বিলি কেটে মাথায় উকুন আনে আর নখে রেখে পটপট শব্দ তুলে মারে।

এক সন্ধ্যেয় পচা শামুকে না কিসে পা কেটে উদাসী এসে ঘরে পড়ে। পরদিন পা ফুলে ঢোল। সঙ্গে ধুম জ্বর। সে গড়িয়ে ছাতিফাটা তেষ্টায় জল ভরে খেয়েছে।

অক্ষম বুড়ো দাওয়ায় বসে ব্যথায় কাতর পুতের বউকে সান্ত্বনা দিয়েছে, 'আঃ কাঁদিস না মা, কাঁদিস না। ইয়াতে গরীব মানুষের কি হয় বটে। মোদের কতয় কেটেছে, ফেটেছে। কই, মোরা কি মইরেছি ? মোদের তো আর বাবুদের পানা শরীল লয়।'

যতক্ষণ হুঁশ ছিলো, উদাসী যন্ত্রনায় চেঁচিয়েছে, কেঁদেছে। তারপর কখন একসময় জ্ঞান হারিয়েছে। বুড়ো থেকে থেকে ডেকেছে, 'উদাসী, অ উদাসী ! কমনে গেলি রে, উদাসী।'

কেউ সাড়া দেয়নি।

জ্ঞান ফেরার পরে সে জানে না ইতিমধ্যে ক'বার ভোর, ক'বার সন্ধ্যে হয়েছে। সে ছোটলোকের মেয়ে বলে, গুলি খেয়ে মরা কালো বাগদীর বউ বলে পচা, শামুকে কাটা পা বিষিয়ে ওঠা সত্ত্বেও মরেনি। তার সমস্ত শরীর এক ফোঁটা জলের জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে। টেনে হিঁচড়ে নিজেকে সে

কলসীর কাছে নিয়ে যায়। এবং জলের অপর নাম জীবন বলেই জীবিত মানুষের লক্ষণ তার মধ্যে দেখা দেয়।

বুড়োর সাড়াশব্দ নেই কেন? চুপ করে কান পেতে উদাসী শোনার চেষ্টা করে। কিন্তু কোন সাড়াশব্দ নেই মানুষটার। উদাসীর দুর্বল বুক তিরতিরিয়ে কাঁপে।

সে দুবলা গলায় ডাকে, 'বাবা, বাবা গো।'

জ্বরে ক্ষুধায় তার কানে বোধ হয় তালা লেগে আছে। তাই কোন সাড়া পাচ্ছে না সে। কিন্তু না, ঐতো একটা পাখির কু শুনছে। বোধ হয় পাখিটা তাদের উঠোনের অর্জুন গাছের মাথায়।

এবার তরাসের চাপস লাগে উদাসীর।

সে ঘরের কোণা থেকে লাঠিটা নেয়। শরীরে তিলেক ক্ষমতা নেই। পায়ে এখনো অসহ্য যন্ত্রনা। লাঠি ভর করে উদাসী দাওয়ায় আসে। কেউ নেই। উদাসী উঠোনে নামে। কেউ নেই। মনে কু ডাক ডাকতেই—উদাসী ভাবে, গাছে পাখি ডাকে, উঠোনে রোদ পড়ে, তাহলে বোধহয় সব ঠিকই আছে।

আর তখনই তার চোখ পড়ে বেগুন ক্ষেতে। চোখে ধন্দ দেখছে না তো সে! জ্বর জ্বালায় তার নজর ঝাপসেছে। লাঠি ভর দিয়ে উদাসী এগিয়ে যায়। খানিক এগুতেই ভোরের চক্‌চকে রোদ তাকে সব স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেয়।

ব্রহ্মাণ্ড পাক দিয়ে তার বুকের মধ্যে একটা চিৎকার বেজে ওঠে: উদাসী রে, মোর বুড়া বাপেরে তুই দেখিস্!

উদাসীর মাথা ঘোরে। পা টলে।

'বাবা গো।' উদাসীর কান্না বেগুন ক্ষেতে ভেঙ্গে পড়ে।

যে আপদের মরণ চেয়ে উদাসী দুবেলা মুখ ঝামটা দিতো, এখন তার জন্যই সে ভুঁয়ে লুটিয়ে কাঁদে। নিজের ব্যথা ভোলে উদাসী। যন্ত্রণা ভোলে। বুক চাপড়ায়। চুল ছেঁড়ে। মাটি মাখে। ভোর বেলার রোদে বেগুন ক্ষেতের মধ্যে তার বিলাপ শুনে কি ভেবে পাখিটা অর্জুন গাছের মাথা থেকে উড়ে যায়।

'বাবা গো, তুমার কালো এয়েছে বাবা—তুমি মুস্থর ডাল খেতি চেয়েছিলে,

শাক ভাজা খেতি চেয়েছিলে—তুমার কালো নে এয়েচে দেখো।'—তার দুর্বল কণ্ঠের ধারাবাহিক বিলাপ ক্রমশ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে থাকে।

ক্ষেতুদা, অ ক্ষেতুদা! মেজবাবুর ঠেঁয়ে তুমার সাদিনোতা কতাটির মানে জেইনে এলাম বটে।'—বল্‌তে বল্‌তে বেড়ার ধার দিয়ে ঘুরে আসে লাটু মাঝি। এবং পরক্ষণেই উদাসীর ক্ষীণ বিলাপ তার কানে ভেসে আসে। বেগুন ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে লাটু মাঝির চোখ বিস্ফারিত। গলায় একটা অস্পষ্ট শব্দ শোনা যায়।

মুসুরীর ডাল, তেলে ভাজা সুস্‌নী শাক, সাদিনোতা সংসারের এই সব ভালো ভালো সামগ্রী অনাস্বাদিত রেখেই ক্ষেতু বাগ্‌দী বেগুন ক্ষেতে চিৎ হয়ে মরে পড়ে আছে। কোমরের কাছ থেকে শরীরটা ভাঙ্গা বলে, তার পা জোড়া অদ্ভুত ভঙ্গিতে উঁচিয়ে আছে আকাশের দিকে।

ঠিক যেন একটি পদাঘাত।

শীর্ষবিন্দু

প্রথমে একটি আলোক বিন্দু।

খদ্যোতের প্রায়। জ্বলছে নিভছে। নিভছে জ্বলছে। চতুর্দিকে অন্ধকারের থৈ থৈ সমুদ্র। আকাশ কালো মেঘে ঢাকা বাতাসের ঝাপটায় জলকণার স্পর্শ। রেললাইনের উঁচু ভূমি থেকে অথির বিজুরী সদৃশ আলোক বিন্দুটি নীচে নামে। রেললাইনের নীচেই বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে জলাভূমি। হোগ্‌লা, জলজ চিটপিটি আর মোথা ঘাসের জঙ্গলে ঠাসা। মাঝে মাঝে জ্যামিতিক ছকের আল। মাঝে মাঝে ডাঙা জায়গায় তাল খেজুর বাব্‌লার জটলা।

আঁকাবাঁকা সংকীর্ণ আলে এসে অথির আলোক বিন্দু এবার থির ঝল্‌কানি হয়। অন্ধকারের গায়ে তুরপুনের মত ছ্যাঁদা করে জ্বলে থাকে। সেই পথপ্রদর্শক আলোর ঝল্‌কানির পিছনে একটি কথোপকথন স্পষ্ট হয়। দুটি মানুষের অবয়ব ধূসর হয়ে ফোটে। মুখের কথার ধারাবাহিকতা বাতাসের টানে ছিঁড়ে ছিঁড়ে উড়ে যায়।

—তুই সঙ্গে না এলেই ভালো হতো।

—কি ভালো হতো?

—দেখছিস্ তো আকাশ কি রকম চেপে আসছে। বাতাসের মর্জিও ভালো নয়। রাতটা বড় দুর্যোগের মনে হয়।

—আমি না এলে বুঝি হতো না?

—তা নয়। তোর মা খুব ভাববে?

—তুমি একা এলে ভাবতো না?

একটু কাল কথা বন্ধ থাকে। কথোপকথন থেকে স্পষ্ট হয় এই জলাভূমি, রেললাইন ছাড়িয়ে গিয়ে কোন লোকালয়ে তাদের একটি পরিচয় আছে।

দুর্যোগের রাতে তাদের বাইরে পাঠিয়ে আর একজন উদ্বিগ্ন মানুষ বড অস্থির সময় কাটায়। ফলে এই মুহূর্তে তাদের দু'জনকে কেন্দ্র করে একটি কোমল মায়ার বৃত্ত ঘনিয়ে ওঠে। তারা উভয়েই যেন বুঝে যায়, কারু ইচ্ছা অনিচ্ছার তোয়াক্কা না করেই মানুষের শিকড় বুকে কিরকম চাড়িয়ে যায়, মানুষেরা বোধ হয় একেই মায়া টায়া বলে। যাবতীয় সুখ ও অসুখের উৎসও বোধ হয় এই।

নীচে জলাভূমি, উপরে মেঘময় আকাশ। মাঝখানটা আকারহীন অন্ধকারে পরিপূর্ণ। পূব দিক থেকে দমকে দমকে ভিজে বাতাস ছুটে এসে উডে যাচ্ছে লোকালয়ের দিকে। এই অন্ধকার বড মৌলিক প্রকৃতি। সে মানুষকে বড় প্রখর করে তোলে।

—অনু!

—বলো।

বাবার গলায় একটি গাঢতা টের পায় কিশোর অনুতোষ। সে অভিজ্ঞতায় বুঝেছে, এমন সব সময়েই তাব বাবা অনেক কথা বলতে চায়। সব কথা অনুতোষ বোঝে না। কিন্তু একজন আহত মানুষের গোঙানী টের পায়। তখন তার বলাব বা করাব কিছু থাকে না বলে তাকে কেমন যেন একটা অবশ করা ভয় চেপে ধরে। সেরকম কিছুব জন্য তার ইন্দ্রিয় হঠাৎ সচেতন হয়ে ওঠে।

—তুই দাদুরী কথাটাব মানে জানিস্?

তার অনুমিত প্রসঙ্গের বাইরে কথা ওঠায় অনুতোষ নিজেকে একটু সামলায়। তারপর বলে, ন্না।

—এই শব্দটার মানে জেনে এবং না জেনে যারা এক কালে পৃথিবীতে বেঁচে আছে তাদের মধ্যে প্রকৃত সুখী কে?

অনুতোষ চুপ করে থাকে। এই বয়সে বাবার সব কথার ব্যাসকূট তার সাধ্যায়ত্ব নয়। সে এইটুকু বোঝে, বাবা এসব কথা কেবল নিজের জন্য বলেন। অনুতোষ না থাকলেও হয় তো বাবা এই অন্ধকার কিংবা জলাভূমিকে সাক্ষী রেখেই তার প্রশ্নোত্তর চালাচালি করতেন। এরকম সময়ে বাবাকে বড় রহস্যময় লাগে অনুতোষের।

—সুখ!

মট্ করে ভেঙে দেবার মত মুখ শব্দটাকে উচ্চারণ করেন অন্নুতোষের বাবা। রাতের অন্ধকারে জলাভূমির উপর দিয়ে দু'টি মানুষ এগিয়ে চলে। বাতাস নাগাড়ে ঝাপ্টা মারে। আকাশে চিকুর চমকায়।

—বৃষ্টি এলো বলে।

অন্নুতোষ উদ্বিগ্ন গলায় বলে, ছেঁড়া বর্ষাতিটা তো আনা হয়নি বাবা।

—আজ ভিজতে হবে।

বর্ষাতি না আনার অপরাধবোধে অন্নুতোষ কথা বলে না। ভুলটা তারই। মা সব গুছিয়ে রেখেছিলেন হাতের কাছেই। আসবার সময় ভুল হয়ে গেছে। এক আধ ঘণ্টা বৃষ্টিতে ভিজলে তার আর কি হবে। এখনো বৃষ্টিতে ভিজে মজা পাবার বয়স তার পার হয়ে যায়নি। কিন্তু ভয়টা বাবাকে নিয়ে। এমনিতেই রাত থেকে বাবার কাশি শুরু হয়। বুকের খাঁচা ফাটানো কাশি। তার উপর টানা বৃষ্টিতে ভিজলে আর দেখতে হবে না। অন্নুতোষ এইটুকু বোঝে, তার বাবার বয়সী লোকেরা কাজ করে না। অন্তত কাজ করা উচিত নয়। তার বাবার চুল সব সাদা, দাঁত নড়বড়ে, শরীর শীর্ণ। এই বয়সে মানুষ বিশ্রাম নেয়। অন্যদের অভিজ্ঞতার গল্প বলে। কিন্তু তার বাবার ক্ষেত্রে এসব মিথ্যে হয়ে গেছে। পঁয়ত্রিশ বছর স্কুল মাস্টারীর পর ঝড় বাদলে, রাতের অন্ধকারে জলাজঙ্গল ঘাঁটতে হচ্ছে। বাবার জন্য একটা দুঃখবোধ কিশোর অন্নুতোষের বুকের মধ্যে জ্বালা হয়ে জ্বলতে থাকে।

—মাঝখান থেকে প্রিয়টা যে কেন এত সব জানতে গেলো!

বাতাসের ঝাপ্টায় অন্নুতোষ বাবার দীর্ঘনিশ্বাসটা শুনতে পেল না। কিন্তু সে এইরকমটাই অনুমান করেছিলো। সুযোগ পেলেই বাবা এই প্রসঙ্গটা তোলেন। প্রিয় মানে প্রিয়তোষ। অন্নুতোষের দাদা। দাদার ব্যাপারটা তাদের সংসারের বুকে শেল হয়ে বিঁধে আছে। দাদা নেই বলেই বৃদ্ধ বাবাকে জলাজঙ্গলে খাবার খুঁটতে বেরুতে হয়েছে। দাদা নেই বলেই মা রোজ সন্ধ্যাবেলা উঠোনের আতা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে কেমন করে যেন কোথায় তাকিয়ে থাকে। দাদা নেই বলেই বাবা কিরকম অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলতে শুরু করেছেন। দাদার জন্য অন্নুতোষের বুকের মধ্যে কেমন একটা অজানা কষ্ট গুমরে গুমরে কাঁদে।

—মাভস্টা এনেছিস্ তো, আর বস্তা?

হ্যাঁ। —অমুতোষ জানায়।

—আর লাঠি ?

—এনেছি।

দু'টি মানুষ আবার এগুতে থাকে। অন্ধকার এত গাঢ় যে নিজেদের হাত পা অবধি নজরে পড়ে না। নীল বাঁকানো চাবুকের ঘায়ে আকাশের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। এখন এই জলাভূমি এক আদিমতা পায়। তিনশো কোটি কি তারও বেশী বছর আগে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার রাতে আকাশ যে রকম প্রলয় আয়োজন করতো, আজো যেন ঠিক সেই রকমটি হতে চলেছে।

তারা দু'জনে এবার ঝিলের ধারে এসে পড়ে। লম্বা ঝিল টানা চলে গেছে দিগন্ত রেখার দিকে। পানিফল আর পদ্মপাতায় ঢাকা।

—অমু, গ্লাভস্‌টা দে।

বাবাকে মোটা কাপড়ের গ্লাভস্‌টা এগিয়ে দেয় অমুতোষ। বাঁ হাতে গ্লাভস্‌টা পড়তে গিয়ে টর্চ নেভে। ফলে অন্ধকার জলাভূমিতে আদিমতা সম্পূর্ণ হয় আর অন্ধকার সর্বদাই কিম্ভূত কল্পনার জন্মদাত্রী। জগতের সব আকার আকৃতি, রেখা রঙ মুছে গিয়ে কেবল মাত্র জেগে থাকে মনের বিচিত্র গতি। অনেক হেঁয়ালীর জন্ম হতে পারে এরকম সময়।

—আমার নাম কি ? আমি কে ?

বাবার কথায় অমুতোষ চিন্তিত হয়। আজ যেন রহস্য একটু মাত্রা ছাড়া হতে চলেছে। দাদার সেই ঘটনার পর থেকেই বাবা মাঝে মধ্যে এইরকম সব অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলেন যার অনেক কিছুই অমুতোষ পরিষ্কার বুঝতে পারে না। একে কি পাগলামি বলা যাবে ? কিন্তু অধিকাংশ সময়েই তো বাবার আচরণ খুব স্বাভাবিক। আবার অন্ধকারের ভিতর থেকে বাবার কাঁপা কাঁপা গলা শোনা যায়।

—আমি প্রিয়নাথ ভট্টচার্জ্। কিন্তু আমি কে, তা জানি না। আমি কে, তা জানা মানেই আমার সমাজ কি, তা জানা। প্রিয়তোষ তুই কি এসব জেনেছিলি ? অনেক জানা মানেই নিজের হাতে অনেক বিপদ বানানো। কিছু না জেনে যদি এত সুখ, তুই কেন এত সব জানতে গেলি, প্রিয় !

বাবার শেষ কথাটা আর্তনাদের মত শোনালো অমুতোষের কানে। তার

মধ্যে কিরকম একটা ভয় শিরশিরিয়ে উঠল। সে চাপা গলায় ডাকল, বাবা!"
অন্ধকারের গায়ে আচমকা ধারালো ছুরির মত টর্চের আলো বিঁধে গেলো।
—তোর ভয় করছে?
—ন্না।
—আয়। আমার সঙ্গে আয়।
ঝিলের ধারে ধারে টর্চ ফেলে এগুতে লাগলেন প্রিয়নাথ। হঠাৎ নীচু হয়ে গ্লাভস্ পরা বাঁ হাত দিয়ে খপ করে একটা প্রকাণ্ড সোনা ব্যাঙ্ তুলে নিয়ে বললেন, খোল্, বস্তার মুখটা খোল।
অম্লতোষ বস্তার মুখটা খুলে ধরে।
—এরকম একশোটা হলে কুড়ি টাকা। সবে একটা হলো। আয়, তাড়াতাড়ি আয়। প্রিয়নাথের মধ্যে খুব ব্যস্ততা জেগে উঠলো। যেন হঠাৎ করে তার অনেক কিছু মনে পড়ে গেলো। লোকালয়ে পাঁচটা পেট তার জন্য অপেক্ষা করছে। বেঁচে থাকার হাজার বায়না। শরীরে জরাব হানাদারী, কিন্তু যতক্ষণ প্রাণ ততক্ষণ প্রয়োজন। প্রয়োজন তাকে ঘাড ধরে টেনে এনেছে এই জলায়, অন্ধকারে।
আকাশে বিদ্যুৎ ছোটে। বাতাসে ভিজে জলকণার স্পর্শ। চাপা গুরু গুরু গম্ভীর গলায় মেঘের ধমক ওঠে। প্রিয়নাথের পা চলে, হাত চলে। অম্লতোষের পিঠে ঝোলানো বস্তায় ব্যাঙের সংখ্যা বাড়তে থাকে।
অম্লতোষ ডাকে, বাবা!
—বল্।
কিশোর অম্লতোষ বলে, তোমার খুব কষ্ট, না?
—কই, না তো।
টুকরো সংলাপ শেষ হয়। ঝিলের চতুর্দিক থেকে সরু মোটা গলায় ব্যাঙেরা পরস্পরকে ডাকাডাকি শুরু করে।
প্রিয়নাথ বলেন, এখুনি বৃষ্টি নামবে।
আর ঠিক তখুনি বড় বড় ফোঁটায় আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে। ব্রহ্মাণ্ড ভাসানো বৃষ্টি। সঙ্গে বাতাসের তীব্র দাপট। এই মহূর্তে প্রকৃতি ভয়ানক নিষ্করুণ হয়ে ওঠে।
প্রিয়নাথ বলেন, কোথায় দাঁড়াই বল্‌তো!

অনুতোষ বলে, সামনে কয়েকটা গাছের মত মনে হচ্ছে বাবা।

—চল্, দেখি।

কয়েকটা খেজুর আর বাব্‌লা গাছ প্রায় জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেকে নিয়ে সেইখানে এসে দাঁড়ালেন প্রিয়নাথ। একেবারে সরাসরি বৃষ্টির হাত থেকে খানিকটা বাঁচোয়া। সমস্ত জলা অঞ্চল জুড়ে বৃষ্টির প্রবল দাপট চলতে থাকে। টর্চটাকে দুই উরুর ফাঁকে চেপে ধরলেন প্রিয়নাথ। জলের হাত থেকে ব্যাটারী বাঁচাতে না পারলে আলোর উৎসটুকু নষ্ট হবে। তখন এই বিপজ্জনক জলাভূমির সংকীর্ণ আকাবাঁকা পথ চিনে সারা রাতেও ঘরে পৌছনো যাবে না। প্রিয়নাথ খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এই মুহূর্তে তার অনুশোচনা তীব্র হলো, ছেলেকে সঙ্গে আনবার জন্য। অনুতোষকে না আনলেই হতো। ওর মায়ের উদ্বেগাকুল মুখটা চোখের উপর ভেসে উঠলো প্রিয়নাথের।

অন্ধকারে ছেলের মাথায় হাত রেখে প্রিয়নাথ বললেন, অনু, সরে আয় আমার কাছে। অনুতোষ সরে এসে বাবার পিঠ ঘেঁষে দাঁড়ালো। ইতিমধ্যে দু'জনার শরীর বেয়েই জলধারা নামছে। চারদিকে সীমাহীন অন্ধকার। বৃষ্টিপতনের শব্দ। বাতাসের দুরন্ত দাপট। দূর আকাশে চিকুরের চকিত চমক। উল্লসিত ব্যাঙেদের ডাকাডাকি। এখন এখানে অন্য এক জগৎ। অদূরের লোকালয় এখন এখানে মিথ্যে হয়ে গেছে। প্রবল প্রকৃতির হাতে মার খাচ্ছে অসহায় দু'টি মানুষ।

অনুতোষ ডাকে, বাবা!

ছেলের শরীর স্পর্শ করে প্রিয়নাথ তাকে অভয় দিতে চান।

—বৃষ্টি কি আর থামবে না, বাবা?

প্রিয়নাথ বলেন, থামবে। সব দুর্যোগের শেষ আছে। তবে ভয় পেলে চলবে না। সাহস চাই—সাহস।

প্রিয়নাথ সেই অভিজ্ঞ বৃদ্ধের মত কথকতা করেন, আগুনের পাশে গুহার মুখে কিংবা জীর্ণ কুঁড়ের দাওয়ায় বসে মানব ইতিহাসের চিরন্তন ধারায় যে বৃদ্ধ নতুন প্রজন্মকে বেঁচে থাকার রণকৌশল আর সাহসিকতার শিক্ষা দিতেন। অন্তত পরিবেশ এবং অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে এইরকমটা মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

অন্তোষ বলে, মা আমাদের জন্য খুব ভাবছে, বাবা।

—মায়েরা ঐরকমই।

—তুমি অন্য কোন কাজ খুঁজে নিতে পারো না বাবা?

—বুড়ো মানুষকে আর কে কাজ দেবে বল।

—আমি আর একটু বড় হলে তোমাকে কাজ করতে দেবো না।

—সব ছেলেরাই তাই বলে। প্রিয়ও তাই বলতো।

অন্তোষ চুপ করে যায়। বাবার সব প্রসঙ্গই দাদাকে দিয়ে শেষ হয়। ছোট হলেও বাবার দুঃখের গভীরতা অনুমান করতে পারে অন্তোষ।

আচমকা বৃষ্টিটা ধরে আসে।

—যাক, বাঁচা গেল! —স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লেন প্রিয়নাথ। —অন্তু, জামাটা খুলে নিংড়ে গা মাথা মুছে আমাকে দে।

দুই উরুর মাঝখান থেকে টর্চটা বাইরে এনে বোতাম টিপলেন প্রিয়নাথ। এক ঝলক তীব্র আলো সামনের অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়লো। আলোর বৃত্তের দিকে তাকিয়ে মুহূর্তে জমে পাথর হয়ে গেলেন প্রিয়নাথ। তার শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেলো। তিনি কোন রকমে উচ্চারণ করলেন, অন্তু!

বাবার চাপা কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যা অন্তোষকে চমকে দিলো। আলোর বৃত্ত অনুসরণ করে তাকাতেই তার গলা দিয়ে একটা অস্ফুট শব্দ ছিটকে এলো। বাবলা গাছের ডালের সঙ্গে পাক দিয়ে তার বাবার বুকের সমান্তরালে ঠিক হাত দুয়েক তফাতেই ফণা উদ্যত করে আছে একটা কালান্তক সাপ। ফণাটা অল্প অল্প দুলছে। চেরা জিভ লকলক করছে শূন্যে। ভয়ে হিম হয়ে গেলো অন্তোষের শরীর। সে কাঁপা গলায় বললো, বাবা, পালিয়ে এসো! টর্চের আলো আর শরীর স্থির রেখে প্রিয়নাথ বললেন, না। একটু নড়লেই ছোবল দেবে। একেবারে জাত সাপ। তুই দেখ, লাঠিটা কোথায়।

লাঠি! সর্বনাশ! বৃষ্টিতে তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে অন্ধকারে লাঠিটা যে সে কোথায় রেখেছে কে জানে। পাগলের মত অন্ধকারে লাঠি খুঁজতে লাগলো অন্তোষ।

উদ্যত ছোবলের মুখে প্রিয়নাথ যথাসাধ্য নিজেকে স্থির রাখতে চাইলেন। টর্চের তীব্র আলোতে কালান্তকের দৃষ্টি ঝলসে গেছে। তার শরীর নড়ছে

কিংবা আলো নিভলে মুহূর্তে ছোবল পড়বে। উগ্র বিষ ছুটবে রক্তে রক্তে। অন্ধকারে এই নির্জন ঝিলের ধারে নাবালক সন্তানের চোখের সামনে তার মৃত্যু হবে। তখনো হয়তো অন্থুর মা তার ঘরে ফেরার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে। ছেলেমেয়ে নিয়ে তাকে অসহায় ভাবে পথে নেমে যেতে হবে। ভাবতেই প্রৌঢ় প্রিয়নাথের বুকের ভিতরটাতে তোলপাড় করে উঠলো। হাতের চেটোর মত ফণাটা অল্প অল্প দুলছে। কালো বিদ্যুতের মত চেরা জিভ ঝল্‌কাচ্ছে। স্বয়ং মৃত্যু তাব বুকের উপর।

ঠক···ঠক···ঠক···ঠক !

প্রায় মধ্যরাতের কাছাকাছি। শব্দ কানে যেতেই লাফিয়ে উঠলো প্রিয়তোষ।

ততক্ষণে মা বাবা সকলেরই ঘুম ভেঙে গেছে।

চাপা গলায় প্রিয়তোষ বললো, ওরা এসে গেছে !

প্রিয়নাথ বললেন, তুই কথা বলিস না। আমি দেখছি।

মা বললেন, না। দরজা খুলো না।

এবাব দবজার উপর ধাক্কা প্রবল হয়। সঙ্গে চিৎকার আর খিস্তি। অনেকগুলি প্রমত্ত ক্রুদ্ধ হুংকার দরজার গায়ে আছড়ে পড়ে।

প্রিয়নাথ বললেন, না খুললে ওরা ভেঙে ঢুকবে।

প্রিয়তোষ বললে, খুলেই দাও। যা হবার হয়ে যাক।

কপাট খুলে দরজা আগ্‌লে দাঁড়ালেন প্রিয়নাথ।

একটা হিংস্র কণ্ঠ হাঁকরে ওঠে, ঘুমিয়ে ছিলেন, না মরে ছিলেন ?

যথাসাধ্য শান্ত গলায় প্রিয়নাথ জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কারা ?

—টর্চটা জাল্‌ বে। আমাদের দেখতে চাইছে।

অনেকগুলি হিংস্র মুখের উপর দিয়ে আলোর রেখাটা ঘুরে গেলো। একজনকে চিনতে পারলেন প্রিয়নাথ। বছর দুয়েক আগেও তার ছাত্র ছিলো।

—কি চাও তোমরা ?

—প্রিয়তোষকে চাই।

—সে তো ঘরে নেই।

—বুড়ো ভাম্ হয়ে মরতে চলেছেন, তবু মিথ্যে কথা! আমাদের কাছে পাকা খবর, প্রিয়তোষ ঘরে আছে।

আবেদনের ভঙ্গিতে প্রিয়নাথ বললেন, তুমি তো আমার ছাত্র চিনু।

চিনু বাঁকা গলায় বললো, দেশের কাজে আবার ছাত্র মাস্টার কি!

—প্রিয়কে মারলে কি তোমাদের দেশের কাজ হবে?

—আল্বৎ হবে!—আর একটা গলা ধমকে উঠলো। —ও শালা দেশের শত্রু। দেশের শত্রুদের আমরা রাখবো না!

—দেশটাকে কি তোমরা জানো? দেশের শত্রুকে কি চেনো?

—হারামীটা মাস্টারী ফলাচ্ছে মাইরী! দেবো নাকি চালিয়ে?

একটা প্রবল ধাক্কায় ছিটকে পড়েন প্রিয়নাথ। ঘরের মধ্যে ধস্তাধস্তি, ভাঙ্-চুর চলে। অসুস্থ মায়ের কান্না, সদ্য জেগে ওঠা ছেলেমেয়েদের আতঙ্কিত চিৎকার এসবের মধ্য দিয়ে ওরা প্রিয়তোষকে টেনে হিঁচড়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

পাগলের মত চিৎকার করতে করতে রাস্তায় আসেন প্রিয়নাথ।

পরদিন প্রিয়তোষ আবার তাদের কাছে ফিরে আসে, বুকে পিঠে ছুরির চিহ্ন নিয়ে, কপালে বুলেটের দাগ নিয়ে, নিষ্প্রাণ শরীর নিয়ে, অনেক মানুষের কাঁধে চেপে।

একটুও কান্না পায় না প্রিয়নাথের।

তিনি শুধু স্থির শুক্নো দৃষ্টি নিয়ে তার প্রিয়তোষের চলে যাওয়া দেখেন। প্রিয়তোষ তাদের সবাইকে ছেড়ে চলে যায়।

সাপটা ঠিক তার দু'হাত তফাতে। বিচিত্রিত চ্যাপটা ফণা। কপালের উপর লাল ছোট পুঁতির মত দু'টি চোখ। অপলক। চেরা জিভ লকলক করছে শূন্যে। প্রিয়নাথের মনে হলো, তিনি যেন অনেক—অনেক দিন ধরে এই কালান্তক ফণার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছেন।

বিষাক্ত ছোবলের ভয়ে সামান্যতম নড়াচড়ার সাহস নেই তার। কিন্তু এভাবে আর কতক্ষণ অনড় দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব! তার শরীর ঝিমঝিম করছে। অবশ হয়ে আসছে পা। টর্চের বোতামের উপর ক্রমশ শিথিল হয়ে আসছে বুড়ো আঙুল। আলো নিভে যাওয়া মাত্রই বিদ্যুৎ গতিতে কালান্তক ছোবল পড়বে তার বুকে। রক্তে সঞ্চারিত হবে তীব্র বিষ।

মুখের মধ্যে শুকনো জিভ নেড়ে তিনি কোনক্রমে উচ্চারণ করলেন, অনু !

উত্তেজিত চাপা গলায় অনু জবাব দিলো, তুমি নড়ো না বাবা ! আলোটা নাড়িয়ো না। আগে আমি লাঠিটা খুঁজে পাই।

অন্ধকার ঝিলের ধারে অনু লাঠি খুঁজছে। যখন অদূরে লোকালয়ে মানুষ জীবন যাপনের অভ্যাসে রত ঠিক সেই মুহূর্তে জীবন রক্ষার আর এক নিয়মে অনুতোষ অন্ধকারে লাঠি খোঁজে। মেঘের মাদলে ঘা পড়ে। খোলা জায়গার উপর দিয়ে বাতাস শন্‌শন্‌ শব্দে উড়ে যায়! এই সবই যেন এক আদিমতম লড়াইয়ের প্রস্তুতি। ঝিলের ধারে ধারে ঝুঁকে পড়ে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে লাঠিটা খুঁজতে থাকে অনুতোষ।

প্রিয়নাথের সামনে আলোর বৃত্তে উদ্যত ফণা। জলকাদা আর ঘাসের ভিতর থেকে তার পা বেয়ে জোঁক না পোকা কি যেন একটা উঠছে। পা নাড়িয়ে তিনি সেই অস্বস্তিটুকু ঝেড়ে ফেলতে পারছেন না। সামান্য নড়লেই মৃত্যু।

আতা গাছের নীচে অনুর মা দাঁড়িয়ে।

অপরাধীর মত আস্তে আস্তে কাছে আসেন প্রিয়নাথ। অনুর মাকে তার কোন কথা বলার সাহস নেই। এই পরিবারের প্রধান হয়ে কাউকে রক্ষা করবার প্রতিশ্রুতি তিনি রাখতে পারছেন না। সাক্ষী হয়ে থাকা ছাড়া তিনি আর সব ব্যাপারেই ব্যর্থ।

—পেলে না তো ?

—না। —মাটির দিকে মুখ নামান প্রিয়নাথ। —সব জায়গা খুঁজে দেখলাম কোথাও নেই।

—জানতাম, পাবে না। কেউ থাকবে না আমার। একে একে সব চলে যাবে। এটা কি মানুষের সমাজ, না জঙ্গল ! —আঁশবঁটির মত ধার অনুর মায়ের গলায় চকচকিয়ে ওঠে।

ভয় পেয়ে প্রিয়নাথ ডাকেন, অনুর মা !

—খবরদার, তুমি আমাকে ডেকো না ! বাপ হয়ে ছেলেটাকে বাঁচাতে পারলে না—আজ মেয়েটা কোথায় চলে গেলো !

বুকের যন্ত্রণা চেপে প্রিয়নাথ বলেন, শোন, সুধা তো সেরকম মেয়ে নয়। হয় তো কোথাও—

কথা শেষ করতে পারে না প্রিয়নাথ। কথা শেষ হলে তার যেখানে দাঁড়াবে তাকে বিশ্বাস করবার কিংবা সহ্য করবার কোন ক্ষমতাই হয়তো তার নেই।

—যে সংসারে এক মুঠো ভাত নেই, সেখান থেকে সবাই চলে যায়। কেউ থাকে না!

ছুটে ঘরে ঢুকে যায় অমুর মা।

ভাঙা বুক চেপে দাঁড়িয়ে থাকেন প্রিয়নাথ। সব দোষ তার। তিনি অক্ষম বাপ। অক্ষম বলেই মেয়েকে বাড়ী বাড়ী টিউশানি করতে বেরুতে হয়। সেই টিউশানি করতে বেরিয়েই সুধা আজ ফেরেনি। প্রিয়তোষের পরেই সুধা। সুধা তার বড় মেয়ে। পরিবারের সকলের জন্য যে সামান্য নিরাপত্তা, সে ব্যবস্থাও তিনি করতে পারেননি।

অথচ পঁয়ত্রিশ বছরের শিক্ষক জীবনে তিনি ছাত্রদের ভারতবর্ষের ইতিহাস শিখিয়েছেন, নদ নদী আর শস্যক্ষেত্র চিনিয়েছেন, মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষা দিয়েছেন। তা হলে কি তিনি সব ভুল শিখিয়েছেন! ভুল শিক্ষা কি তার বুকেই ব্যুমেরাং হয়ে ফিরে আসছে! সেই সব ভুলের কি ঋণ শোধ করছেন তিনি। কি জানি, হবে হয় তো!

প্রিয়তোষ থাকলে তিনি তাকে এসব কথা জিজ্ঞেস করতে পারতেন। প্রিয়তোষ তো দেশের অনেক কিছু জেনেছিলো। দেশকে যে জানে সে যে দেশের শত্রু হয়, এটা তিনি ছেলেকে হারিয়ে প্রথম জানলেন।

পরদিন সুধাকে পাওয়া যায়। পুলিশ তাকে মাঠের মধ্যে অজ্ঞান অবস্থায় খুঁজে পায়। তার শরীরে অনেকগুলি পশুর লাঞ্ছনার চিহ্ন। হয় তো সেই সব পশুদের মধ্যে দু'একজন প্রিয়নাথের ছাত্রও থাকতে পারে—যাদের তিনি মানবিক মূল্যবোধের কথা শুনিয়েছিলেন।

সুধার শরীর সারে। কিন্তু সে মানসিক ভারসাম্য হারায়। প্রিয়নাথ দেখেন, সুধা দাওয়ায় বসে থাকে। কথা বলে না। অনুযোগ অভিযোগ করে না। চোখে মুখে স্থায়ী আতঙ্কের ছাপ। প্রিয়নাথ বেদনামাখা গলায় ডাকেন—সুধা! সুধার চোখ আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়। সে দুই হাত বুকের উপর আড়াআড়ি রেখে একটু একটু করে পিছনে সরতে থাকে। যেন পশুর আক্রমণ থেকে দূরে সরে যেতে চাইছে। আত্মরক্ষা করতে চাইছে।

প্রিয়নাথের মনে হয় তার হৃদ্‌পিণ্ডটা যেন মুচড়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে।

ঠিক বুকের কাছেই ফণাটা অল্প অল্প দুলছে। কতকাল একভাবে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকবেন প্রিয়নাথ। অসুতোষ কি লাঠিটা কখনো খুঁজে পাবে না। কোথায় গেল ছেলেটা। এত অন্ধকারে কেউ কখনো হারানো লাঠি খুঁজে পায়? তিনি নিজে আলোটা সরাতে পারছেন না। আলো সরালেই মৃত্যু।

প্রিয়নাথ বুঝতে পারছেন তার জরায় জীর্ণ শরীর অবশ হয়ে আসছে। হাত থেকে এখুনি টর্চটা খসে পড়ে যাবে। তার মানেই মৃত্যু। পরাজয় এবং লাঞ্ছনা সম্বল করেই তাকে পৃথিবী থেকে শেষ বিদায় নিতে হচ্ছে।

হঠাৎ বাবলা গাছের পিছনে আলোর বৃত্তের মধ্যে মানুষের একটা প্রকাণ্ড অবয়ব দেখতে পেলেন প্রিয়নাথ। হাতে উদ্যত লাঠি।

দাঁতে দাঁত চেপে চাপা গলায় অসুতোষ বললো, আলোটা তুমি ঠিক করে ধরে থাকো বাবা। নড়ো না।

প্রিয়নাথের কানে গলাটা অসুতোষের মতই মনে হলো। কিন্তু অন্তুর শরীর এত বিশাল হবে কি করে। সে তো এখনো কিশোর। সে তো এখনো ছোট। তবে কি মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চোখে বিভ্রম দেখেছেন প্রিয়নাথ!

আবার সেই আলোর বৃত্তের মধ্যে বিশাল অবয়ব। দুই পেশল শক্ত বাহুতে ধরা লাঠি উঠেছে শূন্যে। শ্বাস রুদ্ধ করে চূড়ান্ত মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছেন প্রিয়নাথ।

অসুতোষের চাপা গলা শোনা যায়, ভয় নেই বাবা। ভয় নেই।

চকিতে উদ্যত লাঠি সপাটে নেমে এলো সাপের মাথা লক্ষ করে। আলো জ্বালিয়ে রেখে এক লাফে সরে এলেন প্রিয়নাথ।

মাত্র একটি অব্যর্থ আঘাতেই সাপের মাথাটাকে বাবলা গাছের ডালের সঙ্গে থেঁতলে দিয়েছে অসুতোষ। সারা জীবনের শান্ত নম্র মানুষ প্রিয়নাথ যেন দারুণ হিংস্র গলায় গর্জন করে ওঠেন—মার, অন্তু, মার!

আরো কয়েকটা আঘাতে সাপের শরীরটাকে বাবলা গাছের সঙ্গে থেঁতলে ছিন্নভিন্ন করে দেয় অসুতোষ।

ঝিলের অন্ধকার ভিজে বাতাসে বড় করে নিশ্বাস টানেন প্রিয়নাথ।

এখন চরাচরের উপর দিয়ে রাত্রি। এই বিস্তীর্ণ জলাভূমির উপর এখনো জমাট বাঁধা অন্ধকার। মেঘময় আকাশ। এক হাতে টর্চ, অন্য হাতে লাঠি এবং কাঁধে বস্তা ঝুলিয়ে অনুতোষ ডাকে, তুমি আমার পিছনে পিছনে এসো বাবা। আদিম অন্ধকার জলাভূমি ছেড়ে পিতা-পুত্র লোকালয়ের দিকে যাত্রা করে।

রতন সান্যালের ব্যাধি ও তার প্রতিকার

'এইখানটায় বসুন আপনি। এই সোফাটায়। বেশ রিলাক্স্ করে বসুন। মনে কোন ভার রাখবেন না।'—বিশিষ্ট মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সেনের ঠোঁটে এক চিলতে হাসির রেখা দিল। —'আকাশে ঘুড়ি কেটে গেলে যেমনটি হয়, সেইরকম করে মনকে ছেড়ে দিন।'

ডাঃ সেনের নির্দেশে সোফাটায় বসলো রতন। তার উসকু খুসকু চুল। চোখের তারায় অস্থিরতা। মুখ অসম্ভব শুকনো। এক নজর দেখলেই রতনের খুব বড় রকমের অসুখ করেছে বোঝা যায়। দেহ এবং মনকে আল্‌গা করে ছেড়ে দিতে চাইলো রতন। কিন্তু মনকে আর নতুন করে ছাড়ার কিছু নেই তার। কয়েক মাস ধরে মনের অবস্থা তার কাটা ঘুড়ির মতই। কখন যে সেটা গোত্তা খেয়ে মাটিতে আছড়ে পড়বে তা সে নিজেও জানে না। মনের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে সে। শরীর দ্রুত অবনতির দিকে যাচ্ছে। রতনের মুখোমুখি তার চোখের সমান্তরালে কাঁচের একটি চৌকো বাক্স বসানো। ডাঃ সেন হেডফোনের মত কি একটা যন্ত্র তার কানের সামনে কপালের দুপাশে লাগিয়ে দিলেন। তারপর পটাপট ঘরের বাতিগুলি নিভিয়ে দিতে দিতে বললেন, চোখের উপর কোন রকম জোর না দিয়ে এই কাঁচের বাক্সটার দিকে তাকিয়ে থাকুন।

গাঢ় অন্ধকার ঘরে একটা সুইচ টেপার শব্দ হতেই সেই কাঁচের বাক্সটার মধ্যে পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হতে লাগলো লাল নীল হলুদ বেগুনী রঙের অত্যু-জ্জ্বল বর্ণচ্ছটা। রতনের চোখের পর্দায় এই সব বর্ণেরা খেলতে লাগলো এ্যাকুই-

রিয়ামে নানা রঙের মাছের মত। একটা মৃদু গম্ভীর বিলম্বিত লয়ের কণ্ঠ বেজে উঠলো : নয়…আট…সাত…ছয়…পাঁচ…চার…তিন…দুই…এক…শূন্য !

ক্রমাগত শূন্য হয়ে আসতে লাগলো রতনের মস্তিষ্কের ভিতরটা। তার চোখে পাতলা ঘুম জড়িয়ে যেতে লাগলো। সংখ্যা গণনাকারী কণ্ঠকে ক্রমেই সুদূর মনে হচ্ছে। এক সময় আলোর খেলা থামলো। সংখ্যা গণনা বন্ধ হলো। একটা নীল আলো জ্বাললেন ডাঃ সেন।

রতনের মাথাটি সোফার পেছনে হেলানো। চোখের পাতা বোজা। মুখমণ্ডলে অবসাদের ম্লান ছায়া।

ডাঃ সেন একটা ছোট টুল নিয়ে রতনের মুখোমুখি বসলেন। একটু সময় তাকিয়ে থাকলেন চুপচাপ। বোধ হয় শুরুটা মনে মনে সাজিয়ে নিলেন। এই রোগীকে নিয়ে এটা পঞ্চম সিটিং। কেসটা খুবই জটিল। একটি অনভিপ্রেত অনুভূতিকে রোগীর মস্তিষ্ক থেকে ইরেজ্ করে দিতে হবে। আগের তুলনায় মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুর কাজকর্ম তাদের কাছে অনেক পরিষ্কার। কেন্দ্রীয় নার্ভাস সিসটেম থেকে পরিবাহিত হয়ে মস্তিষ্কের যে অংশের কোষের ভিতরে যে ধরনের ক্রিয়া বিক্রিয়ায় স্মৃতির স্থায়িত্ব এবং স্মৃতিহীনতা কাজ করে তার অনেকখানিই এখন তাদের জানার সীমার মধ্যে এসেছে। কিন্তু এই সব জানা এই রোগীর পক্ষে এখনো কার্যকর করা যায়নি। যদি খুব তাড়াতাড়ি এই রোগীর মস্তিষ্ক থেকে খেয়াল খুশীমত হানাদার ঐ অনুভূতিটাকে মুছে দেওয়া না যায় তবে বদ্ধ উন্মাদে পরিণত হবে সে। নিজের কপালের মাঝখানটা আঙুল দিয়ে টিপে ধরলেন ডাঃ সেন। এই কেসটা তাকে যথেষ্ট বিচলিত করেছে। স্পষ্ট কোন আলো দেখতে পাচ্ছেন না তিনি। পরপর প্রশ্নগুলি মনের মধ্যে সাজিয়ে নিলেন ডাঃ সেন। তারপর পরিষ্কার এবং গম্ভীর গলায় প্রথম প্রশ্ন করলেন : আপনার নাম রতন সান্যাল ?

ঠোঁট নড়ে উঠলো রতনের। আচ্ছন্ন ঘুমের তলা থেকে তার ক্লান্ত কণ্ঠ শোনা গেলো : হ্যাঁ।

: আপনার নিহত বন্ধুর নাম বিভাস ?

: হ্যাঁ।

: সেই রাতের কথা মনে পড়ছে আপনার ? ১৯৭২ সালের ১৯শে আগষ্টের রাতের কথা ?

: পড়ছে।

ডাঃ সেন স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন রতনের মুখে। তিনি লক্ষ করলেন, এবার রতনের কপালে কয়েকটি কুঞ্চন রেখা এঁকেবেঁকে গেলো।

: বলুন তো। ঘটনাটা আবার বলুন।

সমস্ত শরীর স্থির। শুধু ঠোঁট নড়ে উঠলো রতনের: আমার বাড়ী থেকে বিভাসের বাড়ীর দূরত্ব বড় জোর সত্তর গজ। রাত তখন এগারোটার কাছাকাছি। মফঃস্বল শহর বলে সকলেরই একটু তাড়াতাড়ি শোবার অভ্যাস। হঠাৎ চিৎকার চেচামেচিতে বাড়ীর সকলেরই ঘুম ভেঙে গেলো। বুঝলাম গণ্ডগোলটা বিভাসের বাড়ীর সামনে। এর আগে আমাদের শহরে দু'চারটে খুনের ঘটনা ঘটেছে। সবই রাজনৈতিক খুন। সবাই বুঝতে পারছিলো, খুনগুলি কোন আকস্মিক হাঙ্গামার ফল থেকে নয়। এই সব খুনের মধ্যে একটা স্পষ্ট পরিকল্পনার ছাপ ছিলো। ফলে আমরা সকলেই অনেক বেশী আতঙ্কগ্রস্ত ছিলাম। এই পরিস্থিতিতে বিভাসের বাড়ীর হাঙ্গামা বুঝতে আমার বাকী রইলো না। বিভাস একটা রাজনৈতিক দলের কর্মী ছিলো। আক্রমণকারী কারা এবং তাদের চরিত্রের নিষ্ঠুরতা কত ভয়ংকর তা আমার অজানা ছিলো না। আমি দরজা খুলে বাইরে যাবার সাহস হারালাম। আমি বন্ধ ঘরের ভিতরে বসে বিভাস, তার স্ত্রী এবং বাচ্চার চিৎকার শুনলাম। তারপর এক সময় আর সহ্য করতে না পেরে কানে হাত চাপা দিয়ে বিভাসের আর্তনাদ ঠেকাতে হলো। খানিক বাদে থেমে গেলো। হাঙ্গামাকারীরা চলে গেছে এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে আমরা আশেপাশের কয়েকজন মিলে প্রায় কাঁপতে কাঁপতে বিভাসের বাড়ী গেলাম। কিছুই করার ছিলো না আমাদের। কিছুই না। বিভাস প্রায় রক্তে ভাসছিলো। পাশের ঘরে তার স্ত্রী আক্রমণকারীদের দ্বারা ধর্ষিতা। বাচ্চাটা বোবা চোখ মেলে মায়ের পাশে বসেছিলো।

রতনের ঠোঁট নাড়া বন্ধ হলো। ডাঃ সেন প্রায় তার বুকের উপর ঝুঁকে পড়ে চাপা ফিসফিসে গলায় বললেন: এবার মনে করুন তো, বিভাসের শবদেহ শ্মশানে নিয়ে যাবার পরের দৃশ্যটা মনে করুন। পারছেন মনে করতে?

রতনের ঠোঁট নড়ে উঠলো: অন্ধকার রাত। টিপটিপ বৃষ্টি। এলোমেলো বাতাস। মজা নদী বিদ্যাধরীর জল অনেক নীচে চিকচিক করছে। বিভাসের

চিতা জ্বলছে। আমরা ছড়িয়ে বসে। বাতাসের টানে চিতার আগুন লাফিয়ে উঠলেই আমাদের ছায়াগুলি দীর্ঘ হয়ে উঠছে। একটু দূরে বিভাসের স্ত্রী আমাদের দিকে পিছন ফিরে বসে। সে তখনো রীতিমত অসুস্থ। পশুর আক্রমণে তার শরীর ক্ষতবিক্ষত। আমাদের কোন নিষেধ সে শোনেনি। স্বামীর শেষ কাজে সে নিজেকে দূরে রাখতে চায় না। বাচ্চাটি তার পাশেই কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে। বিভাসের স্ত্রীর পিঠময় ছড়ানো রুক্ষ চুল।

উত্থান পতনহীন বিবৃতির মত একটানা বলাটা বন্ধ হলো রতনের। উত্তেজিত ভারী গলায় ডাঃ সেন বললেন: এবার সেই দৃশ্যটা ভাবুন। সেই দৃশ্যটা। কি মনে পড়ছে না?

অনুত্তেজিত স্বর শোনা গেলো রতনের: হ্যাঁ।

ডাঃ সেন ঝুঁকে পড়ে বললেন: বলুন, বলুন!

: বিভাসের স্ত্রীর পিঠময় ছড়ানো রুক্ষ চুল। বাতাসের টানে ছড়াচ্ছে। ফুলে ফেঁপে উঠছে। জোয়ারের জলের মত বাড়ছে। ধীরে ধীরে ঢেকে দিচ্ছে বিদ্যাধরীর তীর, জ্বলন্ত চিতা, আমাদের শ্মশানবন্ধুদের।

: তারপর?

রতনের গলা শোনা গেলো না।

চাপা তীব্র গলায় ডাঃ সেন বললেন: সেই অনুভূতিটা হচ্ছে না আপনার? সেই ভয়ংকর অনুভূতিটা।

রতনের ঠোঁট নড়ে উঠলো: না।

: ভাবুন, চেষ্টা করুন। সেই ট্রেনের কামরায় যেমন হয়েছিলো, রাস্তায় যেমন হয়েছিলো, সেই স্টেশনের পাশে কিংবা আপনার অফিসে যেমনটা হয়েছিলো।

রতনের কণ্ঠ স্তব্ধ।

ডাঃ সেন মরিয়া হয়ে উঠলেন: ভাবুন, চেষ্টা করুন। বিভাসের স্ত্রী··· ···পিঠময় ছড়ানো রুক্ষ চুল···ফুলছে···বাড়ছে···ছড়াচ্ছে, মনে করুন, আপনি তার মধ্যে ডুবে যাচ্ছেন। আস্তে আস্তে ডুবে গেলেন আপনি···দম বন্ধ হয়ে আসছে···আপনি নিশ্বাস নিতে পারছেন না···বাতাসের অভাবে হৃৎপিণ্ড ফেটে যাচ্ছে। ভাবুন···ভাবুন।

রতনের দিক থেকে কোন সাড়া এলো না। ডাঃ সেন হাতে হাত

বসলেন। অস্থির পায়চারী করলেন ঘরে। না, হলো না। বিশেষ কতক-গুলি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতের বাইরে কিছুতেই রোগীর মনে তিনি সেই অনুভূতিটা সঞ্চারিত করতে পারছেন না। আর তা করা না গেলে ঐ কষ্টদায়ক অনুভূতিটা তার মস্তিষ্ক থেকে মুছে দেওয়াও সম্ভব হবে না। ফলে এক চিরস্থায়ী স্নায়বিক পাগলামী এই যুবকটির সঙ্গী হয়ে থাকবে। কিন্তু কেন? কেন হুবহু সেই সব দৃশ্য ভাবতে পারা সত্ত্বেও সেই অনুভূতি তার মধ্যে কাজ করছে না, যা কোন কোন আকস্মিক ঘটনার মধ্য দিয়ে তার ভিতরে হঠাৎ জ্বলে ওঠে? কি সেই যোগসূত্র যা তিনি ধরতে পারছেন না?

ডাঃ সেন ঘরের আলোগুলি জ্বেলে দিলেন। চোখের পাতায় আঙুলের স্পর্শে রতন তাকালো। এবং আলোর দাপটে তখনই চোখ বুজলো। অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে থেকে জেগে ওঠার মত লাগছে তার। শরীর খুব ক্লান্ত।

ডাঃ সেন বললেন, 'আপনি এই কফিটা খেয়ে খানিক সময় রেস্ট নিন। পরে যাবেন।' এবং একটু থেমে আর চারবারের মতই আশ্বাস দিলেন, 'কিছু ভাববেন না আপনি, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

ডাঃ সেনের চেম্বার থেকে বেরিয়ে রতন পার্ক সার্কাস ট্রাম স্টপেজে এলো। এখন অফিসের সময় নয় বলে একটু বসার জায়গা পেলো। বসে চোখ বুজলো রতন। তার শরীর এবং মন দুই-ই প্রায় ভাঙনের মুখে। ডাঃ সেনের আশ্বাসে আর মনে জোর পাচ্ছে না। সে তিন মাসের ছুটি নিয়েছে অফিস থেকে। এরকম শরীর মনের অবস্থা নিয়ে কাজকর্ম চালানো অসম্ভব।

বিভাস তার অনেক দিনের বন্ধু ছিলো। অনেক কাছের বন্ধু। তাড় পাতরা বার করা মফঃস্বল শহরটার পথে ঘাটে, চায়ের দোকানে, বিদ্যাধরীর ধারে ধারে একসঙ্গে ঘুরে বেড়াবার স্মৃতি এখনো তার কাছে এই সেদিনের ঘটনা বলে মনে হয়। বাড়ীর বাইরে দাঁড়িয়ে তাকে একটা বিশেষ ভঙ্গিতে ডাকতো বিভাস।

: রতন, রতন, এই রতন!

: শেষের রতনটার উপর জোর দিতো সে। অর্থাৎ তাড়াতাড়ি বেরুবার জন্য একটা তাড়া থাকতো সেই জোরের মধ্যে। সে বেরিয়ে এলেই বলতো: সারাদিন ঘরে বসে কি করিস বলতো? ধ্যানট্যান করিস না তো?

: কার ধ্যান আর করবো বল ? আমার তো আর তোর মত ধ্যান করার কেউ নেই ।

: এই শালা, নো ঈর্ষা ! —হাসতে হাসতে রতনের পিঠে থাপ্পড় কষাতো বিভাস। তারা ক'জন মিলে হাটতে হাটতে পড়ন্ত বিকেলে বিদ্যাধরীর দিকে চলে যেতো। ঈর্ষা করার মত অনেক কিছুই অবশ্য বিভাসের ছিলো। এত বিষয়ে এমন করে জানতো বিভাস আর সেই সব জানাগুলিকে এত সুন্দর করে গুছিয়ে বলতো, যা তাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুগ্ধ করে রাখতো।

দীপু তো বলতোই : তুই শালা কথা দিয়েই তুক করেছিস মিনতিকে। কথা শুনেই তোর প্রেমে পড়ে গেছে মেয়েটা।

বিভাস হাসতো : কথা দিয়ে ছেলে ভোলানো যায়। মেয়েরা শুধু কথায় ভোলে না। তারা কাজ চায়।

: হ্যাঁ, তোমার যা কাজের নমুনা। সারাদিন টো টো করে রাজনীতি করছো। মেয়েরা তেমন কাজের লোকই চায় যেখানে সিকিউরিটি আছে।

রমেনের কথায় বিভাসের গলায় ঝাঁঝ ফুটে উঠতো : তোরা মেয়েদের সম্পর্কে প্রিমিটিভ ধারণাগুলি ছাড়তো। সমাজে সব কিছুর বদল ঘটছে আর তোরা মেয়েদের একই জায়গায় দাঁড করিয়ে রেখে ভাবছিস। আর সিকিউরিটি বলতেই বা কি বোঝাচ্ছিস ? সিকিউরিটিটাও তো রিলেটিভ ব্যাপার। সমাজের অবস্থা এবং সেখানে ব্যক্তির অবস্থান অনুপাতে জনে জনে তার মানেও তো বদলে যায়। তুই যাকে সিকিউরিটি মনে করিস, আর একজন তাকে মোস্ট ইনসিকিউরিটি মনে করে।

দীপু টিপপুনি কাটে : নে, বিভাস প্রায় মার্কসবাদে এসে গেছে।

বিভাস শান্ত গলায় বলে : মার্কসবাদে এসে গেছি না রে। মার্কসবাদের মধ্যেই আছি। দেখ্ দীপু, তুই অক্সিজেনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা না জেনেও অক্সিজেন টেনেই বেঁচে আছিস। তেমনি তুই আমি, আমরা সবাই মার্কসবাদের ব্যাখ্যার অধীন, মার্কসবাদ বুঝি আর না বুঝি।

রতন জিজ্ঞেস করে : মার্কসবাদে তোর সিকিউরিটির ব্যাখ্যাটা কি ?

বিভাস সিগারেট ধরাতে একটু সময় নেয়। তারপর বলে : বর্তমান সমাজে সিকিউরিটির দুর্দশাটা আগে শোন। যেমন ধর, মিনতির বাবা। লোকটা একজন সম্পন্ন বিজনেস্‌ম্যান। ভালো রোজগার। বাড়ীতেও বেশ

রমরমা। তোরা ভাবছিস তার অবস্থাটা খুব সিকিওরড্। আসলে ব্যাপারটা কি? বাজারে তো মিনতির বাবার চাইতে বড় বিজনেসম্যান আছে, তারাও তো বাজারে খেলছে। এই খেলায় মিনতির বাবা নিজেকে সব সময়েই ইনসিকিওর মনে করে। আর সত্যিই তো তাই। এই জটিল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভদ্রলোক যে কোন সময়েই বসে যেতে পারে। আসলে এই সমাজে তোর আমার, মিনতির বাবার, কারুরই সিকিউরিটি নেই। এখানে শেফ্ জঙ্গলের নিরাপত্তা।

দীপু বলে : তা হলে সিকিউরিটি শব্দটাই ইনসিকিওর।

বিভাস জোর দিয়ে বলে : নিশ্চয়ই। অন্তত এই সমাজে। যতদিন না উৎপাদিত পণ্যের বাজার নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার শেষ হবে ততদিন কারুরই সিকিউরিটি আসতে পারে না। আর মজাটা দেখ না, সিকিউরিটি অর্থাৎ অস্তিত্ব রক্ষা করতে গিয়ে সবাই মিলে সমাজকে মানুষকে ন্যায়নীতি-জ্ঞান শূন্য জন্তু করে ফেলছে।

বিদ্যাধরীর তীরে অপরাহ্ন শেষ হয়ে সন্ধ্যা হয়। আশপাশের গাছপালা নিরাবয়ব হয়ে উঠতে থাকে। বিভাস আমাদের একটা হাল্‌কা চাল থেকে গম্ভীর অবস্থার মধ্যে এনে ফেলেছে। তার যুক্তির অপ্রতিরোধ্যতা আমরা কেউ অস্বীকার করতে পারি না।

বিভাস আবার কথা বলে : উৎপাদন এবং সেই উৎপাদিত মাল বাজারে কাটানো আর তা থেকে লাভ করা, এই সমাজের এই হলো সারসংকলন। আর সব কিছুই হলো এর উপজাত। মানুষের স্বভাব চরিত্র, পারস্পরিক সম্পর্ক সব কিছু। এই বর্তমান সময়ের বিজ্ঞাপনের ব্যাপারটাই দেখ না। যেটাকে ঘটা করে শিল্প বলা হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে আমার নিজের যেটাকে রাক্ষস ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। বাজারে মাল কাটাবার এই চতুরালিটি দিবারাত্র মিথ্যার জাল বুনে বুনে মানুষের ন্যায়নীতিবোধের বারোটা বাজাচ্ছে। ফলে মানসিক ভারসাম্য হারাচ্ছে মানুষ। বিজ্ঞাপন-শিল্প না, শিল্প টিল্প সব বিজ্ঞাপনের পেটে চলে গেছে।

দীপু চোখ বড় বড় করে কৃত্রিম ভঙ্গিতে বলে : তুই এই সব আলোচনা মিনতির সঙ্গে করিস নাকি?

: নিশ্চয়ই। জোর দিয়ে কথাটা বলে বিভাস।

হাসতে হাসতে দীপু বলে : তারপরেও প্রেম থাকে ?

বিভাসও হাসে। বলে : তারপরেও যদি থাকে তবেই সেটা প্রেম। আর এখনো যখন আছে—কথা শেষ না করে বিভাস বাদবাকীটা বুঝিয়ে দেয়।

: হার মানছি বাবা, তোর সঙ্গে কথায় পারবো না। দীপু অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাত জোড় করে। বিভাস তার জামার কলার চেপে ধরে। তারপর ছেড়ে দিয়ে একটু গম্ভীর গলায় বলে : প্রেমটা করে ফেলে বড় ঝামেলায় পড়ে গেছি রে।

রমেন চিমটি কাটে : কেই বা কবে ঝামেলা ছাড়া প্রেম করেছে।

রতন বলে : একটু খুলেই বল্ না ?

: ভদ্রলোক কিছুতেই আমার হাতে মেয়ে দিতে রাজী নয়। আমার সঙ্গে বিয়ে হলে তার মেয়ের নাকি কোন সিকিউরিটি থাকবে না। একটু ম্লান হেসে বিভাস বলো : আবার সেই বস্তাপচা সিকিউরিটি !

: শালা, সেই জন্যই তুমি আমাদের এতক্ষণ সিকিউরিটি বোঝাচ্ছিলে। এটা এতক্ষণ ধরে মিনতির বাবাকে বোঝালে কাজে দিতো না ? বলতে বলতে দীপু উঠে দাঁড়ায়।

ছড়া কেটে আবার বলে : মিএণ বিবি রাজী তো কি করিবে কাজী। তোর বিবি কি বলে ?

: বিবি ঠিক আছে। মিনুকে যতটুকু বুঝেছি তাতে ওকে টলানোর সাধ্য ওর বাপের হবে না।

: দেন, খেল্ খতম্। নদী পারে সভা ভঙ্গ।

দীপুর ভঙ্গিতে সবাই একসঙ্গে হেসে উঠলো। সমবেত হাসির শব্দে ডানা ঝাপটিয়ে গাছ থেকে পাখি উড়ে গেলো।

বিভাস রতনের খুব বন্ধু ছিলো। এরকম অনেক স্মৃতি, অনেক ঘটনা একটা বয়স অবধি তাদের বন্ধুত্বকে বুনট করে রেখেছিলো। সেই বিভাস চলে গেলো। বুকে পিঠে, মুখে অন্তত তিরিশ জায়গায় ছুরি মারা হয়েছিলো বিভাসের। ওর রক্তাপ্লুত মৃতদেহের একটা দেওয়ালের ব্যবধানে ওর স্ত্রী ধর্ষিতা হয়েছিলো। আর নিরুপায় বোবা চোখ মেলে পাঁচ বছরের বাচ্চাটা সাক্ষী ছিলো সমস্ত কিছুর।

বিভাসের মৃত্যু ওর সমস্ত কিছুকে নাড়িয়ে ঝাঁকিয়ে চুরমার করে দিয়ে

গেছে একথা সত্যি। কিন্তু তারপরেও জীবনের নিয়মেই সে অফিস করছিলো বাজার যাচ্ছিলো, আরো টুকটাক সাংসারিক কাজকর্ম চালাচ্ছিলো যথা নিয়মে। যে ভয়ংকর অনুভূতিটা তার স্নায়বিক দুর্বলতাকে একেবারে পাগলামীর দোরগোড়ায় এনে ফেলেছে, তার থেকে আরোগ্যের কোন পথ দেখতে পাচ্ছে না রতন। এই অনুভূতিটা যদি ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে তার ভিতরে আসতো তা হলে তার একটা মানে খুঁজে পাওয়া যেতো। বিভাসের স্মৃতির সূত্র ধরে, ঐ অসহ্য হত্যাকাণ্ডের সূত্র ধরে তার একটা কার্যাকারণ ব্যাখ্যা করা সম্ভব হতো। কিন্তু এই অনুভূতিটা তাকে প্রকাশ্য দিবালোকে বিশেষ কয়েকটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তীব্র আক্রমণ করছে। সে তো দূরের কথা, বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন মনোরোগ চিকিৎসক ডাঃ সেনগু এর সূত্র ধরে উঠতে পারছেন না। এবং এই আক্রমণকারী অনুভূতিটা যে কত তীব্র, কত ভয়ংকর রতন তা কাউকে সঠিক বোঝাতে পারবে না। এই নিয়ে ডাঃ সেনের কাছে তার পঞ্চম সিটিং হলো। কিন্তু নিরর্থক। আরোগ্যের কোন আশা দেখতে পারছে না রতন। ক্রমাগত তার শরীর দুর্বল, স্নায়বিক অবসাদ বাড়ছে।

প্রথম শুরুটা হয়েছিলো তার অফিস থেকে।

টেবিল মুছে গ্লাসে জল ভর্তি করে সবে চেয়ারে বসেছে রতন। মাথার উপর শব্দ করে সিলিং ফ্যানটা ঘুরছে। দু'চারজন করে লোক আসতে শুরু করেছে। বাইরে করিডোরে কিছু মানুষের গলার আওয়াজ। ঠিক তখনই শুকনো মুখে, গম্ভীর গলায় প্রভাতদা এসে তাকে বললো:

: খবরটা শুনেছিস রতন?

: কিসের খবর? —রতন মুখ তুললো।

: সত্যেশ্বরদাকে ডিসচার্জ করে দিলো।

সত্যেশ্বর ঘোষ তাদের ইউনিয়নের সম্পাদক। চল্লিশের কাছাকাছি বয়স। শক্ত সমর্থ এবং কর্মিতকর্মা মানুষ। খবরটা শুনে প্রভাতদার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো রতন সান্যাল।

এবং ঠিক সেই মুহূর্তে।

ঠিক তেমনি করে। বহুদিন আগে একটা সিনেমায় দেখেছিলো রতন, টকটকে লেলিহান আগুনের মধ্য থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে পড়ছে একটার পর একটা ঘোড়া। দৃশ্যটা তাকে যুগপৎ ভয়, বিস্ময়, শিহরণ, অজানা সর্বনাশের

সংকেত এই সব শব্দার্থের সঙ্গে সম্যক পরিচিত করিয়েছিলো। ঠিক তেমনি—আজ এই মুহূর্তে—ঠিক তেমনি করেই একটা ভয়ংকর দৃশ্য লাফিয়ে উঠলো তার চোখের উপর জীবন্ত হয়ে।

অন্ধকার রাত। এলোমেলো বাতাস। টিপটিপে বৃষ্টি। বিদ্যাধরীর ঢালু তীর। অনেক নীচে চিকচিকে জলের রেখা। বিভাসের চিতা জলছে। তারা সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে। একটু দূরে তাদের দিকে পিছন ফিরে বসে আছে বিভাসের স্ত্রী মিনতি। তার পিঠের উপর ছড়ানো এলোমেলো রুক্ষ চুলের রাশি। পাঁচ বছরের বাচ্চাটা পাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে।

খুবই আকাস্মিকভাবে, তোড়ে বন্যার জল বাড়ার মত মিনতির পিঠের উপর ছড়ানো চুলের রাশি ফুলছে, বাড়ছে। ক্রমে সূক্ষ্ম তন্তুর মত চুলের রাশি ঢেকে দিলো বিদ্যাধরীর তীর, বিভাসের চিতা, শ্মশানবন্ধুদের। তার মধ্যে ডুবে যেতে যেতে রতনের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো। বাতাস বাতাস! দু'হাতে তুলে নিমজ্জমান রতন বাতাস খুঁজছে। তার হৃদপিণ্ড যেন একটা দানবীয় থাবার তলায় নিষ্পেষিত হচ্ছে। আকণ্ঠ পিপাসায় তার বুকের মধ্যে একটা মরুভূমি জলছে।

কতক্ষণ এরকম অবস্থায় ছিলো তা সে জানে না। যেন অনেক দূর থেকে সে একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেতো।

ঃ বোধ হয়, নিউজটা খুব শকিং হয়েছে ওর পক্ষে।

মুখের মধ্যে খড়খড়ে শুকনো জিভ নেড়ে রতন কোনক্রমে উচ্চারণ করলো ঃ জ-ল!

কে একজন তারই টেবিলের জলের গ্লাসটা বাড়িয়ে ধরতেই রতন কাঁপা কাঁপা হাতে গ্লাস টেনে নিয়ে জল খেলো।

কানে এলো সিলিং ফ্যানের কট কট শব্দ। লোকজনের কথাবার্তা। ঘোলাটে অবশ দৃষ্টি মেলে দেখলো টেবিল, ফাইল, দেয়াল ঘেসা সারি সারি আলমারী। অফিস।

প্রভাতদা বললো ঃ এ্যামবুলেন্স ডাকবো রতন?

রতন শুকনো গলায় বললো ঃ থাক।

টেবিলে মাথা রাখলো রতন। অসম্ভব দুর্বলতা তার শরীরের কোষে কোষে ছড়িয়ে আছে।

মাথার ভিতরটা যেন অসার। স্নায়বিক দুর্বলতায় তার গা হাত পা রীতিমত কাঁপছে। সেই আরম্ভ।

এখন এটা নিয়ে রতনের মধ্যে কোন জটিল ভাবনা দেখা দেয়নি। বিভাসকে কেন্দ্র করে বীভৎস ঘটনার ছবি তখনো তার মধ্যে একটুকু ম্লান হয়নি। তার মনের উপর সেই ঘটনার প্রভাব একেবারে দগদগে হয়ে আছে। কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। এরকমই ভাবতে চেষ্টা করেছিলো রতন।

যদি না মাস তিনেক বাদে আর একটা ঘটনা একই রকম করে ঘটতো। সন্ধ্যা ছুঁই ছুঁই সময়ে স্টেশনে অপেক্ষা করছিলো সে। ট্রেন ধরবে। স্টেশনে লোকজন ভালোই। হঠাৎ একটি মেয়েলী গলার আর্ত চিৎকারে সবার চোখ সেই দিকে ফিরলো। জন পাঁচ সাতেক লোক মিলে একটি মেয়েকে টেনে হিঁচড়ে স্টেশনের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে।

মেয়েটি চিৎকার করলো: বাঁচাও, বাঁচাও!

উপস্থিত লোকজনের মধ্যে একটু চঞ্চলতা। দু'চারজন এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলো। ততক্ষণে কিডন্যাপিং গ্রুপটার দু'জনার হাতে পকেট থেকে পিস্তল উঠে এসেছে।

: খবরদার!

লোকজন থমকে গেলো। মেয়েটি তখনো চিৎকার করছে। দলটা স্টেশনের বাইরে চলে যেতেই সেই সিনেমায় দেখা আগুনের মধ্য থেকে ঘোড়ার লাফিয়ে পড়ার মত দৃশ্যটা তার সামনে লাফিয়ে পড়লো। অবিকল সেই অফিসে দেখা দৃশ্যটা। ঠিক সেই রকম করে ডুবে যাচ্ছিলো রতন। বাতাস নেই। কোথাও বাতাস নেই। হৃদপিণ্ড কুঁকড়ে ক্রমশ ছোট হয়ে যাচ্ছে। সম্ভবত এরই নাম মৃত্যু।

তারপর রতন যখন মৃত্যুর অন্ধকার কিনার থেকে ফিরে এসে বাতাসে প্রথম নিশ্বাসটি নিলো, তার চারপাশে কৌতূহলী লোকজনের ভীড়।

: জ-ল!

একজন দৌড়ে গিয়ে সামনের চায়ের স্টল থেকে জল এনে দিলো রতনকে।

একজন জিজ্ঞেস করলো: প্রেসার আছে নাকি মশাই?

রতন মাথা নাড়লো।

পাশ থেকে কে একজন বললো: একেই সন্ন্যাস রোগ বলে।

একজনের সাহায্য নিয়ে রতন ওয়েটিং রুমের বেঞ্চির উপর টান টান হয়ে শুয়ে পড়লো। তার এখন এক পা হাঁটবার সামর্থ্য নেই। কি যেন তাকে নিংড়ে নিঃশেষ করে রেখে গেছে।

এই সমস্ত কিছুই ডাঃ সেনকে খুলে বলেছে রতন। ডাঃ সেন শুনেছে। নোট করেছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা রকম প্রশ্ন করেছে তাকে। তারপর সেই সব প্রক্রিয়া। নিদ্রা আর জাগরণের মাঝখানে তাকে ঝুলিয়ে রেখে সেই বারংবার বলা ঘটনার পুনরাবৃত্তি। হচ্ছে না। কিছু হচ্ছে না। রতন বুঝতে পারছে, তার আরোগ্যের আশা কম। সেই ভয়ংকর অনুভূতিটার হঠাৎ হঠাৎ হানাদারীতে তার জীবনী শক্তি ক্রমাগত লুণ্ঠিত হচ্ছে। এভাবে বেশী দিন বাঁচা সম্ভব নয়।

ডাঃ সেন অবশ্য বারবারই ভরসা দিচ্ছেন তাকে: ভয় নেই আপনার, ভয় নেই। একদম ভালো হয়ে যাবেন।

অবসাদমাখা গলায় রতন বলে: মনের জোর হারিয়ে যাচ্ছে আমার।

: ডোণ্ট থিংক সো। দুটো ছোট্ট জিনিস করতে পারলেই আপনি ভালো হয়ে যাবেন। প্রথমত, কেন ঐ ধরনের বিশেষ বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আপনার মধ্যে সেই অনুভূতিটা আসছে? এই দুইয়ের মধ্যে যোগসূত্র কি? দ্বিতীয়তঃ, ঐ ধরনের বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বাইরে আপনার মধ্যে সেই অনুভূতিটাকে সঞ্চারিত করা।

: কিন্তু অনেক তো চেষ্টা হলো। হচ্ছে কোথায়?

: হবে হবে, সারটেনলি হবে। ডাঃ সেন জোর দিয়ে বলেন।

বিভাস বলতো, এই সমাজে আমরা সবাই ইনসিকিওরড। রতন নিজেকে এখন আর নিরাপদ ভাবতে পারছে না। নিশ্চয়েই নিরাপত্তাহীনতার কারণ ঘটেছিলো বিভাসেরও। ফলে তাকে নির্মমভাবে মরতে হলো কতকগুলি ঘাতকের হাতে। তার মৃত দেহের দু'হাত ব্যবধানে তারই প্রতিমাকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে রেখে গেলো ঘাতকেরা।

মৃত্যুর কয়েক মাস আগেও বিভাস তাকে বলেছিলো: তলে তলে ভাঙ্গনটা অনেক দূর এগিয়েছে রে, রতন। এবার দেখবি নানা রকম ঘটনা ঘটতে শুরু করবে।

: কি রকম?

: এই ধর, খুনখারাপী, গুপ্ত হত্যা এই সব আর কি।

: এ সব নিয়ে তোরা যারা রাজনীতি করিস, তারা মাথা ঘামাবি। আমরা অফিস করি, সংসার করি, আমাদের এসব পোষায় না।

অল্প হেসে বিভাস বললো : বন্ধু, ক্যানসার কি, তুমি না জানতে পারো। জানতে নাও চাইতে পারো; কিন্তু তাই বলে ক্যানসার তোমাকে ছেড়ে কথা কইবে না! আর এ তো সামাজিক ক্যানসার, এর হাত থেকে কোন মতেই রেহাই নেই।

রতন মনে মনে বললো, নারে বিভাস, ক্যানসারের আক্রমণ থেকে আমি রেহাই পাইনি। ঘাতকের ছুরি তোকে সরাসরি মেরেছে। আমি তারই উপজাত ঘটনায় আক্রান্ত। এই আক্রমণ আমাকে তিলে তিলে মারছে। মুক্তির কোন উপায় দেখছি না আমি।

ট্রেনের ঘটনাটা মনে পড়লো রতনের।

অফিস ফেরৎতা ট্রেনের কামরাটা ডেলিপ্যাসেঞ্জারে বোঝাই। কোথাও তিলধারণের জায়গা নেই। ফিরবার পথে সারা দিনের অভিজ্ঞতা বিনিময় করছে যাত্রীরা। কি কারণে কে ক্ষুব্ধ হয়েছে, কে কোথায় একটা জমার ঘটনা দেখেছে, কার কাছে কার কি প্রত্যাশা ছিলো, হয়নি, জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, সরকার, দেশ, রাজনীতি, সিনেমা, থিয়েটার, গুরুবাদ সব মিলিয়ে একটা প্রচণ্ড হল্লার সিমফনি বাজছে কামরাটায়। প্রত্যহের অভ্যাসে এসব আর গায়ে লাগে না রতনের। সে এক ধারে কোণায় ঠেসান দিয়ে বসে কয়েকজনের সঙ্গে গল্প করতে করতে আসছিলো।

দুএকটা স্টেশন পেরুতেই দরজার কাছে একটু ঠেলাঠেলি শুরু হলো। এবং তারপরেই একটা চোয়াড়ে গলা হেঁকে উঠলো দরজার কাছ থেকে : এইধারে দেখুন!

চড়া এবং রক্ষ হওয়ার জন্য গলাটা সবার কানেই পৌছুলো। নানা ধার থেকে চোখ ঘুরে এলো দরজার বিন্দুতে। তিনটে পিস্তল উঁচিয়ে তিনজন যুবক দাঁড়িয়ে। গলাটা আবার কথা বললো : আমাদের লোকেরা যাচ্ছে। যার যা আছে দিয়ে দেবেন। ঘড়ি, আংটি, বোতামও। পাঁচ মিনিট সময়। কেউ ট্যাফোঁ করবেন না। গুলিতে ছ্যাঁদা করে দেবো।

যন্ত্রচালিতের মত ছ'জন যুবক হাতে উদ্যত ছোরা নিয়ে একে একে

যাত্রীদের যথাসর্বস্ব কেড়ে নিতে লাগলো। কে একজন ঘড়ি খুলে দিতে আপত্তি করায় ছোরার ঘায়ে তার হাতের একটা আঙ্গুল উড়ে গেলো। ঠিক কাঁটায় কাঁটায় পাঁচ মিনিট। দুই স্টেশনের একটা মধ্যবর্তী জায়গায় দলটা চেন টেনে নেমে গেলো।

আর ঠিক তখুনি, সেই সিনেমায় দেখা আগুনের ভিতর থেকে লাফিয়ে পড়া ঘোড়ার মত সেই ভয়ংকর দৃশ্যটা রতনের চোখের ওপর লাফিয়ে উঠলো। হুবহু সেই দৃশ্যটা। যেটা সে তাদের অফিসের সত্যেশ্বরদা ছাঁটাই হয়ে যাবার পর দেখেছিলো, স্টেশনে যুবতী মেয়েটির লাঞ্ছিত হবার সময় দেখেছিল। ঠিক তেমনটি।

মিনতির পিঠের উপর ছড়ানো চুল ঝন্যার জলের মত ফুলছে, বাড়ছে, ছড়াচ্ছে। একে একে ঢাকা পড়ছে বিদ্যাধরীর তীর, বিভাসের চিতা, তারা শ্মশানবন্ধুরা। ডুবে যেতে যেতে বাতাসের জন্য মুখ উঁচু করে আকাশের দিকে হাত ছোড়ে রতন। নিরন্ধ্র, নিবাতাস পৃথিবী। হৃদপিণ্ড ফেটে যাচ্ছে। বুকে মরুভূমির জ্বালা।

শ্লেট থেকে লেখা মুছে যাবার মত রতনের চোখের সামনে থেকে ধাবন্ত ট্রেন, লুণ্ঠিত যাত্রীদের হাহাকার সব চকিতে মুছে যায়।

পরপর কয়েক মাসের মধ্যে এরকম ঘটায় রতন এখন রীতিমত ব্যাধিগ্রস্ত। তার স্নায়ুমণ্ডলী শিথিল হয়ে যাচ্ছে। মস্তিষ্কে অসহ্য প্রদাহ আর দুর্বলতা। ধাপে ধাপে সে পাগল হবার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মুঠো দিয়ে ট্রামের জানালা চেপে ধরে রতন। কিন্তু কেন, কেন এরকম কোন ঘটনা ঘটলেই সেই দৃশ্য থেকে উঠে আসা ভয়ংকর যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতির সাঁড়াশীটা তাকে নিষ্ঠুরভাবে চেপে ধরে? কেন বাতাসহীন হয়ে পড়ে তার পৃথিবী? কেন?

ডাঃ সেন বলেছেন, মস্তিষ্ক থেকে এই অনুভূতিটা মুছে দিতে পারলেই সে আরোগ্য লাভ করবে। এই নিয়ে পঞ্চমবার সিটিং হলো ডাঃ সেনের সঙ্গে। কাজ একবিন্দু এগোয়নি। ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়ছে রতন। তার আর আরোগ্যের আশা নেই। হতাশ রতন ট্রামের মধ্যে চোখ বুজলো।

দিন সাতেক পরে।

ডাঃ সেনের সঙ্গে ডেট ছিলো রতনের। পার্ক সার্কাস ট্রাম স্টপেজে নেমে সে আস্তে আস্তে হেঁটে যাচ্ছে ডাঃ সেনের চেম্বারের দিকে। তার

দেহমন রীতিমত অবসন্ন। তার মনে হচ্ছিলো ডাঃ সেনের ওখানে না গিয়ে সোজা চলে যায় হাওড়া ব্রীজে। সেখান থেকে লাফিয়ে পড়তে এক মুহূর্ত। অথবা রেল লাইনে গলা দিয়ে শুয়ে থাকে। রতন ভয় পেলো। তার মস্তিষ্ক তাকে আত্মহত্যার দিকে টানছে। অর্থাৎ সে আত্মহত্যাপ্রাণ হয়ে উঠেছে। তার মানে অবস্থা আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে। রতন দ্রুত পা চালালো।

এবং তার ডান দিকের গলির মুখ থেকে গণ্ডগোলটা ভেসে আসতেই সে থমকে দাঁড়ালো। প্রায় অন্ধকার গলি। একটু তাকিয়ে থেকে চোখ সহনীয় হলো রতনের। একটি সতেরো আঠারো বছরের ছেলেকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে একদল লোক নির্মমভাবে মারছে। ছেলেটি চিৎকার করছে। ছেড়ে দেবার জন্য অনুনয় বিনয় করছে। অশ্লীল খিস্তি খেউড়ের সঙ্গে বেধড়ক হাত চালিয়ে যাচ্ছে লোকগুলি। এই ঘটনার নেপথ্যে কি আছে রতন জানে না। তার সামনে এখন এই দৃশ্যটা।

হঠাৎ ঝাঁকুনি খেয়ে শিউরে উঠলো রতনের সর্বাঙ্গ। এখুনি সেই দৃশ্যটা, সেই অসহ্য অনুভূতিটা তাকে আক্রমণ করবে। তার স্নায়ুমণ্ডলী সেই অবস্থার অনুকূলে সাড়া দিতে শুরু করেছে। পরিষ্কার বুঝতে পারছে রতন।

হঠাৎ রতন একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসলো। জ্যা মুক্ত তীরের মত সোজা গলিটার মধ্যে ছুটে গেলো। তার গলায় একটা অবিশ্বাস্য হুংকার জেগে উঠলো ঃ এ্যাই, খবরদার! ছেড়ে দাও বলছি, ছেড়ে দাও!

ঃ কোন্ রে, শালা!— খিস্তি দিয়ে দলটা ঘুরে দাঁড়ালো।

রতনের মনে হলো, কে যেন তাকে এক টুকরো পাথরের মত ছুঁড়ে দিলো জান্তব লোকগুলির মধ্যে। তারপর আর তার কিছু মনে নেই।

কারা যেন তাকে মাটি থেকে ধরে তুললো। ছেঁড়া জামা ঝুলছে তার গায়ে। এখানে ওখানে রক্তের দাগ। কপালটা চিন চিন করছে। ঠোঁটে রক্তের নোনা স্বাদ। অনেক লোক চারদিকে ভীড় করে আছে।

ঃ কি হয়েছিলো মশাই? কি ব্যাপার?

ঘটনাটা জানার জন্য কৌতূহলী হয়ে উঠেছে লোকজন। তাকে ঘিরে দাঁড়ানো অপরিচিত মানুষগুলির মুখ দেখতে দেখতে কি রকম যেন চমকে উঠলো রতন।

হয়েছে! সেই ভয়ংকর অনুভূতিটা এবার তার মধ্যে কোন কাজ

করেনি। হঠাৎ উপস্থিত মানুষগুলিকে হতভম্ব করে দিয়ে রতন চেঁচিয়ে উঠলো: আই এ্যাম্ কিওরড! আমি ভালো হয়ে গেছি! তারপর সে ছুটতে শুরু করলো ডাঃ সেনের চেম্বারের দিকে।

পিছনের লোকগুলি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো। কে একজন বললো: পাগল মশাই, পাগল।

একটি অশ্বারোহীর উক্তি

না। কোনক্রমেই এটাকে খুনের ঘটনা বলা চলে না।

অথচ ঠিক এটাকে কেন্দ্র করেই আমার বিরুদ্ধে একটা গভীর চক্রান্ত চলছে। আমাকে প্যাঁচে ফেলে খতম করার মতলব আঁটছে সব। এই সব হাড়হাভাতে লোকগুলোকে আমি দু'চোখে দেখতে পারি না। এদের চলাফেরা দেখলে, কথাবার্তা শুনলে আমার পিত্তি অবধি জ্বলে যায়। সমস্তক্ষণই একটা রোখা রোখা ভাব। ভদ্রতা সভ্যতা বলে কোন ব্যাপার যেন এদের জানাই নেই। সময় নেই, অসময় নেই, চোখে মুখে একটা খাই খাই ভাব। ক্ষুধার চিতা যেন অষ্টপ্রহর পেটের মধ্যে জ্বলছে। আরে, ক্ষুধাটাই কি একটা বড় ব্যাপার হলো নাকি। ক্ষুধা তো জন্তুজানোয়ারেরও আছে। কিন্তু তোরা তো মানুষ।

সারা দিনে রাতে কি খাই আমি! কত সামান্যতেই না আত্মাকে তৃপ্ত করবার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছি আমি। ভোরে একটু দই দিয়ে বেলের সরবৎ, বেলা ন-টা দশটা নাগাদ দু'খানা সন্দেশ দিয়ে চাট্টি সাদা মুড়ি, বেলা একটার আগে আমি কোনদিনই দুপুরের খাওয়া খেতে পারি না। কত দায়, কত দায়িত্ব আমার ঘাড়ে। এত বড় ব্যাপার সামলানো চাট্টিখানি কথা নাকি। কাজে কাজেই দুপুরের ভাত নিয়ে বসতে পাকা দেড়টা। বড় বউ সব আগলে নিয়ে বসে থাকে। স্বামীর প্রতি বেশ একটা শ্রদ্ধাভক্তির ভাব আছে। আর তোদের ঘরের বউঝিদের দেখ্। হুট বলতে যেখানে সেখানে যাচ্ছে, খাচ্ছে। যখন তখন মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমন কি হাঙ্গামা হুজ্জুতের মধ্যে পর্যন্ত মাথা গলাতে আসছে। আমি অবশ্য বড় বউকে বলি, আমার তো দয়ার শরীর, তাই বুকের কথা টুক্ করে মুখে উঠে আসে আমার, 'শরীরকে কষ্ট দিকে আমার জন্য তুমি বসে না থাকলেও তো পারো।'

বড় বউ কোন জবাব করে না। কথাবার্তা আজকাল খুবই কম বলে বড় বউ। এটা ভালো লক্ষণ। মেয়েরা মুখরা হলে ঘরে লক্ষ্মী থাকে না। সংসারে লক্ষ্মী যত বাড়বাড়ন্ত হচ্ছে, বড় বউএর কথা বলার অভ্যাস ততই কমে যাচ্ছে। আমি আর কথা বাড়াই না। সাধ্বী স্ত্রীর পাত্ প্রসাদের ইচ্ছাকে ছোট করতে পারি না আমি। তাছাড়া মেয়েদের আমি খুব বড় বলেই মনে করি। মেয়েরা হচ্ছে ধরিত্রির মত। যত অত্যাচারই কর, মুখে রাটি নেই। আহা, সবাই যদি এমনি হতো। এমনি সহ্য করবার ক্ষমতা থাকতো সকলের।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম, ঐ দুপুরের খাওয়া। সামান্য চাট্টি ভাত, একটু তেতো গোছের কিছু, ওটা আবার আমার চাই-ই, পিত্তের ধাত আছে আমার, একটু ডাল তরকারী, অল্প ভাজাভুজি, কিছুটা টাটকা মাছ—হ্যাঁ, মাছটা আমার টাটকাই চাই, ডাক্তারের উপদেশ আমি অন্যথা করতে পারি না, সঙ্গে একটু চাট্নী। ব্যাস্, চুকে গেলো দুপুরের খাওয়া। তারপর অল্প একটু গড়িয়ে নেওয়া। বেশী সময় কোথায় বিশ্রামের। কত কাজ, কত দায়িত্ব। উঠেই একটা ডাবের জল খেতে হয় আমাকে। ডাক্তারকে বলেছিলাম, এটা বাদ দেওয়া যায় না ডাক্তার? এত গরীব দেশে বিলাসিতা করতে বড় কষ্ট পাই।

শুনে একবারে হাহা করে উঠেছিল ডাক্তার, তা হলে ডাক্তারীটা আপনিই করুন। আমি বিদেয় হই। কতবার বলেছি, আপনার একটু ডাইবিটিসের ট্রাবল আছে—ডাবের জলটা জরুরী। তাছাড়া আপনি বড় নিজের কথাই ভাবেন। একবারও ভেবে দেখেছেন, ঈশ্বর না করুন, আপনার কিছু একটা হলে কত লোক পথে বসবে? আপনার হাত দিয়ে জোগানো কত লোকের মুখের অন্ন বন্ধ হয়ে যাবে?

না। এরপর আমার আর কথা বলা শোভা পায় না। বলিওনি। অভ্যাসটা বহাল রেখেছি। বিকেলে কয়েক কুচি কাটা ফল পাঠায় বড় বউ। এটা বড় বউ অনেকদিন ধরে করে আসছে। তাকে আমি দুঃখ দিতে পারি না। আর রাতে তো একবাটি খইয়ের সঙ্গে একগ্লাস দুধ। দুধটা অবশ্য একটু ঘন চাই। এই বদ অভ্যাসটি আবার আমার মা করিয়ে দিয়ে গেছেন। পুত্রস্নেহ তো।

কি হলো? চোখ ছোট করে মুখ বাঁকাচ্ছিস যে বড়? জানতাম, বিশ্বাস হবে না। তোদের আমি চিনি না। বেশ হাড়ে হাড়েই চিনি।

কি বললি? আমার এত অগাধ সম্পত্তি আর এতো কম খাই কেন? ওরে বোকা, এইখানেই তো তোদের সঙ্গে আমার তফাং! তোদের তো অন্নের থালায় পাহাড় না হলে চলে না। কই তখন তো মনে পড়ে না, আর একজন অভুক্ত আছে? কিন্তু আমার পড়ে। আর পড়ে বলেই আমাকে সাধনা করে মিতাহারী হতে হয়েছে।

আর তোদের ঐ এক এক মহাদোষ, আমার সম্পত্তিটাই খালি অগাধ দেখতে পাস। জ্বালা করে আমার, এই সব কথা শুনলে গা জ্বলে যায়। ঈর্ষা—ঈর্ষার চোখ দিয়ে না দেখলে, লোভ আর পাপের দৃষ্টি দিয়ে না দেখলে আমার সম্পত্তিটা কখনো অগাধ দেখা যায়? আমি কি বুঝি না, আমি কি জানি না, এইখানেই তোদের জ্বালা, এইখানেই তোদের আসল কুমতলব! সেই জন্যেই একেবারে আটঘাট বেঁধে চক্রান্ত পাকাচ্ছিস আমার বিরুদ্ধে। তা না হলে অবনীকে নাকি আমিই খুন করেছি, এরকম একটা বদ কথা চাউর হয় চারদিকে?

অবনী যে জীবের নিয়মে মরেনি তা তোরা বুঝলি কিভাবে? রক্তের দাগ ছিলো কোথাও? কোন আঘাতের চিহ্ন ছিলো অবনীর গায়ে? পেটে বিষ পেয়েছে ডাক্তার? পায়নি। তবে খুনটা কেমন করে হলো? এটা কি চালাকি! একটা লোককে ফস করে খুনী বলে দিলেই হলো! সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই! দেশ থেকে কি আইন আদালত উঠে গেছে। এটা কি মগের মুলুক!

আসলে আমি কি আর তোদের মতলব জানি না। অবনী কবনী সব বাজে কথা। আমাকে বেকায়দায় ফেলাটাই হচ্ছে মোদ্দা ব্যাপার। আমাকে বেকায়দায় ফেলতে পারলেই কাজ হাসিল। সম্পত্তিটা একেবারে লুটেপুটে খাওয়া যায়।

কিন্তু হুঁ হুঁ বাবা, আমাকে বেকায়দায় ফেলাটা এত সোজা নয়। নাম জানিস তো আমার? সদর থেকে শুরু করে একেবারে গণ্ডগ্রাম অবধি ঘুরে আয়। খানকতক যোজা চষে ফেল। দেখবি সবাই চেনে আমাকে। একেবারে একডাকে চেনে। জন্মকালা ছাড়া সিদ্দেশ্বর ঘোষালের নাম কে না

জানে। সেই আমাকে বেকায়দায় ফেলবে তোদের মত ক'টা হাড়হাভাতে! ভাবলেও মেজাজ খিঁচড়ে যায়। একেবারে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে বুকের মধ্যে। চড়াৎ করে রাগ চড়ে যায় মাথায়।

কিন্তু না, রাগবো না আমি। রাগটা ঠিক হবে না। ডাক্তার বলেছে, ভুলেও কখনো রেগে যাবেন না ঘোষাল মশাই। রাগটা আপনার পক্ষে ক্ষতিকর হবে। প্রেসার আছে তো একটু।

না, রাগবো না আমি। হাসি হাসি মুখে, হাসি হাসি মনে, একেবারে সহজ ভাবে—যেন কিছুই না এমনভাবে সব করবো আমি।

কিন্তু মুসকিল হয়েছে এই, আমি অন্যায় একদম সহ্য করতে পারি না। মিথ্যাকে আমি আন্তরিক ঘেন্না করি। কই, আমি তো কখনো সত্য গোপন করি না। হ্যাঁ, সম্পত্তি আছে বইকি আমার। অল্পস্বল্প কিছু আছে। কিন্তু কখনো ভেবে দেখেছিস, কেন আছে? তোদের নেই অথচ আমার আছে। কেন? তোদের থাকলে কি ক্ষতি ছিলো? এইখানেই থাকা না-থাকার আসল রহস্য। রহস্য তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা করবি না তোরা—দুদণ্ড স্থির হয়ে বসতে শিখলি না। খালি হৈ হৈ, মার মার, কাট কাট। অমুকের সম্পত্তি আছে কাজেই বুকের মধ্যে টনটনানি। এসব তো ছোটামি, নোংরামি।

বিশ্বসংসারের রহস্য বুঝলে এসব আর থাকতো না তোদের মধ্যে। আমার খামার বাড়ীর পশ্চিম কোণে একটা জবাফুলের গাছ আছে দেখেছিস্ তো। একই তো গাছ, মাটি থেকে রস টানবার একই তো শেকড়। তা হলে তার এক ডালে লাল জবা, অন্য ডালে হলুদ জবা কেন? একই তো মানুষ, সেই একই পৃথিবীর মধ্যে তো বাস। তাহলে একজনের সম্পত্তি দিন দিন ফুলের মত ফুটে উঠেছে, আর একজনের শুকিয়ে যাচ্ছে কেন? ওরে হদ্দ বোকার দল, এইখানেই তো রহস্যের চাবিকাঠি। ফোটা ফুলই দেখতে পাস। ফুলের ফুটে ওঠা কখনো দেখতে পাস কি? সম্পত্তিই চোখে পড়ে সম্পত্তি গড়ে তোলা চোখে পড়ে কি? এর নাম রহস্যও বলতে পারিস, ক্ষমতাও বলতে পারিস। এটা কারু কারু থাকে। সকলের থাকে না।

এই অবনীকেই দেখ না কেন, যাকে আমি খুন করেছি বলে তোরা হাটে মাঠে ফিসির ফাসির করে বেড়াচ্ছিস। খুন, আহা হা, কথাটা তোদের মুখেই মানায় বটে। এই তো সেদিন, বছর দুয়েক আগেই, করিস নি তোরা

খুন? মেচেদার শিকদারদের দুই ভাইকে। একেবারে প্রকাশ্য দিনের আলোতে। কে না দেখেছে, কে না শুনেছে ঘটনাটা। আমি তো প্রত্যক্ষদর্শীর মুখ থেকেই শুনেছি ঘটনাটা। রক্তে নাকি একেবারে ভেসে গিয়েছিল বারান্দা, সিঁড়ি। সেই শুনেই তো শহরের বাড়ীতে চলে গিয়েছিলাম কিছুদিনের জন্য। তোরা হয়ত এটাকে ভয় বলে চাপা হাসতে পারিস। কিন্তু আমি বলবো কৌশল। মহাভারত পড়িসনি? দুর্যোধন দ্বৈপায়ণ হ্রদে পালিয়ে গিয়েছিল। আত্মগোপন তো রাজধর্ম। এর মধ্যে বেয়াকুবের মত হাসাহাসির আছেটা কি!

হ্যাঁ, যা বলছিলাম, তোরা যে শিকদারদের দুই ভাইকে কসাইয়ের মত খুন করলি, ওঃ, রক্ত নাকি অঢেল পড়েছিলো। কেন, কি করেছিল তারা? অবশ্য তোদের ঝুলিতে অনেক বানানো গল্প আছে। আর সব লোকেরাও হয়েছে তেমনি, বানানো গল্প পেলে একেবারে গিলে খায়। রঙের উপর রঙ চাপিয়ে তাকে একেবারে রঙচঙে করে ছাড়ে।

তাছাড়া ওরকম একটু আধটু হয়। কবে না হয়েছে। সেই আদিকাল থেকেই তো চলে আসছে। তাই নিয়ে মাথা গরম করলে গরীবদের চলে নাকি। মেনে নেওয়ার অভ্যাস চলে গেলে গরীবের আর কি থাকে। আর তোরা একসঙ্গে একেবারে দঙ্গল বেঁধে মারমুখী হয়ে বললি, 'এর প্রতিকার চাই-ই।' দেখো একবার কাণ্ড। এর আবার প্রতিকার কি। কোন কালে এর প্রতিকার হয়েছে, না কেউ চেয়েছে। দিন দিন যত আজগুবি আবদার বাড়ছে তোদের।

এমন একটা অন্যায় কি করেছে শিকদারদের ভায়েরা। জোয়ান বয়স, তার উপর কত বড় সম্পত্তিওয়ালা বংশের ছেলে—ওরকম একটু আধটু হয়ে থাকে বৈকি। আর মেয়েটাও কত গরীব ঘরের দেখ। পারতো ওর বাপ একটা ঠিকঠাক মত বিয়ে-থা দিয়ে দিতে? অত বড় বংশের ছেলেরা স্নেহ করছে, একটু বিনীত হয়ে মানিয়ে গুণিয়ে থাক। মেয়েটাকেও বলিহারি যাই। মেয়ে হয়ে জন্মেছিস্ এইটুকু সহ্য করবার ক্ষমতা নেই। একেবারে ফস করে গিয়ে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়লি।

আর তোরাও বাহাদুর বটে। এই এত বড় একটা অন্যায়ের কথা কিন্তু

ভুলেও মুখ ফুটে বললি না। পরিবর্তে একেবারে দল বেঁধে শিকদারদের বাড়ীর সামনে গিয়ে আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগলি, 'বিচার চাই, বিচার চাই!'

হেঁ হেঁ, শিকদারদের বাড়ীটা যেন আদালত। চোগা চাপকান পরে ভিতরে যেন জজ সাহেব রায় লিখবার জন্য কলম মুখিয়ে বসে আছেন। তোরা ভুলে গেলি ওটা একটা সম্ভ্রান্ত পরিবারের বাড়ী। ভিতরে মেয়েরা আছে। মেয়েদের মানমর্যাদা আছে। তোরা এত পাষণ্ড যে চিৎকার করে মায়ের জাতকে ভয় দেখাতে তোদের বাধে না।

এমনিতেই তো তোদের মুখগুলো দেখলে ভয় লাগে। তারপর তোরা যখন দল বাঁধিস, অর্থাৎ কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলিস, তখন তো তোদের মুখের দিকে তাকানোই যায় না। বীভৎস, ভয়ংকর হয়ে ওঠে তোদের মুখ।

তাহলে বল, শিকদারদের ভয় পাওয়াটা দোষের হলো কি করে। তারা যদি তোদের মুখ দেখে ভয় পেয়ে বন্দুক থেকে গুলি ছুঁড়ে থাকে, আর তাতে যদি দুটো লোক মারা যায়, তবে শিকদারদের দোষটা কোথায়? তাছাড়া গুলিতে মৃত্যু হলে তো বিশেষ একটা রক্তপাত হয় না। আর তার পরেই তোরা কিনা একেবারে বর্বরের মত শিকদারদের দুইভাইকে খুন করলি। ঐ কোথাকার দুটো হাভাতে লোকের সঙ্গে শিকদারদের দুভাই-এর কোন তুলনা হয়?

সেই তোরাই এখন কিনা চারধারে চাউর করে বেড়াচ্ছিস, আমিই নাকি অবনীকে খুন করেছি। যত সব ভণ্ড মিথ্যাবাদীর দল।

তোদের বুক টনটনানি কি আমি বুঝি না বাছাধনরা। আমার সম্পত্তিটাই হলো তোদের আসল ঘায়ের জায়গা। হ্যাঁ, আমি তো বলি, বুক ফুলিয়ে বলি, আমার কিছু অল্পস্বল্প সম্পত্তি। তাতে কার কি? কার পাকা ধানে মই দিয়েছি আমি? আর যদি বেশী ফ্যাচ ফ্যাচর করিস তো না করেও বলবো, হ্যাঁ করেছি। অবনীকে আমিই খুন করেছি। এবার আয়, এসে হামলা কর আমার বাড়ীতে। দিন তো বাপু তোদের একার নয়। সে তো ঘুরে ফিরে আমারও দিন। হুঁ হুঁ বাবা, এত সোজা নয়। সব কিছু এত জলবত্তরলং নয়।

তাছাড়া এই যে রাতদিন সম্পত্তি সম্পত্তি শুনছি, কিইবা এমন সম্পত্তি।

আমি যা স্বপ্ন দেখি, এ কি তার চাইতে বেশী। হায় হায়, আমার যা স্বপ্ন আর আমার যা আছে তার মধ্যে কত ফারাক। দিন দিন এই ফারাক কমিয়ে ফেলাই আমার সাধনা। সিদ্ধিলাভের পথে কোন অন্তরায়কেই আমি সহ্য করবো না। তাতে যদি হাজার খুনের বদনাম আসে তাতে পেছপা হবো না আমি। সত্যি সত্যিই তো আর নিজের হাতে খুন করছি না আমি। খুনের বদনাম নিচ্ছি খালি।

এই যে অবনী, অবনীকে আমি খুন করেছি, কারু সাধ্য আছে আদালতে গিয়ে একথা প্রমাণ করে। জীবধর্মের নিয়মেই তো মৃত্যু হয়েছে অবনীর। ও তো এ তল্লাটের লোক সবাই দেখেছে, নিজের ঘরের দাওয়ায় মরে পড়েছিল অবনী। না, মরার মত কোন অসুখবিসুখ ছিল না অবনীর। ঐ আখুড়ে লোকগুলিই বলাবলি করছিলো, কদিন ধরে নাকি অন্ন পেটে পড়েনি অবনীর। যত সব বানানো আজগুবি কথা। কদিন না খেলেই লোক মরে বুঝি। কি সব উদ্ভট কথা। শুনে হাসবো না কাঁদবো বুঝে উঠতে পারি না।

কেন, তোরা এর মধ্যেই ভুলে গেলি, জেলের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী কতদিন না খেয়ে ছিলেন। পাক্কা চৌষট্টি দিন। কই, তিনি তো মরেন নি। আর অবনীটা! না হয় দিন কতক ভাতই পড়েনি পেটে। তাই বলে অমন পট করে মরে যাবি? মহৎ মানুষদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবার একেবারেই বাসনা নেই তোদের।

কিন্তু তা যেন হলো। না হয় তোরা পাপীতাপী লোক, পাঁচ দিন না খেলেই চোখ উলটে মরে থাকিস। মহৎ মানুষদের মত পুণ্য তো নেই শরীরে, যার জোরে অন্নকষ্ট পেরিয়ে গিয়ে বেঁচে থাকার শক্তি পাবি। আমি তো জানি, ঈর্ষা, লোভ আর হিংসার পাকা বাড়ী বানিয়েছিস নিজের নিজের ভিতরে।

শেষ দিকটায় অবশ্য কেমন হয়ে উঠেছিল অবনী। পাগলা-পাগলা ধরন। মৃত্যুর দিন চার পাঁচেক আগেও ও আমার বাড়ীতে এসেছিলো, সন্ধ্যের দিকে। আমার ছোট ছেলেটা তখন দুধ খাওয়া নিয়ে মেজাজ খারাপ করে দুধের বাটিটাই উলটে দিয়েছিলো বারান্দায়। অবনী কি রকম চোখ পাকিয়ে হাত মুঠো করে বারান্দায় ছড়িয়ে থাকা দুধের দিকে লোভী হয়ে তাকিয়ে ছিলো।

তরল দুধ ছড়িয়ে পড়ে একটা আকৃতি পেয়েছে। আকৃতিটা অনেকটা যেন, কি বলবো, ছেলেদের ভূগোল বইতে ভারতের ম্যাপ আছে না, অনেকটা সেই রকম। অন্ধকারে একদম সাদা ধবধব করছিলো। দুধটা আবার কালো গরুর দুধ কিনা, তাইতো আরো বেশী ধবধব করছিলো। সেই দিকে কাঠ হয়ে তাকিয়ে বিড়বিড় করে ঠোঁট নাড়ছিল অবনী।

আমার কি রকম গা ছমছম করে উঠলো। ডাকলাম, 'কি হলো অবনী ?'

অবনী কি রকম যেন আমার তোয়াক্কা না করে কাঠ কাঠ গলায় বললো, 'ছেলেমেয়েগুলি সব দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে! মরে যাচ্ছে সব!'

আরে রামো রামো! ভরভরন্ত গৃহস্থ বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে ভর সন্ধ্যে বেলাতে এ কি অলক্ষুণে কথা। খুব রাগ হলো আমার অবনীর উপর। কিন্তু আমার দয়ার শরীর। ঐ যে ছেলেমেয়েগুলোর কথা বললো। কেমন যেন মায়ার টান উঠলো বুকের মধ্যে। বললাম, 'ছেলেমেয়েদের একটু দুধটুধ খাওয়া অবনী, তবে তো।'

'দুধ'—এমনভাবে বললো অবনী যেন জন্মে কোনদিন দুধের নাম শোনেনি। বললাম, 'কেন, দুধ কোনদিন দেখিস নি ?'

তখনই অবনী ফস করে আমার মুখের উপর বলে ফেললো, 'না।'

শোন একবার, কি রকম ডাহা মিথ্যাবাদী। ও নাকি জন্মে কোনদিন দুধ চোখে দেখেনি। কিরকম দিনকে রাত করে ফেললো চট করে। এরাই তো দিনদুপুরে মানুষ খুন করতে পারে। আমার কেমন চড়াৎ করে রাগ চড়ে গেলো মাথার মধ্যে। বললাম—হ্যাঁ, বলেই ফেললাম, 'কেন ছেলেবেলায় মায়ের মাই খাসনি কোনদিন ?'

শুনে অবনী যা একখানা জবাব দিলো, সত্যি বলতে কি আমার মরা বাপেরও জেগে উঠবার কথা তাতে।

অবনী বললো, 'মায়ের দুধ খেলে আজ কি আপনাকে ছেড়ে দিয়ে যেতাম ?' বলেই অন্ধকারের ভিতর টুক করে কোথায় সরে পড়লো।

রাগ হলো আমার, খুবই রাগ হলো। কিন্তু বেশী রাগতে যে আবার ডাক্তারের বারণ আছে। বুঝিয়ে সুঝিয়ে মাথার আগুনটাকে ঠাণ্ডা করে ফেললাম। না, রাগবো না আমি। হাসি হাসি মুখে, হাসি হাসি মনে যেন কিছুই না এমন ভাবে সব করবো।

বোধ হয় এরই নাম কৃতঘ্নতা। তা না হলে তুই অবনী তোর জন্য কি না করেছি আমি। আর সেই তুই কিনা ফস করে আমার মুখের উপর এত বড় কথাটা বলে দিয়ে চলে গেলি। কয়েকটা মাস আগের সব কথা ভুলে গেলি তুই। সে জন্যেই কথায় বলে, গরীবকে, নাপিতকে আর সমব্যবসায়ীকে কখনো বিশ্বাস করতে নেই। আর তুই হলি সেই পহেলা নম্বরের অবিশ্বাসীদের দলের লোক। তুই হলি হদ্দমুদ্দ গরীব। সাড়ে তিন বিঘে জমি আর কোনরকম মাথা গুঁজবার একটা চালা। এই তো সম্বল তোর। প্রথমেই তোকে অবিশ্বাস করা উচিত। আর তুই যখন এসে কেঁদে কেটে পড়লি, মায়ার শরীর আমার ভাবলাম গাঁয়ে ঘরের একটা মানুষ, আমি একটা সই করে দিলে যদি দাঁড়াতে পারে দাঁড়াক।

যেখানেই থাকিস তুই, হলপ করে বল তো, ব্যাঙ্কের কাগজপত্রে আমি সই না দিলে তুই হালের গরু আর সার কেনার টাকা পেতিস? সত্যি করে বল তো আমিই তোকে পরামর্শ দিয়ে ছিলাম কিনা, 'অবনী, সাড়ে তিন বিঘেতেই তুই আলু লাগা। আমি তোকে দরকার মত পাম্পসেট দেবো জল দেবার জন্য। ঠিক ঠিক মত সার জল খাইয়ে সাড়ে তিন বিঘে থেকে যদি আলুটা তুলতে পারিস, হাসতে হাসতে জমির মর্টগেজটা ছাড়িয়ে আনতে পারবি।' তুই অবশ্য আমার পরামর্শ শুনেছিলি। আলুই লাগিয়েছিলি সাড়ে তিন বিঘেতে। মিথ্যে বলবো না, একেবারে জান লড়িয়ে দিয়েছিলি তুই। তোয়াজ করে করে মাটিকে যেন একেবারে কথা বলিয়ে ছেড়েছিলি। মনে আছে তোর, হাজার কাজের মধ্যেও আমি একবার দেখে এসেছিলাম ক্ষেতখানা। মনে আছে, 'একি করেছিস অবনী, তুই তো বি. ডি. ও. র পুরস্কার পাবি।'

লোককে ডেকে ডেকে বলেছিলাম, 'যাও হে দেখে এসোগে, আমাদের অবনী মাটিকে দিয়ে কথা বলিয়েছে! এবছর ওকে গ্রামপঞ্চায়েৎ থেকে মাটির রাজা খেতাব দেবো আমি।'

কিন্তু হায় হায়, তুই যে নিজের সর্বনাশ নিজে গড়ে রেখেছিস তা আমি জানাবো কেমন করে। একেই বলে কপাল! কপালে নেই ঘি, ঠকঠকালে হবে কি। তাহলে বল, আমি তো কোন ত্রুটি রাখিনি। সাধ্যমত করেছি আমি তোর জন্য।

আসলে তোরা হলি সেই বিষধর জাত, অন্যের গায়ে তো ছোবলাবিই, নিজের গায়েও ছোবলাবি। কবে কার কোথায় কি সর্বনাশ করে রেখেছিস, সে তোর ভালো দেখে, বাড়বাড়ন্ত দেখে সহ্য করবে কেন! দিয়েছে সুযোগ মত তোর ক্ষেতের দশা তছনছ করে। এই হয়। নিশ্চয়ই তুই কারু কোন ক্ষতি করেছিলি, নইলে সে তোর ক্ষতি করবে কেন?

আর তুই কিনা কেঁদে কেটে আছাড় খেয়ে এসে পড়লি আমার উঠোনে। সে কি একখানা মূর্তি তোর। সর্বাঙ্গে, মাথায়, মুখের ভিতরে, নাকের ফুটোয় আলু ক্ষেতের মাটি! আমি তো চিনতেই পারিনি তোকে। মুখ দিয়ে একটা গোঙানো আওয়াজ ছাড়া তুই কোন কথাই বলতে পারছিলি না। আমি তো একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়লাম। এ আবার কি! তখনো তো কিছুই জানি না বৃত্তান্ত। পরে অবশ্য সবই জানলাম। দুঃখ হলো আমার, মনটা একেবারে মুষড়ে গেলো। মনে মনে উপায় আঁটছিলাম, কেমন করে তোকে মর্টগেজ থেকে বাঁচানো যায়।

আর তুই কিনা ফস্ করে বলে ফেললি, লোকে নাকি সদা নিতাই আর ভোঁদরকে দেখেছে তোর আলু ক্ষেতে শেষ রাতে তিনখানা লাঙল চষতে! বাঃ বাঃ এই না হলে বিচ্ছু গরীবের জাত! এই না হলে বিষপাত্রের বিষ! আমি কি বোকা, আমি কি চৈতন, আমি কি বুঝি না, সদা নিতাই ভোঁদরকে বলা মানে আমাকেই বলা। ওরা তো আমার বাড়ীরই মুনিষ। ঝিকে মেরে বউকে শেখানোর কায়দা কি আমি জানি না।

শুনে যে আমার কি রাগ হলো, কি বলবো। এমন রাগ আমার জন্মেও হয়নি। শরীরের সব রক্ত উঠে গেলো মাথায়। চোখ লাল হয়ে গেলো জবাফুলের মত। দেখে তো বড়বউ ভয় পেয়ে গেলো। ঠাকুর ঘরে দরজা দিয়ে কাঁদতে লাগলো অঝোরে।

কিন্তু সে যাত্রা রাগটা মর্টগেজের উপর দিয়েই গেলো। কায়দাপত্তর করাই ছিলো, ছাড়িয়ে নিয়ে এলাম ব্যাঙ্ক থেকে। রেহাই পেয়ে গেলো অবনী।

কিন্তু আসল জায়গা থেকে রেহাই কি পেলি। বাঁচাতে পারলি নিজেকে। সেই তো মরে পড়ে থাকলি ঘরের দাওয়ায়।

আর হাড় বজ্জাত হাড়হাভাতের দল এই নিয়ে এখন গুজুর গুজুর ফুসুর

ফুসুর শুরু করেছে চারিদিকে। প্যাচ কষছে, আমাকে ফাঁসাবার প্যাচ। যা না বাবা, মুরোদ থাকে তো আইন আদালত করগে যা। সাক্ষীসবুদ খাড়া করে সব প্রমাণ কর।

বললেই হলো, আমি অবনীকে খুন করেছি।

খুন করলে শরীরে আঘাতের চিহ্ন থাকতো না, ডাক্তারী পরীক্ষায় পেটে বিষ পাওয়া যেতো না, দেহে রক্তের দাগ থাকতো না? ছিলো এসব অবনীর শরীরে? তবে?

হুঁ হুঁ বাবা, আমি নাকি অবনীকে খুন করেছি!

নির্জন মূর্ত : তদন্তকমিশন : নিয়ানডার্থাল

রিপোর্টের টাইপ করা কাগজ কখানা মিত্র সাহেবের হাত থেকে আলগোছে খসে পড়ে গেলো। ঘোর কুটিল অমাবস্যার রাতে, দুর্নাম কণ্টকিত বিপজ্জনক বনের মধ্যে নিজের শরীরে আলো ফেলে যদি হঠাৎ দেখা যায় শরীরে বস্ত্রের পরিবর্তে ইয়া বড় বড় লোম, নখগুলি সব আধ হাত করে লম্বা এবং ডান হাতে ধরা একটা বাইসনের কাঁচা ঠ্যাং, তবে বিস্ময়ের যে প্রবল আঘাত অনুভূতিকে শূন্য ডিগ্রি হিমাঙ্কের অনেক অনেক নীচে নামিয়ে দেয়, অবিকল সেইরকম অনুভূতিতে মিত্র সাহেব তার সোফার উপর নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন।

চক্রবর্তী কোন ভুলভ্রান্তি ঘটিয়ে ফেলেনি তো! কিন্তু একদা দুঁদে প্রশাসনিক আই. সি. এস. অফিসার বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত বয়স্ক অভিজ্ঞতার জনক চক্রবর্তী তো ভুল করবার লোক নন। যদিও এই রিপোর্টের আদ্যোপান্ত ঘটনা পূর্বাহ্ণে জানাটাই তার স্বাভাবিক ছিলো। কারণ, 'মিত্র-চক্রবর্তী তদন্ত কমিশনের' তিনি দ্বিতীয় সদস্য। অথচ তদন্ত চলাকালীন সময়টাতে এখানে থেকে কাজকর্ম দেখা তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হয়নি। কতিপয় পারিবারিক ঘটনাজনিত কারণে তার হৃদযন্ত্রের উপর যে চাপ সৃষ্টি হয়, তা অপসারিত করবার জন্য ডাক্তারের নির্দেশে এই সময়টা তাকে সমতল-ভূমি থেকে কিছু উঁচু এবং ঠাণ্ডা জায়গায় কাটিয়ে আসতে হয়েছে। যদিও ব্যাপারটা গোপন, এবং তার ও চক্রবর্তীর হৃদ্যতাপূর্ণ বোঝাপড়ার ফল। সুতরাং তদন্তের সমস্ত কাজটাই চক্রবর্তীকে একা দেখতে হয়েছে। অবশ্য শত হাতের সাহায্য পেয়েছে চক্রবর্তী। তথ্য তালাস করে তারই মালমশলা এনে দিয়েছে হাতের কাছে। কিন্তু সমস্ত কিছুর মধ্য থেকে যোদ্ধা বিষয়টাকে ছেঁকে তোলা তো কম পরিশ্রমের কাজ নয়। আর সেইটেই হচ্ছে প্রধান কাজ।

কিন্তু এ কি অলৌকিক এক রোমাঞ্চকর রিপোর্ট পড়ে শেষ করলেন তিনি। বিচারক জীবনে অনেক বীভৎস, কুটিল, হিংস্র, অবিশ্বাস্য সব ঘটনা এবং চরিত্রের মুখোমুখি হয়েছেন তিনি, কিন্তু 'মিত্র চক্রবর্তী তদন্ত কমিশনের' বিস্ময়কর রিপোর্টের কাছে সেগুলি কত ম্রিয়মান, ধূসর এবং পরাজিত।

আর এও কি সম্ভব!

আবিষ্কারের গৌরবে উজ্জ্বল এবং আবিষ্কৃত বিষয়ের বিস্ময়কর জটিলতায় উদ্‌ভ্রান্ত চক্রবর্তী পাশেই একটি সোফার উপর বসে, ব্রাউন রঙের পাইপটাকে দাঁতে চেপে কমিশনের দ্বিতীয় সদস্য মিত্রের রিপোর্ট পড়াটা মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ করছিলেন। এখন তার হাত থেকে কাগজ খসে পড়ে যেতে দেখে মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে সেখানে অগ্নিসংযোগ করে নিলেন।

: স্ট্রেঞ্জ, মোস্ট্ স্ট্রেঞ্জ!

আদিম অন্ধকারে অবস্থানরত মিত্রের বরফের মত নিরালোক চোখের উপর সুদূর একলক্ষ বছরের ওপার থেকে তিনটি আলোক বিন্দুর অনুরূপ চক্রবর্তীর তিনটি শব্দ যেন চরাচরের ডানায় ভর করে উড়ে এসে পড়লো, স্ট্রেঞ্জ, মোস্ট্ স্ট্রেঞ্জ!

মিত্র সাহেবের মগ্নকণ্ঠ প্রতিধ্বনি : স্ট্রেঞ্জ, মোস্ট্ স্ট্রেঞ্জ!

চক্রবর্তী ডান হাতের পাইপ বাঁ হাতে বদল করে যথেষ্ট উত্তেজিত গলায় বললেন : য়ু জাস্ট্ থিঙ্ক্ মিত্র, নৃতত্ত্বের জগৎকে একটা নবতর বৈপ্লবিক পরিবর্তনের দিকে মোড় ঘুরিয়ে দেবার মত আবিষ্কার এটা। অথচ আমরা কেউ নৃতত্ত্ববিদ নই।

: কিন্তু—!

বোবা চৈতন্যকে এখনো সম্যক স্ববশে আনতে পারেননি মিত্রসাহেব। চক্রবর্তী অস্থির গলায় বললেন : না না, আজ আর কিন্তু নয় মিত্র! জগতের টপ এন্‌থ্রপলজিস্টদের সঙ্গে মিত্র-চক্রবর্তীর নাম যুক্ত হয়ে গেলো। অথচ আমরা কেউ নৃতত্ত্ববিদ নই।

যে কোন বক্তব্যের শেষে ধুয়ার মত কথাটা আবার ব্যক্ত করছেন চক্রবর্তী। সম্ভবত এর দ্বারা তিনি বোঝাতে চান, তার কিংবা তাদের মত লোকেরা ইচ্ছে করলে যে কোন বিষয়ে কীর্তির অনন্ত সাক্ষ্য রাখতে পারেন। তা না হলে কার চিন্তা এ-কথা কল্পনা করতে পেরেছিলো, মিত্র চক্রবর্তী তদন্ত

কমিশন সামান্য একটা ঘটনাকে অবলম্বন করে এত বড একটা অসামান্য আবিষ্কারে সক্ষম হবে ?

চক্রবর্তী আবার উত্তপ্ত গলায় বললেন : তুমি বুঝতে পারছো মিত্র, শুধু নৃতত্ত্ববিদরাই নয়, আমাদের দেশের সংকটময় প্রশাসনিক ব্যবস্থাকেও একটা ভিন্নতর পথনির্দেশের ইঙ্গিত দেবে আমাদের এই আবিষ্কার।

: তার মানে !

অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মিত্র সাহেব এখনো অকূল পাথারে হাবুডুবু খাচ্ছেন। সমস্ত ব্যাপারটাই তাঁর পক্ষে এত আকস্মিক যে তিনি কিছুতেই বিস্ময়ের প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারছেন না।

চক্রবর্তী এবার উচ্ছ্বসিত গলায় বললেন : এই সমীক্ষণ এবং আবিষ্কার জনসাধারণের সঙ্গে আমাদের প্রশাসনের সম্পর্ককে আরো বিজ্ঞানভিত্তিক করে তুলবে। তুমি কি বুঝতে পারছো না, যে এ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে—

: বুঝেছি, বুঝেছি !

মিত্র সাহেব কথার মাঝখানে হা হা করে উঠলেন, তার মাথার জটিল অন্ধকারে আলোকতরঙ্গের মত সমস্ত ব্যাপারটা চকিতে খেলে গেলো। আবেগের আঘাতে ছিটকে এসে তিনি হাত দুটো জড়িয়ে ধরলেন চক্রবর্তীর।

: হোয়াট য়ু হ্যাভ ডান চক্রবর্তী, হোয়াট য়ু হ্যাভ ডান ! এ্যাঁ, এ গ্রেট ইনভেনশন ! একটি মহৎ আবিষ্কার !

চক্রবর্তী পাইপ দাঁতে চেপে পা নাচাতে নাচাতে মৃদু মৃদু হাসছিলেন।

: দেন, সরকারের কাছে রিপোর্টটা আমরা কবে সাবমিট করছি ?

চক্রবর্তী মৃদু চাপা গলায় বললেন : আগামী কাল।

আগামী কাল 'মিত্র চক্রবর্তী তদন্ত কমিশনের' রিপোর্ট সরকারের হাতে পৌঁছে যাওয়া মাত্র একটি মহৎ আবিষ্কারের আনন্দস্রোত বইতে থাকবে। কপালের ঘাম মুছে ফেলে নৃতত্ত্ববিদরা আবার নতুন করে চিন্তা করতে বসবেন, আদিম কাল থেকে এই বর্তমান দশক অবধি প্রসারিত যে মানবজাতি তার মধ্যে কি করে এই অলৌকিক রহস্যটা এতদিন ধরে চাপা পড়ে ছিলো। সুতরাং তাদের অনুসন্ধানের গাঁইতি চলবে যাদুঘরে, প্রাচীন পুঁথির বিবর্ণতায়, পৃথিবীর মরা অতীতের বিমর্ষ ঘুমে।

এদিকে সরকারের বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে খুলে যাবে প্রশাসনিক

ব্যবস্থার নবতর দরোজা। যার ফলে প্রশাসন ব্যবস্থার সঙ্গে জনসাধারণের সম্পর্ক হবে আরো বিজ্ঞানভিত্তিক।

আসলে এই সমস্ত ব্যাপারের কেন্দ্রে যে মানুষটি স্থাপিত তার নাম নিজন মূর্মূ। নিজন মুর্মু এই আবিষ্কারের র মেটেরিআল। সম্ভবত লোকটি জন্মেছিলো ধলভূম মানভূমের অরণ্য পাহাড় পরিবৃত কোন সাঁওতাল গোষ্ঠীর অন্ধবিশ্বাসের অন্ধকার ঘেরা পরিবারে। সম্ভবত এই জন্য যে, তদন্ত কমিশন এ ব্যাপারে স্থির নিশ্চিত হতে পারেননি। এটা তাদের আগের কতকগুলি সিদ্ধান্তের উপর দাঁড়িয়ে অনুমান। যার এ-কথা সুপরিচিত, এই সমস্ত ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত অনুমান আর অনুমান থাকে না, সিদ্ধান্তের দলে ভিড়ে যায়। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে নিজন মুর্মুর আদি বাস-ভূমি মানভূমের অরণ্য পাহাড়ের কোল ঘেঁষা।

চক্রবর্তী সাহেব অবশ্য গোড়াতে নিজন মুর্মুর ডাক্তারি রিপোর্টের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছিলেন। কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে, এই পদ্ধতিতে চালিয়ে গেলে বর্তমান আবিষ্কারের কাছাকাছি আসা যেতো না। যদিও ডাক্তারি রিপোর্টটা এই তদন্তের একটা প্রয়োজনীয় অংশ। চক্রবর্তী সাহেবের ছোট জামাই-ই তাকে পদ্ধতির ত্রুটি থেকে সরিয়ে এনে তদন্তের প্রকৃত পথ ধরিয়ে দিয়েছেন। ইউরোপের কোন একটা নামজাদা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নৃতত্ত্বের উপর থিসিস্ লিখে ডিগ্রি ঘরে এনেছেন ছোট জামাই। ডাক্তারি রিপোর্ট পড়ে সে প্রথম সন্দেহ করে, একটা বড় রকমের বিস্ময়কর কিছু এর মধ্যে আত্মগোপন করে আছে। এবং নিজেও খুব আগ্রহ নিয়ে তদন্তকাজে জড়িয়ে পড়ে। ফলত চক্রবর্তী সাহেবও কিছুটা হাফ ছেড়ে বাঁচেন। এর জন্যই তিনি কমিশনের দ্বিতীয় সদস্য মিত্র সাহেবকে হৃদযন্ত্রের ভার লাঘবের জন্য দার্জিলিং-এ ছেড়ে দিতে পারেন।

তারপর থেকে প্রকৃতপক্ষে সমস্ত দায়িত্বটাই কাঁধে তুলে নেয় ছোট জামাই ডঃ নিরাকার ভট্টাচার্য। গোড়াতেই ডঃ ভট্টাচার্য ঠিক করে নেন, নিজন মুর্মুর আনুপূর্বিক ইতিহাস তার সবপ্রথম জানা দরকার। নিজন মুর্মু যা হয়েছে এবং নিজন মুর্মু যা ছিলো এই দুটোকে এক জায়গায় আনতে পারলেই তো রহস্য তার জটিল জটা খুলে দেবে। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনা এবং চরিত্র বিচারই তো সর্বাপেক্ষা আধুনিক এবং বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি।

সুতরাং অবিলম্বে তিনি তার এদেশীয় একটি প্রিয় ছাত্রকে ডেকে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে দিলেন: কোন কিছু বাদ না দিয়ে নিজন মূর্মুর আনুপূর্বিক ইতিহাস যত তাড়াতাড়ি পারো তুমি আমাকে নোট করে এনে দাও।

এই সময় ডক্টর ভট্টাচার্য তার 'ভারতের আদিবাসীদের ধর্মবিশ্বাস' নামক প্রখ্যাত গ্রন্থখানা রচনা করছিলেন। প্রিয় ছাত্র কমলেশের উপর কাজের দায়িত্বটা ছেড়ে দিয়ে তিনি অনেকখানি নিশ্বাস ফেলবার সময় পেলেন।

খাতা পেন্সিল হাতে কমলেশ পুলিশ হাসপাতালে মুমূর্ষু নিজন মূর্মুর সঙ্গে দেখা করলো। গলায় বুকে ব্যাণ্ডেজ জড়িয়ে মূর্মু অদ্ভুত বড় বড় চোখ মেলে অপলক ভাবে ছাদের একখানি মাত্র কড়িকাঠের দিকে তাকিয়েছিলো।

সেই চোখের দিকে তাকিয়ে কমলেশের গা ছমছম করে উঠলো। সে কিছুক্ষণ বসে নিজন মূর্মুকে লক্ষ করতে লাগলো। ঘন কৃষ্ণ গায়ের ত্বক, কাঠি কাঠি হাত-পা, চোয়াল ভাঙা লম্বাটে ধরনের মুখ, ঝুলে পড়া লম্বাটে মুখের উপর আড়াআড়ি ভাবে বসানো নারকেলের মত মাথার খুলি, মাথায় খাড়া খাড়া শক্ত চুল, পাগলের মত উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। দেখা শেষ হয়ে গেলে এই সমস্তটাই কমলেশ খাতায় নোট করে নিলো।

তারপর মূর্মুর শায়িত শরীরের দিকে সামান্য ঝুঁকে বললো: তোমার সঙ্গে আমি কয়েকটা কাজের কথা বলতে চাই মূর্মু।

একটি মাত্র কড়িকাঠের অভ্রান্ত লক্ষ্য থেকে মূর্মু একবারের জন্যও পলক ফেললো না। হাসপাতালের লোকেরা জানালো: সে দিনের সেই ঘটনার পর থেকে লোকটা একবারের জন্যও মুখ খোলেনি। হয় লোকটা স্বকৃত অনুতাপের আঘাতে কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে, আর তা না হলে ব্যাপারটা ইচ্ছাকৃত।

সে যাই হোক, কমলেশ বুঝতে পারলো, এখান থেকে তার আর কিছু জানা সম্ভব হবে না। অথচ একমাত্র নিজন মূর্মুর শারীরিক বর্ণনা ছাড়া তার খাতায় আর একটি কালির আঁচড় পড়েনি। সুতরাং, এখন কি করা যায়, শুধু এই চিন্তাই কমলেশকে আচ্ছন্ন করে থাকলো, অবশেষে নিজন মূর্মুর ঠিকানা জোগাড় করে তার পাড়া প্রতিবেশীর কাছে খোঁজ নেবার

সিদ্ধান্ত করলো কমলেশ। কারণ, এ-ছাড়া তার সামনে আর অন্য কোন পথ খোলা ছিলো না।

পুলিশের খাতা থেকে ঠিকানা জোগাড় করে কমলেশ খিদিরপুর এলাকার একটা নোংরা এঁদো বস্তিতে এসে হাজির হলো। কাঁচা নর্দমার পেট গুলিয়ে ওঠা গন্ধ, চতুর্দিকে ছড়ানো শিশুদের প্রাকৃত ক্রিয়াকর্ম এবং বিচিত্র ধরনের হৈ হুল্লোড় পার হয়ে কমলেশ পুলিশের দেওয়া ঠিকানা অনুসারে নিজন মুর্মুর ঘরের দুয়ারে ঘা দিলো। প্রকৃতপক্ষে ঘা দেবার মত দরোজা অবশ্য সেই খাপরীর ঘরখানায় ছিলো না। ফুটি-ফাটা একটা ছেঁড়া চটের পর্দা ঝুলছিলো আব্রুর অনুসরণে। সেটাকেই সামান্য নেড়ে গলা খাঁকারি দিলো কমলেশ। চকিতে তিনটি মুখ ভেসে উঠলো চটের পর্দার ফাঁক দিয়ে। তিনটি যুবতী রমণীর মুখ।

কমলেশ বিস্মিত অবস্থা সামলে নিয়ে কিছু বলবার উদ্যোগ করতেই ভিতর থেকে একটা বাজখাঁই গলার ধমক ভেসে এলো। চকিতে তিনটি মুখ ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

: কোন শকুনের বাচ্চা আবার—, বলতে বলতে একটি লোক বাইরে এসে কমলেশকে দেখে হঠাৎ থেমে পুনরায় রক্তচোখ মেলে বললো : কি, ভদ্রপাড়ায় মাইয়ালোকের আকাল পড়ছে বুঝি ?

কাঁচাপাকা চুল, শীর্ণ শরীর, রক্তচোখ, প্রায় প্রৌঢ় লোকটার এতাদৃশ আবির্ভাবে এবং কথায় ভয়ানক ঘাবড়ে গেলো কমলেশ। আমতা আমতা করে বললো : এখানে—ইয়ে—একটা তদন্তের ব্যাপারে—

লোকটি আবার হুংকার দিয়ে উঠলো : যুবতী মাইয়া ছাখোন মাত্রই বুঝি তদন্ত করোনের অভিলাষ হয়, না ?

সমূহ বিপদের আশংকায় সাহস সঞ্চয় করে কমলেশ বললো : এখানে নিজন মুর্মু বলে একটা লোক—

দম নেবার জন্য একটু থামলো কমলেশ। আর নিজন মুর্মু নামটা শোনা মাত্রই লোকটির চেহারার মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘনিয়ে এলো। তার দলা পাকানো ভুরুর নীচে রক্তচোখ দুটি ছোট হয়ে গেলো। তারপর যেন আত্মগত ভাবেই বললে : হ, নিজন মুর্মু ! শালা সাঁওতালের বাচ্চার বুকের পাটা আছে। মরদ !

এবং কমলেশের দিকে ফিরে বললো : বর্তমানে আমি নিজন মূর্মুর ঘরখানাই ভাড়া লইছি। আমার নাম গোপালদাস মল্লিক। নিবাস আছিলো পূর্ববঙ্গে।

গোপালদাস মল্লিক কিংবা তার নিবাসে কমলেশের কোন প্রয়োজন ছিলো না। সে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললো : আপনি নিজন মূর্মু সম্পর্কে কিছু জানেন ?

: হ, শুনছি। বেশ উৎসাহ পাওনের মতন ঘটনা।

তারপর একটা অকেজো টিউবয়েলের বাঁধানো জায়গার দিকে আঙুল নির্দেশ করে বললো : ঐ পাষাণের উপর আছড়াইয়া মূর্মু তার চাইরটি সন্তানকে হত্যা করছিলো, আর গলা টিইপ্যা স্ত্রীকে। অবশেষে নিজের গলায় বুকে টাঙ্গি চালাইয়া —কিন্তু কই, প্রাণ রক্ষা তো করতে পারলো না। মুক্তি হইলো না অর !

জানা ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে বিরক্তবোধ করছিলো কমলেশ। কেমন করে নিজন মূর্মু তার স্ত্রী-পুত্রকন্যাদের হত্যা করে সে খবর তো কমলেশ কাগজে এবং বিধান সভায় বিরোধীপক্ষের তুমুল চিৎকারের মাধ্যমে তদন্ত কমিশনের দাবী তোলার কালেই জানতে পেরেছে। এখন সে সরকারী তদন্ত কমিশনের বেসরকারী লোক। নিজন মূর্মুর যে ঘটনাটুকু জানা সেটা তো জানাই। অজানার অন্ধকারে যে নিজন মূর্মু তাকেই জানতে চায় কমলেশ।

সুতরাং কমলেশ প্রশ্ন করলো : এমন ভয়ানক কাজ নিজন মূর্মু কেন করলো, আপনি তার কিছু জানেন ?

: না জানলেও অনুমান করতে পারি।

: কি রকম ?

কমলেশ গোপাল দাসের কথাগুলি উৎসাহভরে শুনেও কোন উপকরণ পেল না। সেখান থেকে বিদায় নিয়ে বস্তির অন্য একটি ঘরের সামনে উপস্থিত হল। সেটি কাঙ্গালীচরণের ঘর। কমলেশ আগেই শুনেছিলো তার মদের গোপন ব্যবসা আছে। ঘরের সামনেই তাকে পেয়ে কমলেশ প্রশ্ন করা শুরু করলো।

কাঙ্গালীচরণ ততোধিক জোরে চিৎকার করে বললো : কোন্ শুয়ারের বাচ্চা বলেছে আমার মদের দোকান আছে !

কমলেশ ঘাবড়ে গিয়ে বললো : না, মানে—ইয়ে—

: সাঁওতালের বাচ্চার অতো যে খোঁজ খবর করছেন, ছাড়ুন দোষ মশাই সাড়ে সাতটা টাকা।

কাঙ্গালীচরণ তার দক্ষিণ হাত কমলেশের দিকে প্রসারিত করে দিলো।

দু'পা পিছিয়ে এসে কমলেশ বিব্রত ভাবে বললো : না, মানে—আমি তো তদন্ত কমিশনের লোক।

: সেটা আবার কি মশাই ?

: নিজন মুর্ম‍ু কেন তার ছেলে মেয়ে বউকে হত্যা করে নিজে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলো, তার সঠিক কারণ কি ? দোষটা কি নিজন মুর্মুর নিজের না সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে কোন গলদ ঢোকার ফলে—

কমলেশকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে অধৈর্য গলায় কাঙ্গালীচরণ বললো : থাক, থাক মশাই, বুঝেছি। ধান ভানতে শিবের গীত না গেয়ে সোজা কথাটা খুলে বললেই পারতেন। সে তো আমরা সবাই জানি। এই বস্তির সবাই।

কমলেশ খুব আগ্রহান্বিত হলো : কি জানেন ?

: কি আবার, পেটের জ্বালা !

কথাটা ছুঁড়ে মেরে পুনরায় নির্লিপ্ত ভাবে দাতন করতে লাগলো কাঙ্গালীচরণ। কমলেশ একটু ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেলো।

একদলা থুথু ছিটিয়ে কাঙ্গালীচরণ রাগতস্বরে বললো : যান মশাই, আমার কথা বিশ্বাস না হয় কসবার গ্রাস ফ্যাকটারীতে মঙ্গল কিস্কু আছে, তাকে শুধোন !

: মঙ্গল কিস্কু কে ?

অন্ধকারে আলোর মত নামটা আঁকড়ে ধরতে চাইলো কমলেশ।

: মুর্মুর দোস্ত—দোস্ত মশাই। পেয়ারের লোক।

কাঙ্গালীচরণের কাছ থেকে সরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো কমলেশ। লোকটা কি অসম্ভব রকম অসংস্কৃত। কমলেশ নোট নিলো, মর্ম সম্পর্কে একজন মণ্ডপের বক্তব্য।

মঙ্গল কিস্কুর বিবৃতি :

কিছু সময় ভেবে কমলেশ প্রশ্নগুলিকে নিজের মাথার মধ্যে পরস্পর সাজিয়ে

নিলো। তারপর গলার স্বর যথাসম্ভব মর্যাদাভাবাপন্ন করে জিজ্ঞাসা করলো : মুর্মু'র সঙ্গে তোমার কতদিনের আলাপ ?

বাংলা ভাষার সঙ্গে মোটামুটি একটা ভাঙ্গা পরিচয় থাকাতে প্রশ্নোত্তরে মঙ্গল কিসকুকে বিশেষ একটা অসুবিধায় পড়তে হলো না। সে কিছু সময় তার লালচে চুলের জঙ্গলে আঙ্গুল ফিরিয়ে বললো : কম সে কম সাত বরষ।

: কোথায় চেনাজানা হলো তোমাদের ?

: মেঘ্‌লীবন চা বাগানে বাবু ?

: সেটা আবার কোথায় ?

: আসাম। ভূটান সীমানা বরাবোর। জায়গাটা বড় ভালো ছিলো বাবু। শাল মিট্টির উঁচ-নীচা কাচা সড়ক, টিলা-পাহাড়, একদম—

বলতে বলতে থেমে গেলো মঙ্গল কিস্‌কু। সম্ভবত সেই উচ্চাবচ ভূপ্রকৃতি চা বাগানের একটানা সবুজ স্রোত, চতুষ্পার্শ্বের মোহময় অরণ্য সম্পদ তার চোখের পর্দায় প্রতিফলিত হয়ে মনের কোথাও একটি নির্দিষ্ট জায়গা নিয়ে রেখেছিলো, যা তার এই শহরবাসের জীবনে কখনো সখনো বেড়াতে যাবার স্থান। সে যাই হোক, কমলেশ মঙ্গল কিস্‌কুর এমত কথাবার্তাকে বিশেষ মূল্য দিতে চাইলো না। তার স্থান মাহাত্ম্য কীর্তনকেও আমল দিলো না কমলেশ। সে প্রশ্ন করলো : সেখানে মুর্মু'র সঙ্গে কি ভাবে আলাপ হলো তোমার ?

: একসঙ্গে কাজ করতাম বাবু আমরা। চা বাগানে।

: কি কাজ ?

: বাগানে চা পাতি তোলার কাজ বাবু। কপালে লম্বা বাঁশের ঝুড়ি ঝুলিয়ে দিনভর পাতি তুলতাম আমরা। সন্‌ঝে বেলা ওজনঘরে ওজন করিয়ে, পাতিঘরে সব জমা দিয়ে তবে আমাদের ছুটি মিলতো।

: সেখানকার কাজ ছেড়ে দিলে কেন তোমরা ?

: ছাড়িয়ে দিলো বাবু। হটাবাহার করে দিলো।

: হটাবাহার আবার কি ?

এখানে এসে মঙ্গল কিস্‌কু অল্প হাসলো। তার ভাঙ্গা রুক্ষ মুখের উপর হাসিটা যে সঠিক কি মানে করলো, কমলেশ তা বুঝতে পারলো না। হতে পারে কমলেশের অজ্ঞতাকে লুকিয়ে ঠাট্টা করতে চাইলো কিস্‌কু, কিংবা এ তার অন্তরে বহন করা হটাবাহার দিনের আত্মলাঞ্ছনার পরিহাস পরিচয়।

কিস্‌কু বললো : ডাকু খুনে বদমাস আদমিকে পুলিশ যেমন এলাকা ঠিক করে দিয়ে বলে, এর অন্দরে ঢুকলে তোমার সাজা হবে। হটাবাহার ভি ঐ চিজ আছে।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কমলেশ মাথা নাড়লো। তারপর একটু সময় ভেবে বললো : হটাবাহার করলো কেন তোমাদের ?

: মুর্মু একটা বাঘ মেরেছিলো বাবু।

: শুধু এই জন্য ?

: আর মুন্নহাকে বিহা করেছিলো।

: কি রকম ?

নিজের মনে মনে প্রশ্নগুলিকে যেভাবে সাজিয়ে নিয়ে মঙ্গল কিস্‌কুর বিবৃতিটা নিজের মত করে গুছিয়ে নিতে চাইছিলো কমলেশ তা এখানটায় এসে কি রকম গুলিয়ে গেলো, বাঘ এবং রমণীর উল্লেখে কমলেশ এখন ঘটনাটার উপর বাঘের মতই আগ্রহ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলো।

তারপর কমলেশের আগ্রহের জবাবে কিস্‌কু যে কাহিনী বিবৃত করলো তার সংক্ষিপ্ত চেহারা নিম্নরূপ :

তারা প্রায় জনাচল্লিশেক মেয়েপুরুষ মিলে বাগানে পাতি তুলছিলো। সূর্য পশ্চিম পাহাড়ের দিকে কাত্‌ হয়ে পড়াতে আলো কমে এসেছিলো চারদিকে। সাধারণত একটু দুর্গম এলাকার বাগানগুলিতে পাতি তোলার সময় কোম্পানীর তরফ থেকে সবন্দুক সেপাই থাকে সঙ্গে। সেদিন সেরকম কিছু তাদের সঙ্গে ছিলো না। আর বাঘটা যেন এমনি একটা সুযোগের অপেক্ষাই করছিলো। অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো কুলিকামিনদের ওপরে। চিৎকার, আর্তনাদ, পলায়নের মুহূর্তে একটা দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড শুরু হয়ে গেলো। বাঘটা যে কামিনটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘাড় মটকে দিয়েছিলো, মুর্মু ছিলো তার পাশেই। ভালোমন্দ কিছু চিন্তা না করেই মুর্মু মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো বাঘের উপর। তারপর সেই ঘন চা বাগানের ভিতর খানিকক্ষণ যে বাঘে মানুষে কি হলো তার প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে কেউ তখন সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলো না।

ঘন্টাখানেক পড়ে মশাল জেলে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করে লোকজন

এসে মুর্মুকে এবং বাঘটাকে জড়াজড়ি করা অবস্থায় আবিষ্কার করলো। কিন্তু না কেটে বাঘের গলা থেকে মুর্মুর দাঁত কিছুতেই ছাড়ানো গেলো না। বাঘের কণ্ঠনালীটাকে সম্পূর্ণ ছিন্ন করে ফেলেছিলো মুর্মু। তারপর ভীষণ আহত মুর্মুকে দুমাস সদর হাসপাতালে কাটাতে হয়েছে। সাতদিন চোয়ালই নাড়াতে পারেনি মুর্মু। আর তিনটি দাঁত পড়ে গিয়েছিলো তার। এই ঘটনার পরেই কুলিকামিনদের মধ্যে বোঙ্গা দেবতার মত জনপ্রিয় হয়ে গেলো মুর্মু।

এবং কিছুদিন পরেই ঘটলো পরবর্তী ঘটনাটি। রাতের অন্ধকারে গাড়ি চাপিয়ে একটা আড়কাঠি মুন্নহাকে নিয়ে যাচ্ছিলো সাহেবের বাংলোয়। খবর পেয়ে কিস্কুকে সঙ্গে নিয়ে নিজন মুর্মু ছুটে গেলো সেখানে।

গল্পের এই অবধি এসে কিঞ্চিৎ আত্মবিস্মৃত কমলেশ প্রশ্ন করলো: কেন, মুন্নহার সঙ্গে আগে থেকে কিছু হয়ে ছিলো নাকি মুর্মুর?

কিস্কু আবার হাসলো। চুপ করে একটু কি ভাবলো। হতে পারে নিজন-মুন্নহার যুগল সম্মিলনের দিনটির কথা। ঢোলডগরের ঘায়ে উদ্বেলিত ভুটান সীমানা বরাবর মেঘ্‌লীবন চা বাগানের কথা। অথবা এ-হাসি মুর্মুর পারিবারিক সর্বনাশা ধ্বংসের জন্য হৃদয় বিদারণের একটু রকমফের মাত্র।

কিস্কু বললো: না বাবু, সেরকম কিছু নয়।

: তবে?

সকলের তো ইজ্জৎ আছে বাবু। মুর্মু ভাবতো, ম্যানেজার সাহেবের বউয়ের ইজ্জৎ আর ধলিয়া বুড়ার বউয়ের ইজ্জতে কোন ফারাক নাই। তাই রাতের অন্ধকারে হামা দিয়ে মুন্নহাকে নিজন আর আমি ছিনিয়ে আনলাম বাবু। কিন্তু আপনার কাছে ঝুটা বাত বলবো না বাবু, কোন খুন জখম হয় নাই!

কমলেশ বললো: তারপর?

: হটাবাহার করে দিলো আমাদের।

মঙ্গল কিস্কু থামলো। তার বুকের মধ্যে যেন ঢোলডগরের ধ্বনিলহরি জেগে উঠেছে। ডিমা ডিমা ডিমা ডিমা ডিম্‌......হটাবাহার হটাবাহার...... ডিমা ডিমা ডিমা......নিজন মুর্মু হটাবাহার......ডিমা ডিমা ডিম্‌...... মঙ্গল কিস্কু হটাবাহার......ডিমা ডিমা ডিমা ডিম্‌......চা বাগান থেকে চা বাগানে......আসামের সমস্ত চা বাগানে ঢোলডগরের ঘায়ে হটাবাহাদের নাম পৌঁছে গেলো।

কমলেশ প্রশ্ন করলো : আর মুন্নহা ?

: বিহা করলো মুর্মুকে। মুন্নহা বললো, তুই আমার মরদ। বাঘ মারা মরদ—বলতে বলতে কি রকম একটা পরিবর্তন ঘনিয়ে এলো কিস্কুর চোখে মুখে। যেন তার চুলের অরণ্য থেকে দুর্বোধ্য হিংস্র নেশা চোখমুখের উপর এসে গড়িয়ে পড়লো। সে আপন মনে, কমলেশকে উপেক্ষা করেই বিরবির করে বললো : হাঁ, মরদ······মরদ না ভেরুয়া !

কিস্কুর এই পরিবর্তন আকস্মিকভাবে কমলেশের সম্বিত ফিরিয়ে দিলো। সে একটি কাহিনীর ধারাবাহিকতা থেকে সরে এসে তার কাটা কাটা প্রশ্নোত্তরের কর্মপ্রণালীতে দাঁড়ালো। কমলেশ বললো : কেন, ভেরুয়া কেন ?

: না হলে নিজের ছেলে মেয়ে বউকে কেউ মারে বাবু ?

: কেন মারলো তার আসল কারণটা তুমি জানো কি ?—কমলেশ এতক্ষণে তার মূল্যবান জিজ্ঞাসাটি রাখলো।

ছাড়া ছাড়া বিষাদময় গলায় কিস্কু বললো : ধানবাদ কোলিয়ারী থেকে নোকরি চলে গেলো বাবু, তারপর আমার কাছে এলো। ইখানে বাবু কাজ নাই, তাই ভাতও নাই। তাই—

মঙ্গল কিস্কু থামতেই কমলেশ জিজ্ঞাসা করলো : ধানবাদের সেই কোলিয়ারীর নাম কি ?

: পাশাপাকুড়িয়া।

মাথা নীচু করে চুলের অরণ্যে আঙুল গুঁজলো মঙ্গল কিস্কু।

ডাঃ ভট্টাচার্য একটা কুশনে আরাম করে বসে নিজন মুর্মু সম্পর্কিত কমলেশের নোটগুলির উপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলেন। কমলেশ ঘরের চারদিকটা তাকিয়ে তাকিয়ে অবাক চোখে দেখছিলো। কারণ ইতিপূর্বে তার ডাঃ ভট্টাচার্যের নিজস্ব স্টাডিরুমে ঢুকবার দুর্লভ সৌভাগ্য হয়নি।

দেওয়ালের তিনদিক ঘুরিয়ে ঝকঝকে আলমারীতে ঝকঝকে বই। ছোট বড় মাঝারী নানারকম স্ট্যাণ্ডে নৃতত্ত্ব বিষয়ক নানা নমুনা। সংগ্রহের বৈচিত্র্য, কম্পোজিশানের শিল্পীসুলভ কৌশল কমলেশকে এমন একটি মুগ্ধ শ্রদ্ধায় বিনীত করে দিচ্ছিলো, যা তার পূর্বেকার যাবতীয় মুগ্ধতার সমষ্টিগত

যোগফল। এমন একজন মানুষের সান্নিধ্য ইত্যাদি ইত্যাদি চিন্তাগুলি যখন কমলেশকে যথেষ্ট দ্রব করে আনছিলো, ঠিক তখনই মুখে একপ্রকার অস্ফুট শব্দ করে ডাঃ ভট্টাচার্য বেশ উত্তেজিতভাবে পার্শ্ববর্তী ফোনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। হঠাৎ করে কমলেশের মনে হলো, মেঘলী চা বাগানে আক্রমণকারী বাঘের উপর নিজন মুর্মু সম্ভবত অনুরূপভাবেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, এ-রকম একটা লজ্জাজনক উপমার জন্য নিজেকে মনে মনে তিরস্কার করলো কমলেশ।

ইতিমধ্যে ডাঃ ভট্টাচার্য ফোনে যোগাযোগ করে ফেলেছেন। কমলেশ স্পষ্ট দেখলো, ডাঃ ভট্টাচার্যের ফোনশুদ্ধ হাতটা অল্প অল্প কাঁপছে। চোখের দৃষ্টি উত্তেজনায় উজ্জ্বল এবং বেশ বিস্ফারিত। নিজন মুর্মু সম্পর্কিত নোটের পাতা উলটাতে উলটাতেই কি ডাঃ ভট্টাচার্য অত উত্তেজিত হয়ে পড়লেন! কিন্তু তার নোটে তো সাদামাটা কিছু বিবরণ ছাড়া উত্তেজক কিছু আছে বলে মনে হয় না। কমলেশ ফোনের কথাবার্তার প্রতি মনোযোগ দিলো।

: নো নো, তোমাকে নয়, ফোনটা শ্বশুরমশাইকে দাও।

:...... !

: নো জোকিং প্লিজ, ব্যাপারটা সিরিয়াস্।

: ...... ।

: হ্যালো!

: ।

: হ্যাঁ আমি নিরাকার বলছি।

: ।

: দেখুন, আমি যা কন্‌সিভ্ করেছিলাম, সেন্ট পার্সেন্ট মিলে যাচ্ছে। একস্‌ট্রিম্‌লি মিরাকুলাস্!

: ...... ।

: মাথার খুলির গঠন হুবহু মিলে যাচ্ছে

: ...... ।

: ঠিক একই প্রকার গোষ্ঠীবদ্ধতার টেন্‌ডেন্‌সি।

: ..... ।

: আবার দেখুন, দাঁত দিয়ে একটা হিংস্র বাঘকে হত্যা করাটা সে সময়কার অস্ত্রহীন শিকার প্রণালীকেই এ্যাসোসিয়েট করছে না কি ?

: .... ।

: এবং আরো আশ্চর্যের বিষয় দেখুন, আমার পরিষ্কার মনে হচ্ছে, এটা কোন একক কিংবা প্রক্ষিপ্ত ঘটনা নয়। এ-রকম একটা গোষ্ঠীর যেন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে।

: .... ।

: হ্যাঁ, ইতিমধ্যে তার কয়েকটি স্পেসিমেনের খোঁজ আমি পেয়েছি।

তারপর আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে ডাঃ ভট্টাচার্য ফোনটা নামিয়ে রাখলেন। এবং কমলেশের উপস্থিতিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেই যেন তিনি আত্মগতভাবে ঘরময় পায়চারী করতে লাগলেন।

এতক্ষণ কমলেশ কেবল একপ্রান্তের কথাই শুনেছে। বিষয়টা যে নিজন মূর্ সম্পর্কিত এ-কথা বুঝতে তার কোন অসুবিধে হয়নি। কিন্তু তার নোটের মধ্যে যে এমন সব রহস্যময় ব্যাপার-স্যাপার লুকিয়ে থাকতে পারে, এ তো তার স্বপ্নেও মনে হয়নি। আসলে ব্যাপারটা যে কি, তা কিছুতেই কমলেশের মাথায় কুলিয়ে উঠছে না। ডাঃ ভট্টাচার্যের মুখনিঃসৃত বিচিত্র সব সিদ্ধান্তের শব্দগুলি একটা ভারী কুয়াশার পর্দার মত তার চৈতন্যের উপর ভুলতে লাগলো!

কিছুক্ষণ পরে সেই কুহকময় কুয়াশার পর্দার ওপর থেকে একজন আশ্চর্য মানুষের কণ্ঠে ডাঃ ভট্টাচার্য বললেন : কমলেশ!

: আজ্ঞে।--নড়েচড়ে নিজের সম্বিৎ ফেরাবার চেষ্টা করলো কমলেশ।

: কালই তুমি ধানবাদের পাশাপাকুড়িয়া কোলিয়ারীতে রওনা হয়ে যাও।

কমলেশ ডান দিকে মাথা কাত্ করলো, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কমলেশের মনে পড়লো ধানবাদে যাতায়াতের একটা খরচা আছে। এতদিন তো সে এখানে সেখানে নিজের খরচায়ই যাতায়াত করেছে। অথচ কমলেশ বিশ্বস্ত-সূত্রে জেনেছে, মিত্র-চক্রবর্তী তদন্ত কমিশনের কার্যনির্বাহ বাবদ প্রায় অর্ধ লক্ষাধিক টাকার একটা বাজেট ধরা আছে। কিছু বলবার জন্য কমলেশ মনে মনে মহড়া দিতে শুরু করলো।

ডাঃ ভট্টাচার্য জিজ্ঞাসা করলেন : কিছু বলবে ?

কমলেশ মাথা নাড়ালো। এর দ্বারা অবশ্য সে কিছু বলবে কি বলবে না, তা কিছুই বোঝা গেলো না।

ডাঃ ভট্টাচার্য বললেন: কমলেশ, এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে তুমি আমার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছো, যা নৃতত্ত্বের জগতে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করবে! এর থেকে পরে তুমি একটা বড় রকমের প্রসপেক্ট আশা করতে পারো।

কমলেশের কাঁধের উপর হাত রাখলেন ডাঃ ভট্টাচার্য। অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে কমলেশ বললো: তা হলে স্যার, কাল ভোরেই আমি ধানবাদ রওনা হয়ে যাই!

ডাঃ ভট্টাচার্য কমলেশের কাঁধে হাত দিয়ে সদর দরোজা অবধি এলেন। তারপর বললেন: সমস্ত কিছুই খুব যত্ন নিয়ে স্টাডি করবে।

ঘাড় কাৎ করে কমলেশ রাস্তায় নেমে গেলো।

কমলেশের ডায়েরী থেকে:

পাশাপাকুড়িয়া জায়গাটা রুক্ষ এবং বন্ধুর। প্রাকৃতিক আবহাওয়া চরম-ভাবাপন্ন। পূর্বে জায়গাটা গভীর জঙ্গলময় এবং পরিত্যক্ত ছিলো। বর্তমানে কায়লাখনির সূত্র ধরেই এখানটা জমজমাট। এখানকাব কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় জানা গেলো এ জায়গাটার ভূ-প্রকৃতির গঠন এবং স্তরবিন্যাস বেশ আদিম। প্রাইমারী ড্রিলিং-এর সময় বেশ কয়েক হাজার বছর পূর্বেকার কিছু নিদর্শনও নাকি পাওয়া গেছে। বিষুবরেখা এ-জায়গাটার খুব কাছ দিয়ে বেঁকে গেছে। নিজন মূর্মু সম্পর্কিত তদন্তের মধ্যে নৃতত্ত্বের একটা জটিল প্রশ্ন জড়িত, এই ধারণাটা আমার মাথায় থাকাতে এই খুটিনাটি বিষয়গুলিকে আমি ডায়েরীভুক্ত করেছি।

কিন্তু কর্তৃপক্ষের কাছে মূর্মু সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলে, তারা ব্যাপারটা সাফ অস্বীকার করলেন। নিজন মূর্মু নামক কোন লোকই নাকি কোনকালে এখানে কাজ করতো না। আমাকে তারা বিগত কয়েক বছরের খনিশ্রমিকদের হাজিরার খাতা দেখালেন। এবং সত্যি সত্যিই নিজন মূর্মু নামক কোন লোকের অস্তিত্ব সেখানে নেই।

অথচ বিস্ময়কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হলাম তখনই, যখন এখানকার

লোকজনের মুখে জানা গেলো দেড় বছর আগেও নিজন মুর্মু এখানে ছিলো। এবং এই পাশাপাকুড়িয়া কয়লাখনিতেই চাকরী করতো। সুতরাং আমি একটা উদ্ভট পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে গেলাম। অথচ নিজন মুর্মুর থাকা না-থাকার রহস্যটা কেউ আমার কাছে পরিষ্কার করতে চাইছে না। সবাই আমাকে কি রকম একটু সন্দেহের চোখে দেখছে। কিন্তু আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

অবশেষে অনেক খোঁজখবর করে এখানে ননী রায় বলে একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের দেখা পাওয়া গেলো। লোকটি নাকি এখানকার শ্রমিকদের সঙ্গে বিবিধ কার্যসূত্রে জড়িত। ননী রায়ের সঙ্গে আমার নিম্নলিখিতরূপ কথাবার্তা হয়।

: আপনি তাহলে বলছেন যে নিজন মুর্মু এখানেই ছিলো ?

: একমাত্র কর্তৃপক্ষকে বাদ দিলে এখানকার সকলেই এই কথাটা স্বীকার করবে।

: কিন্তু কর্তৃপক্ষের অস্বীকার করবার কারণ কি ?

এখানে বলে নেওয়া ভালো আমার এই প্রশ্নটি শুনে ননী রায় একটু হাসলো। তার এই হাসির সঙ্গে আমি অবিকল মঙ্গল কিসকুর সেই দুর্বোধ্য হাসির মিল খুঁজে পেলাম। ননী রায় এবং মঙ্গল কিসকু অভিন্ন লোক কিনা, এই প্রশ্ন এখানেই একবার আমার মাথায় চকিতে উঁকি দিয়েছিলো।

ননী রায় বললো : বছরখানেক আগে এখানে একটা বড় রকমের খনি বিস্ফোরণ হয়েছিলো, আপনার মনে আছে কি ?

প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের কোন ব্যাপার আমার মনে ছিলো না। তা ছাড়া এক বছর আগেকার কাগজে কি পড়েছি না পড়েছি, তা মনে থাকবার কথাও নয়। আমি বললাম : না, ঠিক মনে করতে পারছি না !

: সে যাক। কিন্তু এখানে একটা বেশ বড় খনি বিস্ফোরণ হয়েছিলো এবং বিস্ফোরণের অব্যবহিত পরেই কর্তৃপক্ষ তাদের হাজিরার খাতা রাতারাতি পালটে ফেললো। সেখানে দেখানো হলো বিস্ফোরণকালীন সময়ে মাত্র চারজন শ্রমিক নাকি খনির অভ্যন্তরে ছিলো। এই ঘটনার দিন সাতেক পরে আরও একটা ছোটখাটো বিস্ফোরণ হয়। ফলে হয় তো বাইরে

বেরিয়ে আসবার একটা রাস্তা তৈরীও হয়ে থাকবে। তা না হলে নিজন মুর্মু কি করে আসবে!

: মুর্মু তাহলে খনির ভিতরে ছিলো?

: শুধু মুর্মু নয়, মোট তেতাল্লিশজন লোক ছিলো খনির ভিতরে। কর্তৃপক্ষ উনচল্লিশ জন শ্রমিকের নাম হাজিরার খাতা থেকে রাতারাতি মুছে দিলো। কিন্তু বেরিয়ে এসে বিপদ বাধালো মুর্মু নিজেই।

: আশ্চর্য! বাতাসহীন খাদ্যহীন হয়ে মুর্মু কিভাবে খনির ভিতরে বেঁচে থাকলো?

: প্রথমটার জবাব আমি আপনাকে দিতে পারবো না। কারণ, সেটা মুর্মুও বুঝিয়ে বলতে পারেনি, তবে দ্বিতীয়টার জবাব দিতে পারি।

: কি রকম?

: বাধ্য হয়ে মুর্মুকে একজন মৃত সহকর্মীর মাংস ছিঁড়ে খেতে হয়েছিলো।

এ রকম একটা জবাবের জন্য আমি একেবারেই তৈরী ছিলাম না বলে, আঘাতের প্রাথমিক ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতে বেশ সময় লাগলো। আমার সমস্ত শরীরের মধ্যে কি রকম একটা হিমশীতল ভয় রি রি করে পাকিয়ে উঠলো। মনে হলো, এই সমস্ত শোনার পর আমার মস্তিষ্কের মধ্যে একটা বড় রকমের গোলযোগ ঘটে যাবে। অনেকক্ষণ আমি একজন অপ্রকৃতিস্থ মানুষের মত বসেছিলাম।

পরে জিজ্ঞাসা করলাম: তারপর মুর্মুর কি হলো?

: এই এলাকায় মুর্মু বিপজ্জনক এবং নিষিদ্ধ হয়ে গেলো।

এরপর ননী রায় আরো কিছু বলবার উদ্যোগ করতেই আমি সেখান থেকে উঠে চলে এলাম। আমার মস্তিষ্কের আর কিছু বইবার মত ক্ষমতা ছিলো না।

ডাঃ ভট্টাচার্যের খসড়া

দ্বিতীয় হিমবাহ যুগের অব্যবহিত পরেই প্রধানত পৃথিবীর উষ্ণ অঞ্চল-গুলিতে একটা মানবগোষ্ঠীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এদের দৃঢ় লম্বাটে চোয়াল, মাথার খুলি ক্ষুদ্র এবং আড়াআড়িভাবে বসানো। ফলত মস্তিষ্কের গঠনটি দুর্বল এবং অধিক জটিলতা ও সমস্যাকে ধারণ করতে অক্ষম। কোনরকম অস্ত্রশস্ত্রের কথা এরা ভাবতেই পারতো না। এমন কি আগুনের আবিষ্কারও

তখন সম্ভব হয়নি। এই যুগের মানুষকে নৃতাত্ত্বিকরা নিয়ানডার্থাল নামে অভিহিত করেছেন। নিয়ানডার্থাল মানুষের লক্ষণ মোটামুটিভাবে এই প্রকার :

(ক) দৃঢ় লম্বাটে চোয়াল, আড়াআড়িভাবে বসানো মাথার খুলি ক্ষুদ্র, মস্তিষ্কের ক্রিয়া নামমাত্র।

(খ) কোনরকম অস্ত্রশস্ত্র বা আগুন আবিষ্কারের থেকে তারা দূরে, কাঁচা মাংস এবং বনজ ফলমূল তাদের একমাত্র খাদ্য।

(গ) প্রকৃতির অনুকূলতা লাভের জন্য তারা স্থান পরিবর্তনের পক্ষপাতী, যাযাবরত্ব তাদের প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত বৈশিষ্ট্য।

(ঘ) স্বাভাবিকভাবেই কোন মানবিক মূল্যবোধ তাদের মধ্যে জন্মায়নি।

(ঙ) গোষ্ঠীবদ্ধতার একটা সংকীর্ণ লক্ষণ, যা একই শ্রেণীর অনেক পশুর যূথবদ্ধতার অনুরূপ।

মোটামুটি এই পাঁচটি মূলধারাকে কিছু উপধারায় বিভক্ত করলে এই রকম দাঁড়ায় :

(ক) (১) মস্তিষ্কের গঠন ক্ষুদ্র হবার ফলে কোন উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে অক্ষমতা। (২) এই বায়োলজিকাল ডিফেক্ট্‌সের ফলে ক্রোধ হিংসার আধিক্য। (৩) আত্মরক্ষা অপেক্ষা আত্মনাশের দিকে ঝোঁক প্রবল।

(খ) (১) অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কার না করতে পারার ফলে আত্মপ্রত্যয়হীনতা। (২) কাঁচা মাংস এবং ফলমূল এই দুই প্রায় বিপরীত খাদ্যের সরলতায় মানসিকতার মধ্যে একরোখা ভাব প্রবল।

(গ) (১) হিমবাহের বিপর্যয়কারী অভিজ্ঞতা থাকায় উষ্ণ অঞ্চলের দিকে বসবাস করবার ঝোঁক বেশী। (২) নিয়ত স্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সহজে খাদ্য সংস্থানের প্রয়াস জড়িত।

(ঘ) (১) যে সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে বসবাস করলে পারস্পরিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্র সুগম হয় এবং যার মধ্য থেকে জন্মলাভ করে মানবিক বৃত্তিসমূহ তা এই নিয়ানডার্থাল গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকার ফলে প্রায় অনিবার্যভাবেই তারা মানবিক মূল্যবোধহীন।

(ঙ) খুব ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে নিজেকে ধরে রাখার কুফল দ্বিবিধ। (১) দল, উপদল এবং তস্য উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়া। ফলত (২) পরস্পরের প্রতি সর্বদাই একটা আক্রমণাত্মক ভঙ্গি।

মোটামুটিভাবে এই বৈশিষ্ট্যগুলিই নিয়ানডার্থাল মানবগোষ্ঠীর জীবন এবং প্রকৃতির প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময়ে নিয়ন্ত্রিত করতো।

এখন প্রশ্ন হলো নিজন মুর্মু নামক একটি আদিবাসী মানুষকে কেন্দ্র করে। এই লোকটি তার স্ত্রী-পুত্র কন্যাকে নির্মমভাবে হত্যা করে নিজে আত্মহত্যা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়। নিজন মুর্মুকে কেন্দ্র করে একটা ব্যাপক সামাজিক তদন্ত করতে গিয়ে এমন কতকগুলি বিস্ময়কর ব্যাপার তদন্ত কমিশনের কাছে ধরা পড়ে, যেগুলি যেমন অতি বিস্ময়কর, তেমনি যুগান্তকারী।

হত্যাকাণ্ডের অনতিকাল পরেই নিজন মুর্মুর যে ডাক্তারী পরীক্ষা হয়, সেই সূত্রই এই বৈপ্লবিক তদন্তের পথপ্রদর্শক। ডাক্তারী পরীক্ষায় বলা হয়েছে, পরপর সংঘটিত কিছু ঘটনার আঘাত যা এই শ্রেণীর মস্তিষ্ক বহন করতে অক্ষম, ঘটে যাবার ফলে স্নায়ুকেন্দ্র চুরমার হয়ে যায়, এবং তার অবধারিত ক্রিয়াই একটা ব্যাপক হত্যাকাণ্ড। এই মস্তিষ্কটির গঠনপ্রক্রিয়া একটু তৃতীয় শ্রেণীর মস্তিষ্কের কাছ ঘেঁষা এবং আদিম অবস্থার দিকে ঝোঁকটা প্রবল। কিন্তু লোকটি কোনক্রমেই পাগল নয়।

পরবর্তীকালে নিজন মুর্মুকে কেন্দ্র করে একটা ব্যাপক সামাজিক তদন্ত চালানো হয়। এই তদন্তকার্যের ফলে যে তথ্য সংগ্রহ হয়েছে তা পরপর সাজিয়ে দিলে এই রকম দাঁড়ায় :

মুর্মু তার সন্তানগুলিকে পাষাণে আছড়ে হত্যা করে এবং স্ত্রীকে গলা টিপে। এখন প্রশ্ন হলো, সভ্যতার অপরিসীম বিকাশের ফলে যথেষ্ট উন্নতশ্রেণীর বিষ এবং অস্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে ; তথাপি মুর্মু কেন সেগুলি ব্যবহার করেনি ? এই হত্যাকাণ্ডের সময় কেন তার মধ্যে মানবিকতার কোন লক্ষণ প্রকাশ পায়নি ?

আসামের চা বাগানে কাজ করাকালীন সময়ে সে দাঁত দিয়ে কামড়ে একটি বাঘকে হত্যা করে। নিরস্ত্র অবস্থায় হিংস্র জন্তুর কাছ থেকে আত্মরক্ষায় পলায়নই বিধেয়। এ-ক্ষেত্রে কি নিজন মুর্মুর ব্যবহার আত্মনাশের দিকে নয় ? আর বাঘের কণ্ঠনালীতে কামড়ে ধরার মধ্য থেকে কি এই কথাই প্রমাণিত হয় না যে বাঘকে সে খাদ্যবস্তু হিসাবেই গ্রহণ করতে উদ্যত হয়েছিলো ? এই ঘটনার পরেই তার মধ্যে গোষ্ঠীবদ্ধতার ঝোঁক প্রবল হয়ে ওঠে। তার এই কার্যের দ্বারা চা বাগানের প্রশাসনিক কাজ ব্যাহত হয়। ফলে কর্তৃপক্ষ তাকে সেখান থেকে বহিষ্কার করে দিতে বাধ্য হয়।

ধানবাদের পাশাপাকুড়িয়া কয়লাখনির দুর্ঘটনায় মুমূর্ সুগভে আটকা পড়ে। সেখানে তার বেঁচে থাকবার প্রক্রিয়াটা রহস্যময়, অমানবিক। সেখানে সে একজন মৃত সহকর্মীর মাংস ভক্ষণ করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত কারণে নিয়ানডার্থাল মানবগোষ্ঠীর যখন খাদ্যাভাব ঘটতো, তারা নির্বিচারে স্বগোষ্ঠীর মানুষকে হত্যা করে খাদ্যের সমস্যা মিটাতো। মুমূর্ যে মৃত সহকর্মীরই মাংস খেয়েছে, তাকে হত্যা করে খায়নি—তার সম্ভাবনা কি অস্বীকার করা যায়?

লক্ষণীয়, এক জায়গায় সে বেশীদিন কখনই টিঁকে থাকতে পারেনি। নিয়ত স্থান পরিবর্তন তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

আসাম থেকে বেরিয়ে সে তো এমন কোন জায়গায় যেতে পারতো, যেটা নাতিশীতোষ্ণ কিংবা শীত প্রধান অঞ্চল। কেন সে ধানবাদের চরম উষ্ণ অঞ্চলে গিয়ে আস্তানা গাড়লো? এর দ্বারা কি এ-কথা প্রমাণিত হয় না, যে য়ুরোপ থেকে এসে, অতীতে তার পূর্বপুরুষেরা মানভূম সিংভূমের কাছাকাছি পত্তনি পাতে?

নিজন মুমূর্র চোয়াল লম্বাটে দৃঢ়, মাথার খুলি আড়াআড়ি ভাবে বসানো, খুলি ক্ষুদ্র, মস্তিষ্কের ক্রিয়া সামান্য।

এই সব তথ্যের ভিত্তিতে এ-কথা প্রমাণিত যে মুমূর্র মধ্যে নিয়ানডার্থাল মানবগোষ্ঠীর সমস্ত লক্ষণ পরিস্ফুট। একজন নিয়ানডার্থাল রূপেই মুমূর্কে চিহ্নিত করা যায়।

কিন্তু এটা কি করে সম্ভব হলো? মানবজাতির ক্রমবিকাশের ধারায় অনিবার্য প্রাকৃতিক কারণেই তো নিয়ানডার্থাল মানবগোষ্ঠীর অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার কথা। হাজার হাজার যুগ পার হয়ে এসেও কি অলৌকিক কারণে সেই নিয়ানডার্থাল মানবগোষ্ঠী তাদের তৎকালীন বৈশিষ্ট্য সমূহসহ আজও বর্তমান?

তা হলে কি এ-কথা মনে করা অযৌক্তিক—সভ্যতার ক্রমবিকাশের মধ্যে কোথাও নিশ্চয়ই এমন একটা গোপন গলদ রয়েছে, যে গলদের সূত্র ধরেই নিয়ানডার্থাল মানবগোষ্ঠী তাদের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রেখেছে? সুতরাং সেই গলদ কোথায় এবং তার স্বরূপই বা কি?

পরিশিষ্ট ঃ

আজও নিয়ানডার্থাল মানবগোষ্ঠীর অস্তিত্ব সভ্যতা এবং মানবজাতির পক্ষে বিপজ্জনক। সরকারের কাছে এই দাবী উপস্থিত করা হচ্ছে ঃ অবিলম্বে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হোক, যেখানে এই বিষয়ের উপর গবেষণা চলতে পারে। একটি সুরক্ষিত বৃহৎ আবাসস্থান তৈরী করে, উল্লিখিত লক্ষণ মিলিয়ে সমাজের মধ্যে থেকে এইসব মানুষগুলিকে আলাদা করে ফেলা হোক। তদন্ত কমিশন মনে করে, এই শ্রেণীর মানবগোষ্ঠীর অস্তিত্বই দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে দেবার জন্য দায়ী, সমস্ত দেশের মধ্যে থেকে যদি এই মানবগোষ্ঠীকে ছেঁকে তুলে আনা যায়, তবেই এক বিশুদ্ধ সভ্য মানুষের সুন্দর সমাজ গঠন সম্ভব হবে। বর্তমানে দেশব্যাপী যে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে, তদন্ত কমিশন মনে করে, তার জন্য দায়ী একমাত্র নিয়ানডার্থাল মানবগোষ্ঠীর অস্তিত্ব।

একমাত্র নিজন মুর্মু নয়, তদন্তের ফলে জানা গেছে, এই গোষ্ঠীর অস্তিত্ব দেশের সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে, খিদিরপুর বস্তির বর্তমান বাসিন্দা পূর্ববঙ্গাগত গোপালদাস মল্লিক, কাঙ্গালীচরণ নামক একজন মণ্ডপ, কসবার গ্লাস ফ্যাকটরীতে কর্মরত মঙ্গল কিস্কু, ধানবাদের পাশাপাকুড়িয়া কয়লাখনির ননী রায় ইত্যাদি…।

ভব মল্লিকের আক্কেল দাঁত

নীচের পাটির ছেদন দন্তটি যথেষ্ট বেয়াক্কেলে এবং বেয়াদপ। সে কার এক্তিয়ারে বাস করে সেটা তার বিবেচনা করা উচিত ছিলো। যে চোয়ালটির সঙ্গে সে সাঁটানো সেটা ভব মল্লিকের চোয়াল। ভব মল্লিকের দৈর্ঘ্য সাড়ে ছ'ফিট। প্রস্থ সেই অনুপাতে। ভব মল্লিকের আটখানা বাড়ী। দুটো অয়েল মিল। কোলকাতায় তিন চার রকমের জানা অজানা বিজনেস। দশ বারোটা 'অল বেঙ্গল' লেখা লরী। প্রাসাদোপম বিশাল বাড়ী। ঝি-চাকর-কুকুর দারোয়ান। নিঃসন্তান হিস্টিরিয়াগ্রস্ত সুন্দরী স্ত্রী। দু'টি হাল ফ্যাসানের প্রাইভেট কার। একদা রেকর্ড ভোটে জেতা এবং পরবর্তী কালে জামানত জব্দ হওয়া প্রাক্তন এম. এল এ.। এবং কিছু প্রাণবন্ত যুবকের একান্ত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার ভবদা।

এই এতগুলি বিবেচনাযোগ্য বিষয়কে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নীচের পাটির ছেদন দন্তটি মধ্যরাতে চাগাড় দিলো। ভব মল্লিক তার ব্যক্তিত্ব দিয়ে গোড়ার দিকে অবস্থাটাকে চাপা দিতে চাইলো। কিছু হলো না। উঠলো। বসলো। জল খেলো। অন্যমনস্ক থাকতে চাইলো। পাশের ঘর থেকে স্ত্রীকে ডেকে এনে আঁতিপাঁতি করে ড্রয়ার খুঁজে বেদনানাশক কোডোপাইরিন খেলো। কিন্তু ছেদন দন্তটি নাছোড়বান্দা। সে তার চোয়ালসংলগ্ন অঞ্চল থেকে দু'দুটো মহাযুদ্ধে ব্যয় করা যত বোমা এবং আহত সৈনিকদের বুক ফাটা আর্তনাদ সবই ভব মল্লিকের মস্তিষ্কের মধ্যে ফাটাতে লাগলো। সুদীর্ঘ উঁউঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ'র সঙ্গে মোটকা ফোন ডাইরেকটরী ঘেঁটে এই আশ্চর্য সংবাদ জানা গেলো, এই মফঃস্বল শহরের কোন ডাক্তারের ফোন নাম্বারই সেখানে নেই।

ক্রুদ্ধ ভব মল্লিক ফোন ডাইরেকটরীটা ছুঁড়ে মারলো। সেটা একটা স্থাণু ফ্লাওয়ার ভাসকে তীব্র গতিশীল করে জানালার কাচ ভাঙিয়ে শান্ত হলো। বিশাল বাড়ীর এখানে ওখানে আলো জ্বলে উঠলো। কি হয়েছে

জানবার ইচ্ছায় এবং নানা রকম আশংকায় ঝি-চাকর-দারোয়ান-কুকুর বারান্দায় সমবেত হলো।

কি করবে বুঝতে না পেরে সন্ত্রস্ত ঘুম ঘুম চোখে স্ত্রী জিজ্ঞেস করলো, খুব কষ্ট হচ্ছে কি?—ন্‌না, শালীর সঙ্গে একস্ট্রা রসালাপ হচ্ছে।—বিরলশ্রুত এক অদ্ভুত ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কথা ক'টি ছুঁড়ে মারলো ভব মল্লিক।

ভীরু গলায় স্ত্রী পরামর্শ দিলো, একটু গুরুদেবের নাম নাও না!

কথাটা মন্দ নয়। ভব মল্লিকের জীবনে গুরুদেব অনেক মিরাকল দেখিয়েছেন। শিয়রে ছোট ত্রিপয়ে মহার্ঘ করে বাঁধানো গুরুদেবের রঙ্গিন ছবি। মাথায় প্রকাণ্ড শাকের বোঝার মত গুরুদেবের এক মাথা চুল। ত্রিভুবন ঘুরে এলেও এমন কোন বৈভব চোখে পড়বে না। ছবির সামনে চোখ বুজে বসলেন ভব মল্লিক। মনে মনে বললেন, কত বিপদ থেকে তুমি আমাকে কত সময় রক্ষা করছো। তেমনি করে এই মধ্যরাতে দন্তশূল থেকে আমাকে বাঁচাও। প্রথমটায় মনে হলো মিরাকল বুঝি শুরু হয়েছে। ব্যথাটা যেন একটু কমের দিকে। কিন্তু সেটা কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার। পরক্ষণেই দাঁতের গোড়া থেকে ছুটে গিয়ে একটা বিদ্যুতের চাবুক মস্তিষ্কের কোষে কোষে চাবকাতে লাগলো।

—উল্লুক! বেল্লিক!

যন্ত্রণায় কাত্‌রানির সঙ্গে এই শব্দ দু'টি ভব মল্লিকের মুখ দিয়ে এ্যালায়েড হয়ে বেরুলো। সে কাটা পাঁঠার মত বিছানায় দাপাতে দাপাতে বললো - কম টাকা দিয়েছি আমি, আশ্রমের জন্য? এই সামান্য উপকারটুকু করতে যত কিপ্‌টেমি। আসলে সবাই ধান্দাবাজ।

এবার ভব মল্লিকের স্ত্রী রীতিমত ভয় পায়। সোয়ামীটিকে সে পাঠ করেছে লক্ষ্মীর পাঁচালীর মত পৌন-পুনিকতায়। অন্যের কষ্ট বা অসুবিধার বিষয়ে ভব মল্লিক যত উদাসীন ঠিক ততটাই মনোযোগী নিজের সুবিধা অসুবিধার বিষয়ে। জীবনে কোন রকম অসুবিধার সঙ্গে কম্‌প্রোমাইজ করেনি ভব মল্লিক। নিজের একটা সুবিধার জন্য অন্যের হাজারটা অসুবিধা সৃষ্টি করতে সে কখনো বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেনি। ইহলোকের যত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সবই যেন ভব মল্লিকের জন্য। একচুল এদিক ওদিক হবার উপায় নেই।

এই তাকেই কি কম কষ্ট দিয়েছে ভব মল্লিক! চোখের সামনে বাইরের

মেয়েছেলে নিয়ে এসে তুলেছে। যাচ্ছেতাই বেলেল্লাপনা হয়েছে বাড়ীতে। প্রথম দিকে সে নানা রকম মেয়েলী কৌশল অবলম্বন করেছে। পরে শেষ অস্ত্র কান্নাকাটি, আত্মহত্যার হুমকি। কিন্তু ভব মল্লিককে টলানো যায়নি। সে তার সিঙ্গাপুরী কলার মত মোটা তর্জনি গেটের দিকে উঁচিয়ে বলেছে, গেট দিয়ে বেরুলেই রাস্তা। আর রাস্তা দিয়ে যেখানে খুশি যাওয়া যায়। স্ত্রীর এরকম গৃহত্যাগের স্বাধীনতায় সে বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপ করতে চায় না।

কিন্তু বললেই তো আর সব ফেলে টেলে গৃহত্যাগ করা যায় না। সেও এবাড়ীর বউ। তারও একটা অধিকার আছে। তা ছাড়া গেলেই তো ভব মল্লিকের ষোল আনা স্বাধীনতা। বরঞ্চ তার থাকাই ভালো। না হয় ভব মল্লিকের পায়ের কড়ে আঙ্গুলের নীচে একটা ছোট্ট কাঁটা হয়েই সে বিঁধে থাকবে। তবু তো কাঁটা। উঠতে বসতে খচ্খচানি। সে যেমন যায়নি, তেমনি স্বামীরও কিছু করতে পারেনি। মাঝখান থেকে তার মূর্চ্ছা যাবার সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে। বোধহয় এই কথা ভেবেই, যতক্ষণ মূর্চ্ছা ততক্ষণই মুক্তি।

ভয় পেলেও ভব মল্লিকের স্ত্রী টের পায় তার ভেতরে একটা খুশি শেষ বেলাকার আলোর মত আল্তোভাবে লেগে আছে। বোঝ এবার। কষ্ট কি জিনিস, ব্যথা কাকে বলে কোনদিন তো টের পাওনি। এবার দেখো, কেমন লাগে! কিন্তু মুখে বললো, তা হলে বরং পান্নুকে পাঠিয়ে কোন ডাক্তারকে কল্ দিয়ে নিয়ে আসি।

গালে হাত চেপে ধরে গোঁ গোঁ করে ভব মল্লিক বললো, যা হোক কিছু একটা করো। ভোঁদার মত দাঁড়িয়ে থেকো না।

ছিট্‌কিনি খুলে বারান্দায় এলো ভব মল্লিকের স্ত্রী। এক পলক তাকিয়ে দেখলো ঝি-চাকর-দারোয়ান কুকুর সব হাজির। সকলেরই চোখে মুখে উৎকণ্ঠিত জিজ্ঞাসা। মল্লিকের স্ত্রী বিশেষ কারুর দিকে না তাকিয়ে বললো, বাবুর দাঁতে খুব যন্ত্রণা হচ্ছে। অসহ্য যন্ত্রণা। ডাক্তার ডাকতে হবে। পান্নু কই?

ইতিমধ্যে ভব মল্লিকের পেয়ারের কুকুর রাজেশ তু'বার মৃদু ভুক্ ভুক আওয়াজ করে খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেছে। প্রভুর মধ্য রাতের যন্ত্রণায় তাকেই বিশেষ সংবেদনশীল মনে হলো।

উপস্থিত সবাই পরস্পরের মুখের দিকে তাকালো। ঝি মনোরমার মা বললো, পান্নুবাবু তার ঘরেই আছেন মা। সাড়া শব্দে বোধ হয় ঘুম ভাঙ্গেনি।

চাকর নিতাই বললো, ডেকে আনবো মা ?

—হ্যাঁ। তাড়াতাড়ি ডাকো। এক্ষুনি যেন বাবুর ঘরে আসে।

পান্নু থাকে নীচের তলার কোণের ঘরে। তাড়াতাড়ি তাকে ডাকতে ছুটলো নিতাই। ব্যথাটা কি খুব অসহ্য? ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক? ভর সন্ধ্যের লাথি খেয়ে ছিটকে রেলিং-এর উপর পড়ে তার যে গত জুন মাসে একটা দাঁত ভেঙেছিলো, যন্ত্রণাটা কি সেরকম, না তার চাইতে বেশী? তা নাহলে মনে হলো, বেশীই। চুরি করে মোটা পুরু সর খাওয়ার মত একটা সুখ সারা শরীরে ছড়িয়ে গেলো। হোক, হোক। বুঝুক, ব্যথা কারে কয়। দাঁতের কোন স্পেশাল ডাক্তার দেখা আছে কিনা নিতাই ঠিক মনে আনতে পারলো না। পরক্ষণেই মনে পড়লো, এই ধরনের ব্যাপার সবটাই গুরুঠাকুরের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে। সে মনে মনে প্রার্থনা করলো, ঠাকুর, বাড়াও বাড়াও। বদমাস মশার মত, আমাদের পেটের খিদের মত ভর মল্লিকের যন্ত্রণা বাড়ুক।

বেশ জোরে জোরে ঘা মেরে তবেই পান্নু ওরফে পান্নালালের ঘুম ভাঙলো। চোখ কচলাতে কচলাতে জড়ানো গলায় বললো, ক্যাঁ-এ্যা-এ্যা।

—আমি নিতাই, বাবু।

—মাঝ রাত্তিরে কি চাই?

এক পলক দেখেই নিতাই বুঝলো, ভালো রকম টেনেই ঘুম লাগাচ্ছিলো পান্নুবাবু। দু'পায়ে হাটি হাটি ভাব। পেটের ভেতর কোটা গোলাপ বাইরে বেরিয়ে আসছে। বললো, তাড়াতাড়ি বাবুর ঘরে আসুন। ডাকছে।

কি, হয়েছে কি।

—ব্যথা। ভীষণ ব্যথা।

—কোথায়?

—দাঁতে?

তড়াক করে জামা গায়ে গলিয়ে নিতাইয়ের পাশ দিয়ে হাওয়া হয়ে গেলো পান্নু অর্থাৎ পান্নালাল সিঙ্গি ভর মল্লিকের হোমাট নট। এই হোয়াট-নটগিরি করেই সে পাকা দোতালা বাড়ী বানিয়েছে। একটা দেশী মদের দোকান। আরো কি সব টুকটাক। নিতাই এই প্রথম টের পেলো পান্নুবাবু লোকটি কত ওস্তাদ। ঘরে আগুন লাগলেও সে এত দ্রুত হাওয়া হয়ে যেতে পারতো না। গুন না থাকলে কি আর মানুষ অমনি অমনি বড় হয়।

ভরদার ঘরে ঢুকবার মুখেই প্রথম বাধা পেলো পান্নু। একটা আর্তনাদসহ

যেটা তার গায়ে এসে ছিটকে পড়লো সেটা আর কিছু নয়, রাজেশ। রাজেশ কুকুর হলেও ভব মল্লিকের সব চাইতে প্রিয়। রাজেশকে যত আদর করেছে ভবদা তার একশো ভাগের এক ভাগও স্ত্রীকে করেনি। সেই রাজেশের যখন এই হাল, তখন পরিস্থিতিটা নিশ্চয়ই গুরুতর। সে এক পলক ভেবে নিয়ে পর্দা ঠেলে ভিতরে ঢুকলো। এ্যাই যে নবাবপুত্তুর! গিলে খোয়াব দেখছিলে এতক্ষণ— ! গালের একটা দিক সজোরে চেপে রাখার জন্য কথাগুলি সবই ভব মল্লিকের মুখ দিয়ে ট্যারা বাঁকা হয়ে বেরুলো। ভবদার এসব কথা কোনদিনই গায়ে মাখে না পানু। জীবনে কত সংকটজনক মুহূর্তে ভবদার শব্দের এবং শরীরের আঘাতও তাকে সহ্য করতে হয়েছে। এসব তার কাছে কিছু না। সে হাত কচলে বললো, কিছু ভাববেন না ভবদা। আমি এখুনি ডাক্তার ডেকে আনছি।

খাপপাতা বাঘের মত শিকার ধরার ভঙ্গিতে গালে হাত দিয়ে চোখ মুখ কুঁচকে বসে আছে ভব মল্লিক। বোম্বে ডাইংয়ের পুষ্পিত বিছানার চাদরটি যে আপাতত কণ্টকময় সেটা বোঝা যায় তার দলা পালিয়ে থাকায়। পানু আড়চোখে তাকিয়ে দেখলো, ঝাঁকরাচুলো গুরুদেবের ছবিটা ওলটানো। ভাঙ্গা ফ্লাওয়ার ভাস। একটা জানলার কিছু কাঁচ ভাঙা। ভবদার ফ্যাকাশে সুন্দরী স্ত্রী খাটের এক কোণে জড়োসড়ো। এই সমস্ত দৃশ্যের মধ্যেই টুকরো হয়ে ছড়িয়ে আছে ভবদার দাঁতের যন্ত্রণা। যন্ত্রণাটা তাহলে খুবই অসহ্য! একটা উঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ শব্দ করে ভব মল্লিক খাটের উপর দাপিয়ে উঠলো।

—তোমায় দিয়ে কি হবে! কোন্ কম্মোটা হবে। যত অকৃতজ্ঞ বেইমানের দল। আঃ-হা-হা-হা-হা!—ভব মল্লিকের দৈর্ঘ্য-প্রস্থে সমান টানা লাশটা থরথরিয়ে কেঁপে উঠলো। দু'পা এগিয়ে কাতর গলায় পানু ডাকলো, ভবদা!

—থাক্। হয়েছে। তোদের আমার খুব চেনা হয়ে গেছে! তোরা ভেবেছিস্, ভবদার তো এখন দিন নেই—খুব মজা, না? আঃ-হা-হা!—আবার যন্ত্রণায় ছাপিয়ে উঠলো ভব মল্লিক।

—ভবদা, এখন কথা বলবেন না। যন্ত্রণাটা বাড়বে।

—কেন, গায়ে লাগছে বুঝি? ভব মল্লিকের টাকা তো খুব আরামে খেয়েছো। তখন তো কোথাও লাগেনি। অপদার্থ বেইমানের দল!

মাথা নীচু করে হাত পাতলো পানু।

—গাড়ীর চাবিটা দিন। ডাক্তার ডেকে আনি।

—সামনের ড্রয়ারে রয়েছে। খুলে নাও। আমাকে উদ্ধার করো।

চোখ বুজে যন্ত্রণায় এক নাগাড়ে মাথা ঝাঁকাতে লাগলো ভব মল্লিক। বত্রিশ নয়, একটা দাঁতের যে এত তেজ তা তার জানা ছিলো না। মাথার মধ্যে যেন আলপিন ফুটছে পটাপট পটাপট।

চাবি নিয়ে বেরিয়ে যাবার মুখে পান্নু বললো, দশ মিনিটে ডাক্তার নিয়ে আসছি। আপনি ততক্ষণ একটু গরম সেঁক লাগান। আরাম পাবেন।

গাড়ি নিয়ে দ্রুত পথে নামলো পান্নু। মধ্যরাতের মফঃস্বল শহর। চারদিক সুনশান। দু'চারটে পথের নেড়ি কুকুর আর বন্ধ দোকানের সামনে শুয়ে থাকা ভিখিরী ক্লাশের লোক ছাড়া জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। এরকম নির্জন আলোছায়া মেশানো রাতকে ভালো চেনে পান্নু। দিনক্ষণের চাইতেও এই সময়টাকেও তার বেশী চেনা। আর একটু ভয় ভয় লাগছে তার। সময় অনুকূল হলে কোন পরোয়া ছিলো না। এদিকে তাড়াহুড়োয় বাচ্চুটাকেও পকেটে নিয়ে আসতে পারেনি। মধ্যরাতে বাচ্চুবিহীন পান্নু রাস্তায়। ভাবতেই তার পেট গুলিয়ে উঠলো। আর তখনই তার মনে হলো, বাঁ দিকের মোড়ে, ভাঙ্গা বাড়ীটার আড়ালে কয়েকটা মানুষের মত। তবে কি সুযোগ বুঝে বদলা নেবার জন্য ওৎ পেতে আছে কেউ! পান্নু ডান দিকে গাড়ী ঘোরালো। বাঁ দিকে ডাঃ অধিকারীর বাড়ী। সেখানেই যাবার ইচ্ছে ছিলো তার। কিন্তু বাচ্চুটাকে ছেড়ে এসে সে যে কি আহাম্মকের মত কাজ করেছে।

পান্নু ঠিক মনে আনতে পারলো না ডান দিকের এই রাস্তায় কোন ডাক্তার আছে কি না। স্টিয়ারিং-এর উপর তার হাত ঘামছে। ভাঙ্গা বাড়ীর আড়ালে যাদের দেখা গেলো তারা কারা? ঠিক তখনই আবার মনে হলো ব্রজ রায়ের চায়ের দোকানের পিছনে যেন কয়েকটা লোক। পান্নুর হৃদপিণ্ডের শব্দ দ্রুততর হতে লাগলো। ব্রেকের উপর পা কাঁপছে। আজ আর তার উপায় নেই। চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছে তাকে। সে আবার মরিয়া ভঙ্গিতে ডান দিকে গাড়ি ঘোরালো।

ভব মল্লিকের দাঁতের ব্যথার জন্যই তাকে আজ মরতে হবে। তার মৃত্যুর জন্য ভব মল্লিকই দায়ী। কি না করিয়েছে তাকে দিয়ে! শালা কম

হারামী। নিজে ধোয়া তুলসী পাতা। আর যত চুনকালি গায়ে লাগিয়েছে পান্থ। একটা নয়, দুটো নয়, চৌদ্দ চৌদ্দটা লাশ নেমেছে এই ছোট মফঃস্বল শহরে। শেষের তিনটে নিজেদেরই দলের লোক। সব পান্থর নেতৃত্বে। মানুষ ছেড়ে দেবে পান্থকে? সুযোগ পেলে আদর করবে? রাগ আর ঘেন্না জমাট বেঁধে আছে চারদিকে। এই নির্জন মধ্যরাতে আজ সুযোগ পেয়ে গেছে মানুষ। ভব মল্লিকের ভাড়াটে কুত্তাকে তারা আজ ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

পান্থ গাড়ির স্পিড্ বাড়ালো। তাকে তো বাঁচার চেষ্টা করতে হবে। চুলোয় যাক্ ডাক্তার। যন্ত্রণায় দাপাক ভব মল্লিক। শালা হারামী বুঝুক যন্ত্রণা কাকে বলে। তখন কত হুংকার। কত শলা পরামর্শ।

—বুঝলি পান্থ, সব বেটাকে ঘরে ঢুকিয়ে দিতে হবে। যেন রাস্তায় নামার ভরসা না পায়। তোর কোন চিন্তা নেই। চোখ বুজে কাজ করে যা। থানা পুলিশ হাঙ্গামা হুজ্জুতের সব দায়িত্ব আমার।

চোখ বুজেই কাজ করে গেছে পান্থ। দশ বারোজনের একটা টিম। পিছনে প্রশাসন আর টাকার মালিক ভবদা। চোখ খোলার আর দরকার কি। পান্থরা অনেক রক্ত লাগিয়েছে হাতে। অনেক মৃত্যু যন্ত্রণার দৃশ্যকে ভুলবার জন্য মদের বোতলের সঙ্গে গলাগলি ভাব করতে হয়েছে। মানুষেরা ছেঁড়া বালিশে মাথা রেখে টুপ করে ঘুমিয়ে পড়ে। আর পান্থকে মন দিয়ে ঘুমের হাত পা ধুইয়ে অনেক সাধ্য সাধনা করে আনতে হয়। কে কেড়ে নিয়েছে তার সহজ ঘুম আর স্বচ্ছন্দ চলাফেরা? ঐ হারামী ভব মল্লিক। শালা যন্ত্রণায় দাপাক, চুল ছিঁড়ুক। মরুক ভব মল্লিক।

পান্থকে বাঁচতে হবে। পান্থ গাড়ির স্পিড্ বাড়ায়। এ বাঁক থেকে সে বাঁক, সে বাঁক থেকে ও বাঁক। করতলের মত চেনা মফঃস্বল শহরটা যেন আজ একটা প্রকাণ্ড গোলকধাঁধা হয়ে গেছে। এই মধ্যরাতে সে এই গোলক-ধাঁধার পেটে ঢুকে গেছে। বেরুবার পথ জানা নেই। আতঙ্কিত পান্থ খোয়া ওঠা রাস্তায় ঘুরতে লাগল।

পান্থর পরামর্শ মত গরম সেঁক লাগিয়ে ভব মল্লিকের যন্ত্রণা আরো দ্বিগুণ বেড়ে উঠলো। সে নিদারুণ ভাবে আহত বাঘের মত গোঁ গোঁ করে সারা ঘরময় পায়চারী করতে লাগলো।

—ইডিয়েট! রাস্‌কেল্! গেছে তো গেছেই। কোথায় কোন্ ভাটিখানায় গিয়ে পড়ে আছে? যত খুনে গুণ্ডা বদমাসের দল!

কাতরোক্তির সঙ্গে নাগাড়ে গর্জাতে লাগলো ভব মল্লিক।

—যেই দেখেছে ভব মল্লিকের দিন নেই, সব মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে! বেইমান, রাস্তার কুত্তা যত! দাঁড়া, দিন আসুক আগে। তোদের ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবো আমি। আমি ভব মল্লিক। আমার সঙ্গে ফক্করবাজী!

রকম সকম দেখে ভব মল্লিকের স্ত্রী আর এখানে দাঁড়াবার ভরসা পায়নি। সে সোজা নিজের ঘরে চলে এসেছে। এখন একটু মূর্চ্ছা যেতে পারলে ভালো হতো। অন্তত ঘণ্টা দুয়েক নিশ্চিন্তি। কিন্তু কপাল তার সব দিক থেকেই মন্দ। এখন তার কিছুতেই মূর্চ্ছা আসছে না।

ভব মল্লিকের গলায় আবার গর্জন শোনা গেলো।

—কোথায় গেলি সব!

স্ত্রী-ঝি-চাকর-দারোয়ান সব কাঁপতে কাঁপতে ছুটে এলো। আর্ত গোঙানীর ফাঁক ফাঁকে ভব মল্লিক গোলাবর্ষণ করতে লাগলো, ঘুমুতে গেছে সব—ঘুম! যার খাচ্ছো, যার পরছো তার চোখে ঘুম নেই আর তোমরা সব ঘুমে ঢলে পড়ছো! দাঁড়া, দাঁড়িয়ে থাক্ এখানে! যত স্বার্থপর বেইমানের দল!

যে যেখানে ছিলো সব স্থানুর মত দাঁড়িয়ে রইলো। গাল চেপে ধরে ভব মল্লিক ঘুরতে লাগলো ঘরময়। তার কাতর উক্তি মার্বেল গুলির মত ছিটকে ছিটকে পড়তে লাগলো ঘরের বাতাসে। এমন যম-যন্ত্রণা আর কখনো ভোগ করেনি ভব মল্লিক। তবে আর একবারও তার যন্ত্রণা হয়েছিলো, সেটা এরকম শারীরিক নয়। সেটা ছিল নিতান্তই মানসিক। অবশ্য তার সঙ্গে অনেক ক্ষয়-ক্ষতির প্রশ্নও জড়িত ছিলো। মূলত সেই জন্যই তার রাগ ক্ষোভ লজ্জা-জ্বালাটা হয়েছিলো একটু মাত্রা ছাড়ানো।

রেকর্ড ভোটে জেতা থেকে একেবারে জামানত জব্দ কিছুতেই দুটোকে মেলাতে পারছে না ভব মল্লিক। কারণটা জানা থাকলেও মেনে নিতে পারছে না। ফলে তার রাগ বাড়ছে। আর রাগলে ভব মল্লিক তার বাপকেও খাতির করে না।

প্রথমেই আছাড় মেরে গুরুদেবের ছবিটা ভাঙে ভব মল্লিক। কারণ, মন্দ

মধুর হাসির সঙ্গে আঙুলের মুদ্রা দেখিয়ে গুরুদেবই তাকে বলেছিলেন, তোমার জয়ের রথ অপ্রতিহত থাকবে।

শালা ফেরেব্বাজ! আমাদের টাকায় প্রাসাদ তুল্য আশ্রম বানিয়ে, ঘি দুধে গায়ের চামড়ায় হাজার পাওয়ারের বাত্তি জ্বালিয়ে—তোমার জয়ের রথ অপ্রতিহত থাকবে! শালা, এ দেশের হাড় বজ্জাত জনগণকে চেনো তুমি! সুযোগ পেলে এরা কি না করতে পারে! সেই জন্য গোড়াতেই পষ্ট পষ্ট করে পানুকে বলেছিলো ভব মল্লিক, ঝুঁকি নিস্ না পানু। ঝুঁকি নেওয়াটা ঠিক হবে না। আমি এই জনগণকে একদম বিশ্বাস করি না। আগের বারের মত চালা।

পানুটা তখন ঘেয়ো কুত্তার মত কুঁইকুঁই করতে শুরু করেছিলো, এবার ওসব করা যাচ্ছে না। খুব মুশকিল!

—মুসকিলটা কিসের?

—নিজেদের গণ্ডগোলটা দেখছেন না আপনি। কাকে নিয়ে কি করবো। কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না।

—কিন্তু সবাই তো টাকা খেয়েছে আমার।

—খেলে কি হবে। এবার শালা পিপলের মেজাজও খুব তেড়িয়া। ঝুঁকি নিতেই হবে। সেই ঝুঁকি নিয়েই তো এই হাল! একেবারে জামানত জব্দ। তারপর মেজাজ কখনো ঠিক থাকে। সেবার গুরুদেবের ছবি, একটা টেপ-রেকর্ডার এবং টেলিফোন রিপেয়ারের অযোগ্য হয়ে ভাঙে। ভবদাকে শান্ত করতে পানুকেও একটা ভাঙার কাজ করতে হয়। নিজের হাতে উপদেশের বেগড়াবাঁই করা নেতা শংকর করকে সাফ্ করে দেয়।

কিন্তু যন্ত্রণাটা তো ক্রমশই অসহ্য হয়ে উঠছে। মাথার ভেতরটায় যেন খুব ছেঁড়াছিঁড়ি আর ভাঙাভাঙি চলছে। রাতটা যে কত লম্বা ঠিক বুঝতে পারছে না ভব মল্লিক। তাকে বেকায়দায় পেয়ে সবাই কি কোমর বেঁধে নেমেছে নাকি তার বিরুদ্ধে। ষড়যন্ত্র। তার পা চাটা পানুটা পর্যন্ত বেপাত্তা। হাতি কাদায় পড়লে ব্যাঙেও চাট্ মারে। হারামজাদা পানুটা এলে ওর পিঠের ছাল আজ তুলে নিতে হবে। উনি লণ্ডন থেকে ডাক্তার আনতে গেছেন। বিশ্বাসঘাতক কোথাকার!

তখন ভব মল্লিকের মনে হলো, ঝি-চাকর-দারোয়ান মায় তার স্ত্রী পর্যন্ত যেন মুখ টিপে হাসছে। দাঁতের সঙ্গে একটা জ্বলুনী ভর করলো ভব মল্লিকের

শরীরে। সে গোঁ গোঁ করে গোঁত্তা খেয়ে ঘুরে এলো। যতটা সম্ভব চোখমুখ বিকৃত করে বললো—সব হাসি হচ্ছে—হাসি! খুব মজা, না? চাকর নিতাই কাঁদো কাঁদো গলায় বললো—আজ্ঞে কই, আমরা তো হাসিনি!

—তবে তোদের দাঁত দেখা যাচ্ছিলো কেন? আমি বুঝি না কিছু!

উঁহু-হুঁ-হুঁ করে আবার একপাক ঘুরে নিলো ভব মল্লিক।

—চাবকাবো। সব পিঠের ছাল তুলবো! ভব মল্লিক বেকায়দায় পড়েছে আর সব্বার দাঁত বেরিয়ে পড়েছে! নেমক হারামের দল?

ভয়ে ভয়ে যে যার ঠোঁট শক্ত করে টিপে দাঁড়ালো। অসর্তক মুহূর্তে যদি দাঁত দেখা যায় তা হলে আর উপায় থাকবে না। ভব মল্লিক এখন খুন করতে পারে। ওটা সব সময়েই পারে. তবে এখন আরো বেশী পারে। পাথরের স্ট্যাচুর মত সব ক'টি মানুষ স্থির হয়ে আছে। ভব মল্লিক ঘুরছে। উঠছে। বসছে। লাফাচ্ছে দাপাচ্ছে। কখনো আর্তনাদ করছে। বিকৃত গলায় গালাগাল বৃষ্টি করছে। প্রথমে পানুকে। তারপর বাড়ীর লোকজন। দলের লোক। মফঃস্বল শহরের সব ডাক্তার। বিরোধী পক্ষের লোকজন। শহরের সব মানুষ। কাউকেই ছাড় দিলো না ভব মল্লিক। এমন কি ভোর হতে দেরী হচ্ছে বলে সূর্যটাও গালাগালের হাত থেকে রেহাই পেলো না।

পাথরের স্ট্যাচুগুলির মধ্য থেকে হঠাৎই একটা স্ট্যাচু অর্থাৎ ভব মল্লিকের স্ত্রী মরিয়া ভঙ্গিতে কথা বলে ওঠে, একটু ড্রিংক করো না। আরাম হতে পারে।

সৎ পরামর্শটা দিয়েই ধপাস্ করে মেঝের উপর পড়ে যায় ভব মল্লিকের স্ত্রী। মূর্চ্ছা এসে তাকে মুক্তি দেয়।

ভব মল্লিক বলে, সরা। সরিয়ে নিয়ে যা চোখের সামনা থেকে। ও ঘরে খাটের উপর নিয়ে শুইয়ে দে।

ঝি-চাকররা ভব মল্লিকের স্ত্রীকে ধরাধরি করে ওঘরে নিয়ে যায়। মূর্চ্ছা তাদেরও মুক্তির কারণ হয়। এবার তারা প্রকাশ্যে দাঁত দেখায়। ভব মল্লিকের যন্ত্রণা আর তাদের আনন্দ সমার্থক মনে হয়। গোঙাতে গোঙাতে আলমারী খোলে ভব মল্লিক। গ্লাস বোতল বার করে। তিনবার ছোট ছোট করে খায়। একটু দম ধরে দাঁড়ায়। এবার একটা বড় করে নেয়। মনে হয় কমছে। একটু যেন চাপার দিকে। আর একটা বড় করে নেবে কিনা ভাবছে। তখনই চিরিক্ করে খুলির নীচে একটা বিদ্যুতের সাপ এ কেবেঁকে ছুটে যায়।

—ধুত্তোরি শালা!

হাতের গ্লাসটা সামনের জানালায় পড়ে কাঁচের পুষ্পবৃষ্টি হয়।

ঝনঝন শব্দে চমকে ওঠে পান্নু। তবে কি তার বুকে গুলি লাগলো! কিন্তু একি, সে তো ভব মল্লিকের বাড়ীর গেটের সামনে গাড়ির মধ্যে বসে আছে। পান্নুর সব মনে পড়ে। এবং বোঝে আজ তার কপালে অনেক দুঃখ আছে। বিলম্ব এবং ডাক্তার না পাওয়ার একটা কৈফিয়ৎ সে মনে মনে ঠিক করে নেয়। হাতঘড়ি দেখে। ভোর পাঁচটা। সে ভব মল্লিকের ঘরের দিকে পা বাড়ায়।

ভব মল্লিকের দুই চোখ টকটকে লাল। মুখটা সামুদ্রিক ঝড়ে বিধ্বস্ত শহরতলীর মত। ভয়ংকর আশংকায় পান্নু মাথা নীচু করে দাঁড়ায়।

—এত দেরী?

গলার স্বর শুনে মনে হয়, সারারাত্রি লড়াই চালিয়ে ভব মল্লিক এখন পর্যুদস্ত। ক্যাসেত্তারে দেখা গদাযুদ্ধে পরাস্ত ভগ্নউরু দুর্যোধনের মত। কি একটা বলতে গিয়ে থেমে যায় পান্নু।

চিঁ চিঁ করে ভব মল্লিক বলে, গাড়ি রেডি কর। আমি কোলকাতায় বড় ডাক্তারের কাছে যাবো!

পান্নু ড্রাইভ করে ভালো। ঘণ্টায় ষাট মাইল স্পিডে গাড়ি চালিয়ে সে সাড়টা তেরো মিনিটে মহানগরীতে আসে। একটা ডেন্টাল ক্লিনিক খুঁজে নিতে আরো আধঘণ্টা যায়। ভব মল্লিককে ধ্বংসস্তূপের মত মনে হয়। পান্নু তাকে ধরে ধরে ভিতরে ঢোকায়।

কপালে ক্যাপ লাইট লাগিয়ে ডাক্তার তাকে ডার্ক রুমে পরীক্ষা করে বলে, আপনার আক্কেল দাঁত বেরুচ্ছে।

মিহি গলায় ভব মল্লিক বলে, আক্কেল দাঁত!

—হ্যাঁ। আক্কেল দাঁত। আপনার মাড়ি খুব পুরু আর শক্ত। সেইজন্য বেরুতে পারছে না। অস্ত্রোপচার করে একটু ছাড়িয়ে দিতে হবে।

মিয়ানো বিস্কুটের মত গলায় ভব মল্লিক বলে, তারই এত যন্ত্রণা!

মাথায় ক্যাপ লাইটটা খুলে হাসতে হাসতে ডাক্তার বলে, যে কোন ন্যাচারাল গ্রোথই পেইনফুল।

পান্নুকে পাশে নিয়ে ভব মল্লিক অস্ত্রোপচারের অপেক্ষায় বসে থাকে।

নিশা সামন্তের বাপের ভূত

চোত্‌ মাসে খড়ের ঘরে আগুন লাগার মত দাউ দাউ করে খবরটা ছড়ালো। প্রথমে গ্রামময়। তারপর মাঠ ভেঙে জলকাদা ঠেঙিয়ে এগ্রাম সেগ্রাম। সেখান থেকে আরো দূরে দূরে। খবরটা কি? না ধুলপুরের নিশা সামন্তর ঘর-মুনিষ হেলারামকে ভূতে ধরেছে।

দূর দূরান্ত থেকে লোক আসতে শুরু করলো। তাদের গামছায় বাঁধা চিঁড়ে গুড়। হাঁটুতক ধুলোর পলেস্তারা। চোখে মুখে উত্তেজনা। এই দশ বিশ ক্রোশের ভেতর অনেক দিন কাউকে ভূতে ধরেনি। আজকাল প্রায় ভূতে ধরা উঠেই যাচ্ছে। ভূতেদের সংখ্যা কমে গিয়েই হোক কিংবা ধরার মত উপযুক্ত ঘাড়ের অভাবের জন্তই হোক, ভূতে ধরা কেস খুবই কম। লোকে ভূতকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে, অথচ কাউকে ভূতে ধরে না এ তো খুব বিপদের কথা। এ হলো অনেকটা গিয়ে সেই, লোকের পেটে ভীষণ ক্ষিদে অথচ বাজারে চাল নেই গোছের। সেক্ষেত্রে একবস্তা চালের সংবাদ পেলে যেমন হাজার হাজার উপোসী সেই দিকে পড়িমরি দৌড় লাগায় অনেকটা তেমনি। শত শত, হাজার হাজার। জোয়ারের জলের মত লোক বাড়তে লাগলো।

নিশা সামন্তর উঠোন ছাড়িয়ে আগান বাগান। সে সব উপছিয়ে পুকুরের ধারে ধারে। লোক থৈ থৈ। পা ফেলার জায়গা নেই। নিশা সামন্তর বেগুন ক্ষেত, ট্যাঁড়শ ক্ষেত চৌপাট হয়ে গেল। ফলবান গাছের ডালপালা ভাঙলো।

গোড়ার দিকে ঠেকাবার চেষ্টা করেছিলো নিশা সামন্ত। সে জোতদার গোছের বিত্তবান বিষয়ী লোক। একটি সামান্য লঙ্কাগাছেও তার মায়া। ঠেকাবার চেষ্টা করে কোন ফল হয়নি। মাঝখান থেকে হাঁক ডাক করে তার

গলাটাই গেছে। এখন একটা খনখনে আওয়াজ উঠছে শুধু। সে কপাল চাপড়াচ্ছে আর বলছে, হায় হায়, এ আমার কি হলো!

বাড়ীর কাজকর্ম, রান্নাবান্না প্রায় উঠতে বসেছে। বাইরের ক্ষেত-খামারের কাজ তো বন্ধই। অনেক ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে তার। কিন্তু এখন আর কিছুই তার আয়ত্তে নেই। সব কিছুই যেন ভূতের কব্‌জায় চলে গেছে। মাঝে মধ্যে মনের কোণে উঁকি মারছে একটা সন্দেহ। হেলাটা তাকে জব্দ করার কোন ফিকির করেনি তো। একটু অত্যাচার, অবিচার অবশ্য হয়। সেই রাগে ভড়ং ধরে তাকে জব্দ করতে চাইছে না তো? কিন্তু সে বুদ্ধি আর যারই হোক হেলার হবার কথা নয়। হেলার বাপ সামন্ত বাড়ীর মুনিষ ছিল। সে মারা যায় হেলাকে দু বছরের রেখে। তখন থেকে হেলা এ বাড়ীর আশ্রয়ে। নেলা খ্যাব্‌লা, ঠোঁটের কষ বেয়ে নাল গড়ায় ল্যা ল্যা করে কথা বলে। হেলাফেলার মানুষ বলে হেলা নামটা তার পিসীমারই দেওয়া। সেই হেলার পক্ষে এটা সম্ভব নয়।

তা ছাড়া ভূতে একেবারে অবিশ্বাস সেই বা কি কোরে করে? যদিও ভূতজনিত কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তার এখনো হয়নি। কিন্তু পরোক্ষ অভিজ্ঞতার পরিমাণ তো বিশাল। লোকের মুখে মুখে ফেরা নানা গল্পকথা। গ্রামের বুড়োদের রহস্যময় অভিজ্ঞতার কাহিনী। গ্রামের গাছপালা, খাল বিল, আলো অন্ধকারের ভাঁজে ফুটে ওঠা নানান কিম্ভূত নকশা সবই তো ভূতের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার অনুকূল, সুতরাং সে যে একেবারেই এ সবে বিশ্বাস করে না এমনটাও ঠিক নয়।

লোক বাড়ছে হু হু করে। অনেকে উঠোন অবধি এগুতেই পারছে না। কোন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ শুনে তৃপ্ত থাকতে হচ্ছে। আর সব প্রত্যক্ষদর্শনের সঙ্গেই প্রতিটি প্রত্যক্ষদর্শীর নিজস্ব কল্পনা আর অভিরুচির মিশেল চলছে। ফলে বহুবর্ণময় এক কাহিনীর জন্ম হচ্ছে। কাহিনী মুখ ফেরতাই হতে হতে অনেক উপকাহিনীর জন্ম দিচ্ছে। মোট কথা গোটা তল্লাট জুড়ে এক ধুন্দুমার কাণ্ড।

গাঁয়ের ছেলেছোকরারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ভলানটিয়ার টিম তৈরী করে ফেলেছে। জননিয়ন্ত্রণ থেকে জলদান সবই চলছে। গাঁয়ের গুপো পলিথিনের বস্তায় করে মুড়ি বেচতে লেগে গেছে। ভিড়ের মধ্যে বাচ্চাকাচ্চা

আর মেয়েদের সংখ্যাটা কম। ভূতের ঘাড়াস্তরিত হতে কতক্ষণ। আর একথা কে না জানে, মেয়েদের ঘাড় পেলে ভূতের আর সব ঘাড়েই অরুচি। অবশ্য বয়স্ক বৃদ্ধা মহিলা কিছু আছে। তারা জানে, তাদের ঘাড় বিশ্বসংসারের আর কোন ভূতের পক্ষেই রুচিকর নয়।

ধুলপুরের ফটিক তার কুসুমপুরের মামাতো ভাইয়ের শালাকে দেখে বললো, বুইঝলে গগনদা, আমার খুব সন্দ হয়!

—কি সন্দ, বলো দিনি!

ভূতদর্শনপ্রার্থী কুসুমপুরের গগন অনেক রাস্তা হেঁটে এবং অনেক গল্প শুনে যথেষ্ট উত্তেজিত হয়েছিল। এখন সন্দেহের কথা শুনে সেটা আর এক মাত্রা বাড়লো।

ফটিক চারদিক তাকিয়ে গলা চাপা করে বললো, লোকটা তো ভালো নয় গো। হাড় বজ্জাত!

—কে? কার কথা বলছ তুমি?

—যার মুনিষকে ভূতে ধরেছে, সেই নিশা সামন্ত।

এই আচমকা কথার মাথামুণ্ডু ধরতে অক্ষম গগন হাঁ করে মাথা নাড়তে লাগল। বলল, জিনিসটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

মিচকি হেসে ফটিক বলল, ছিকিঞ্চের কপট নিদ্রার মত কপট ভূতে ধরা নয় তো?

—তাতে কি লাভ?

—নিশা সামন্তর কিসে লাভ, কিসে লোকসান তার হদিশ বোঝা আমাদের মতো লোকের কম্ম নয়। বুইঝলে দাদা, একেবারে ঘুঘুপাখি!

কথাটা মনে ধরে না গগনের। সে চার ক্রোশ পথ ঠেঙিয়ে, কৃষিকর্ম ফেলে ভূতে ধরার মত একটা উত্তেজনার আগুন পোহাতে এলো আর ফটিক কিনা এক ফুঁয়ে তা নিভিয়ে দিতে চায়। হোক আত্মীয়। গগন আর এখানে থেকে উত্তেজনাটা মাটি করতে চায় না। আস্তে আস্তে ভিড়ের মধ্যে গা ঢাকা দেয় গগন।

ওদিকে উঠোনে ডালিম গাছের তলায় এলাবেলা হয়ে বসে আছে হেলারাম। তার রক্তবর্ণ চোখ। চোখের কোণে পিঁচুটি। একটু ওলটানো গোছের ঝোলা ঠোঁটের কোণ বেয়ে নাল গড়াচ্ছে। মুখের মধ্যে দাঁতগুলি

অল্প জায়গায় গাদাগুচ্ছের লোক ঠাসাঠাসি করে দাঁড়াবার মত। শরীরটি লম্বা এবং ল্যাকপেকে। মাথার চুল কটা এবং খামচা খামচা। এমন লোককে ভূতে ধরা। ভূতেরও বলিহারি যাই। অবশ্যি তেনারা কাকে ধরবেন না ধরবেন সেটা তেনাদেরই বিবেচনার বিষয়। এসবের ওপর তো আর মানুষের কোন খবরদারী চলতে পারে না।

ঘাটের কাছটুকুতে বাঁশ বেঁধে পানা আটকাবার মত হেলার তিনধারেও খুঁটি পুঁতে নারকোলের দড়ি বেঁধে লোক ঠেকানো হয়েছে। এসব করিৎকর্মা ভলানটিয়ারদেরই কাজ। অনেক দিন বাদে তারা একটা কাজ পেয়েছে যেটা জীবিকা কর্মের একঘেয়েমিমুক্ত। এসবের ফাঁকে ফাঁকে আবার লোকের নানা কথার জবাব দিতে হচ্ছে।

—কোথায় ধরলো হে? কি করে ধরলো?

—কি করে ধরলো সেটি তো মানুষের জানবার কথা নয় মহাশয়। তবে ধরেছে ঐ চরকডাঙার মাঠে। মরা গরুর বাচ্চা ফেলতে গিয়েছিল। সেই দুকুরবেলা। সেই থেকেই চেপে আছেন।

মানুষের চোখ বড় বড় হয়। চরকডাঙার মাঠ! তা হলে আর ভূতে ধরার দোষ কি? চরকডাঙার মাঠে এক ধারে মুনিষ্যিজাতির দাহস্থান, অন্য ধারে পশু ভাগাড়। সুতরাং উভয় প্রজাতির ভূতেরই চারণভূমি জায়গাটা।

—নিচ্চয়ই হেলার কোন দোষ পেয়েছিলো!

শুনে এবার ভলানটিয়াররা হাসে। হেলার দোষ পেয়েছিলো কথাটার মানে কি? হেলার তো সবটাই দোষ। যার মা নেই, বাপ নেই, চাল নেই, চুলো নেই, তার আবার গুণ কি? সে সমস্ত বাড়ীর দাসখত লেখা, অন্ন খোঁটা মুনিষ—তার আবার গুণটা কোথায় দেখলেন আপনি? সবার ওপর ঐ একখানা চেহারা। মিছিমিছি ভূতকে আর দোষ দিয়ে কি হবে। না, এ ক্ষেত্রে ভূতের কোন দোষ নেই। এমন খুঁতে, দোষে পাওয়া লোককে মওকায় পেলে ভূতে ছাড়বে কেন?

কিন্তু ভূতে না ছাড়লেও ভূতকে তো মানুষের ছাড়াবার চেষ্টা করতে হবে। সেটি মানুষের কর্তব্য। অবশ্য হেলারামের ভূত ছাড়াবার জন্য নিশা সামন্ত বিশেষ খরচাপত্তর করতে রাজী নয়। আজীবন হেলার ঘাড়ে একটা ভূত চেপে থাকলেও তার কোন ক্ষতি ছিলো না। কিন্তু এ যে অন্য গেরো। জনতার ভূত তার বাগান

পুকুর, ঘর দুয়ার তছনছ করে দিচ্ছে। সুতরাং জনতার ভূত তাড়াতে গেলে আগে তাকে হেলার ভূত তাড়াতেই হবে।

রাগে নিশা সামন্তর শরীর জল বিছুটির মত চিড়বিড়ায়। নেলা খ্যাবলাটাকে সারা জীবন অন্ন গিলিয়ে এই তার নেট লাভ। সুতরাং বাধ্য হয়েই তাকে আশপাশ থেকে ওঝা খবর করে আনতে হয়েছে। বেফয়দা কিছু গাঁটগচ্চা যাবে। উপায় তো নেই।

হেলার সামনে এখন সাকুল্যে জনা তিনেক ওঝা। কয়েক প্রস্থ ঝাড়ফুঁক হয়ে গেছে। ঝাঁটা, সরষে আর জল পড়া প্রয়োগ করেও এখনো পর্যন্ত কবুল করানো যায়নি, যিনি চেপে আছেন তিনি কে? যতবারই ওঝারা জানতে চেয়েছে - বল্. তুই কে? —ততবারই হেলার মুখ দিয়ে একটি মাত্র শব্দ বেরিয়েছে, আমি!

—আমি? আমিটা কে বটে? কুথাকে নিবাস?

বাস, ঐ অবধি। আর কোন জবাব নেই। হেলার ঝোলা ঠোঁট দুটিতে যেন কুলুপ আঁটা। ওঝারা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। এ তো ভালো বিপদ। ভূতে ধরা একেবারেই উঠে যাচ্ছে বলে গাঁয়ে ঘরে তাদের অবস্থা পথের মাঝে ডাবের খোলাটার মত। গুণিনের গুণ বুকের তলায় মরচে পড়ছে। দেয়া থোয়া, খাতির কর্ম করাও ভুলে যাচ্ছে মানুষ। এই দুঃসময়ে হেলাকে ভূতে ধরাটা তাদের সামনে মস্ত বড় সুযোগ। তারা যে আছে, তারা যে দরকারী এইটে জানান দেবার এই তো সুসময়। ক্ষয় হতে বসা সম্মানের পুনরুদ্ধার করতে না পারলে তারা বাঁচবে কি করে।

ওঝারা বলে, সামন্ত মশাই, যিনি চেপে আছেন তিনি খুব জবরদস্ত। ঘোড়েল। সহজে নাম কবুল করতে চাইছেন না।

—তা হলে?

নিশা সামন্ত বিপন্ন বোধ করে। হেলাকে সহজে ভূতে না ছাড়লে তাকেও সহজে ভূতে ছাড়বে না। ইতিমধ্যে তো সব লোপাট হবার দাখিল। অসহায় ভাবে চারদিকে তাকায় নিশা সামন্ত।

ওঝারা বলে, ভাববেন না, সামন্ত মশাই। যত বড় ঘোড়েলই হোক আমরা তাড়িয়ে ছাড়ব।

ওঝাদের কাছেও বিষয়টা বাঁচন মরণের। লোকের কাছে খেলো হয়ে গেলে

তাদের মান সম্মান সবই গেলো। ফলে হেলারামের ভূতকে তারা যুদ্ধের গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে।

আবার নতুন কার্যক্রম শুরু হয়। লঙ্কাপোড়া, মন্ত্রপাঠ, ঝাঁটাপেটা সবই চলতে থাকে বিপুল পরাক্রমে। জনতার নাক চোখ জ্বালা করে। কিন্তু ঘোড়েল ভূতটির বিন্দুমাত্র অসুবিধার সৃষ্টি হয় না। মাঝে মাঝে হেলারামের দুই রক্তাভ চোখ জনতার ওপর দিয়ে ঘুরে যায়। সে যেন কি খোঁজে। এই দৃষ্টি জনতাকে সন্ত্রস্ত এবং শিহরিত করে। লোকে বুকে থুতু লাগায়। রাম নাম নেয়। কোমরের ঘুনশীতে বাঁধা ফুটো তামার পয়সা চেপে ধরে দৃষ্টি কাটান দিতে চায়।

ওঝারা চেঁচায়—বল, তুই কে ?

—আমি !

—আমি ! আমিটা কে বটে ? কুথাকে নিবাস ?

আবার হেলার ঠোঁটে তালা পড়ে। মাঝে মাঝে লাল চোখ ঘোরে জনতার ওপর। তবে কি পছন্দমত কোন ঘাড়ের খোঁজ করছে ঘোড়েল ভূতটি ! একটা পাতলা ভয়ের হাওয়া জনতার ওপর দিয়ে ঢেউ খেলে যায়। কলেরা বসন্তের মত ভূতে পাওয়াটাও খানিকটা ছোঁয়াচে। দু চারজন নরম গোছের ছুটকো ছাটকা লোক কেটে পড়ে।

মেয়েরা ঘর ছেড়ে বেরোয় না। সধবা পোয়াতী আর কুমারীরা তো নয়ই। তারা ঘরে বসেই সব শোনে। যা ঘটছে তাও, যা ঘটেনি তাও। শুনতে শুনতে এক ধরনের ভয় ভয় ভালো লাগায় তারা আরাম বোধ করে। গাঁয়ে সিনেমা নেই, থিয়েটার নেই। থাকার মধ্যে এই সব। তাও তো কত কাল পরে একটা ভূতে ধরা।

হেলা কত দিন কত লোকের বাড়ী থেকে জল গুড় বা এক খাবলা মুড়ি চেয়ে খেয়েছে। নাল গড়ানো আধ খ্যাপলা, জিভ আড়িয়ে কথাবলা হেলা। সেই হেলাকে ভূতে ধরেছে। যে সব মেয়েরা তাকে গুড় জল কিংবা মুড়ি দিয়েছিল, এখন সে কথা মনে করে তাদের শরীরে শীত শীত কাঁটা দিচ্ছে।

লোক আসছে। আরো অবিরাম লোক। মলমূত্রের গন্ধে নিশা সামন্তের বাড়ীর আশপাশে টেঁকা দায় হয়ে উঠেছে। বাড়ীর মেয়েরা দরজায় খিল লাগিয়ে জানলার শিকে মুখ চেপে আতঙ্কিত চোখে এই সব দেখছে। আর

দিশা হারিয়ে নিশা সামন্ত ছুটছে এ মাথা ও মাথা। তারও চোখ লাল হয়ে উঠেছে। গায়ে বেশ তাপ।

সব দেখে শুনে সাতানব্বই বছর বয়স্ক গাঁয়ের পেহ্লাদ ঠাকুরদা বলে, এ সবে হবে নি হে নিশা। বিলপাড়ের বাগদী ওঝা ঝগড়ুকে খবর পাঠাও। ঝগড়ু ছাড়া এ ভূত কেউ নামাতে পারবে না। তারপর ঝগড়ু বিষয়ে কয়েকটি রোমহর্ষক ভূত তাড়ানোর স্বচক্ষে দেখা কাহিনী ব্যক্ত করে পেহ্লাদ ঠাকুরদা।

নিশাপতি তাড়াতাড়ি লোক পাঠায়।

কিছুক্ষণ বাদে লোকেরা ফিরে এসে বলে—আজ্ঞে, এলো না।

—কেন?

—ভর পেট তাড়ি খেয়ে তালগাছের তলায় শুয়েছিলো। আমরা সব বলতেই জিজ্ঞেস করলো, কার বাড়ী? আমরা বললাম, নিশা সামন্তর। পাল্টা শুধোলে, কাকে ভূতে ধরেছে? জবাব দিলাম, নিশা সামন্তর ঘর-মুনিষ হেলারামকে। শুনে আজ্ঞে, ক্যানেস্তারা পিটোবার মতো করে হাসতে লাগলো। হাসতে হাসতে বললো—ধুস, আজকাল আর কাকেও ভূতে ধরে না! আমরা মা কালীর দিব্বি কেটে বলতে খানিক গুম্ হয়ে থেকে তারপর বললে, তাহলে ভূতে পাওয়া মানুষের কোন কুটুমকে এসে বলতে হবে। তবে আমি যাব।

পেহ্লাদ ঠাকুরদা বললো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওর ও রকম একটা নিয়ম আছে বটে।

নিয়ম তো আছে। কিন্তু হেলারামের কুটুমটা কোথায়? ঐ ঘাড়ের ভূতটি ছাড়া আর তো কোন কুটুম চোখে পড়ছে না নিশা সামন্তর।

পেহ্লাদ ঠাকুরদা আবার বলে, তুমিই যাও হে নিশা। অন্ন যখন দিয়েছ তখন তুমিই আত্মীয়। অবাচীন বৃদ্ধের কথায় খুব বিরক্ত এবং অপমানিত বোধ করে নিশা সামন্ত। তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে অথচ বোঝে না, জনসমক্ষে হেলারামের সঙ্গে তার আত্মীয়তা স্থাপন করা কতখানি গুরুতর অপরাধ।

তবে এখন আর এসব কথা ভেবে লাভ নেই। বিশাল জনতার চাপে তার এখন পরিবারশুদ্ধ লোকের দম বন্ধ হয়ে মরার উপক্রম হয়েছে। কাজকর্মের ক্ষতি যা হবার তা তো হচ্ছেই। তার বাগান আর সবজী ক্ষেতের দশা

হয়েছে হনুমানের হাতে অশোক কাননের মত। দাঁতে দাঁত চেপে নিশা সামন্ত প্রতিজ্ঞা করে, আগে ভূত তাড়াই। তারপর হেলাকে তাড়াব। যত রাজ্যের আপদ পুষে তার কি দুর্ভোগ !

নিশা সামন্তকেই যেতে হয়। এবং তালগাছের তলা থেকে আকণ্ঠ তাড়ি খেয়ে শুয়ে থাকা ঝগড়ু ওঝাকে তুলে আনতে হয়। ঝগড়ু সম্ভবত চোখে সামান্যই দেখে। তার মাথার চুলে চোত্‌ মাসের শিমূল তুলো ফেটেছে। এমনি সাদা। ভুরুর চুলও তাই। দেহটি সেই অনুপাতে সিধেই আছে বলতে হবে।

সে এসে হাঁক মেরে, গাল পেড়ে ছিঁচ্‌কে ওঝাদের গুণিনের ভূমিকা থেকে দর্শকের ভূমিকায় ঠেলে দেয়। তারাও থাকার ভরসা পায় না। জীবিত অবস্থায়ই ঝগড়ু প্রবাদতুল্য ওঝা। তাকে এবং বাঘা বাঘা ভূতকে কেন্দ্র করে কাহিনী বহু পল্লবিত মহীরুহ। সুতরাং জনতার মধ্যেও নতুন করে উত্তেজনার সঞ্চার হয়। এই বিরল দৃশ্যের সাক্ষী থাকার জন্য একটা হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। হৈ চৈ একটা হল্লায় পরিণত হয়। কথা কাটাকাটি, টুকরো টুকরো ঝগড়ার দৃশ্যে জায়গাটাকে অজস্র মানুষের মুখআঁকা আন্দোলিত কার্পেটের মত মনে হয়।

এই সময় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, বি. ডি. ও., তিনচারজন কনস্টেবল এবং থানার দারোগা অকুস্থলে ঢোকে। জনতা পথ করে দিলে তারা সামনে চলে যায়।

বি. ডি. ও. সাহেব বলেন, এসব কি হচ্ছে ? লোকটাকে মেরে ফেলবে নাকি !

পঞ্চায়েত প্রধান সামান্য হেসে বললেন, গ্রামে কিন্তু এখনো ভূত আছে।

—আপনিও এসব বিশ্বাস করেন দেখছি !

থানার দারোগা ভুরু কোঁচকায়। তারপর আবার বলে, অবশ্য এসব জিনিস খুব কন্‌ফিউজিং ! নিশা সামন্ত দারোগা এবং বি. ডি. ও. সাহেবকে খুব খাতির দেখায়। ভাঙা ক্যানকেনে গলায় তার সমূহ বিপদের কথা বলে। কিন্তু পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে একটা কথাও বলে না। তাকে সে আড়ালে ছোটলোকের সর্দার বলে। তা ছাড়া গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে হেরে গিয়ে তার বুকে প্রায় হুলবেঁধার জ্বালা। তাকে দেখে সেই জ্বালাটা এখন আবার নতুন করে চাগাড় দেয়। নিশ্চয়ই মজা দেখতে এসেছে। নিশা সামন্তর কাত

স্বচক্ষে দেখে আনন্দ করা! মনে মনে গাল পেড়ে জ্বালা মেটায় নিশা সামন্ত।

হেলারামের রক্তবর্ণ চোখ ঘুরতে ঘুরতে অঞ্চল প্রধান, বি. ডি, ও, দারোগাকে দেখে। এই প্রথম তার বিস্ফারিত চোখে পলক পড়ে। তার ঝুলে পড়া ঠোঁট কেঁপে ওঠে। সে একটু নড়ে চড়ে বসে। জনতার মধ্যে গুঞ্জন ওঠে। নানা মন্তব্য, অনুমান, কল্পনার মিশ্রণে জট পাকানো সুতোর মত হয়ে দাঁড়ায় পরিস্থিতি।

—দেখলে তো? ঝগড়ু ওঝা এয়েছে, ঠিক টের পেয়েছে।

– পাবে না আবার! ঝগড়, কি যে সে লোক নাকি হে! কত বেয়াড়া ভূত টাইট দিয়েছে বুড়ো তার ঠিক আছে?

—মানুষটির কত বয়স হবে বলো দিনি?

—হবে শ' দেড়শ।

—ভূতেরাই ওর পরমায়ু বাড়িয়ে দিচ্ছে।

—বুড়ো তো মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ করে না।

—তবে?

—তাল গাছের তলায় শুয়ে ওর গল্পগুজব সব ভূতেদের সঙ্গে।

উড়ন্ত মাছির মত গল্প জনে জনে ঘোরে। গল্প ছড়ায়। ভোজবাজির মত গল্পের গাছ বাড়ে। বিস্ময় সৃষ্টি করে। ঝগড়ু ওঝা, যে বারোমাস তালতলায় তাড়ি খেয়ে শুয়ে থাকে এখন তাকে দেখবার তৃষ্ণায় লোকের বুক ফেটে যায়। যারা তাকে প্রত্যহ দেখে তারাও ভাবে, মানুষটি যে এত বড় সিদ্ধ গুণিন জানতাম না তো হে!

এবার একটা প্রকাণ্ড হুংকার সহযোগে রণক্ষেত্রে লাফিয়ে পড়ে ঝগড়ু ওঝা। তার পায়ে একটা নানা রঙিন কাপড়ের টুকরো সমাহারে তৈরী হাঁটুঝুল পিরান। গলায় রুদ্রাক্ষ এবং হাড়ের মালা। সাদা উথালিপাথালি চুলে একটুকরো লাল কাপড়ের ফেট্টি বাঁধা। এতক্ষণ তাকে খানিক জরাগ্রস্ত মনে হচ্ছিলো। এখন ভঙ্গিতে রাজকীয় দৃপ্ততা। উপযুক্ত প্রতিপক্ষ পেয়ে যেন তার বৃদ্ধ পেশীতে তারুণ্যের সঞ্চার হয়েছে।

বিশাল জনতা নিঃশব্দ এবং রুদ্ধশ্বাস হয়। দর্শন আকাঙ্ক্ষায় একটা নীরব গুঁতোগুঁতি চলে শুধু। এখন নিশা সামন্তর বাগানে একটা পাতা খসলেও শব্দ

শোনা যাবে। এক পা আগে এক পা পেছনে রেখে, হাতের বদ্ধ মুঠিতে কি একটা অজানা বস্তু ধরে ঝগড়ু হুংকার দেয়, বল্ তুই কে ?

মিয়ানো গলায় হেলারাম বলে, আমি ভাত খাব !

ভাত খাবে ! ভূতে ? এমন অনাসৃষ্টির ভৌতিক আবদার লোকেরা গল্প কথায়ও শোনে নি। বিকট হা হা শব্দে হেসে ওঠে ঝগড়ু ওঝা।

চমকে উঠে দারোগা বলে, কি পিলে চমকানো হাসি রে বাবা !

অঞ্চল প্রধান বলে, ওঝাদের হাসি এই রকমই হয়। না হলে ভূত ছাড়বে কেন ?

ঝগড়ু হেঁকে বলে, কই গো, সামন্ত বাড়ীর মানুষ ! ভাত দাও। তবে খবরদার, কাঁসার থালায় দেবে না। মাছ দেবে না। দিলে ওনাকে আমি আর হটাতে লারব।

কলাপাতায় ভাত আসে। এ্যালুমিনিয়মের বাটিতে জল। হেলারাম গুপগাপ করে খায়। জনতা নীরব বিস্ময়ে দেখে। এক পাশে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসে ঝগড়ু ওঝা। ভূত যে তার আয়ত্তে এতে আর কোন সন্দেহ নেই। বিশেষ বেগ দেবে বলে মনে হয় না।

শহরের ছেলে বিস্মিত বি. ডি. ও. বলে, ব্যাপারটা কি বলুন তো !

অঞ্চল প্রধান বলে, গাঁয়ের লোকের ভূতে আর ভগবানে সমান ভক্তি। কিছু বলা যাবে না মশাই।

হেলারামের খাওয়া শেষ হতেই ঝগড়ু যাত্রার আসরে পার্ট বলার ভঙ্গিতে ঘুরে ঘুরে বলে—দেখ্, ভাত চাইলি, ভাত দিলম। আমার নাম ঝগড়ু ওঝা। সগ্গ, মত্ত, পাতাল ত্রিভুবন বন্ধন করে এলম আমি এই ঠাই। আমার কপালে বাঁধা কামিখ্যা কালীর কাপ্ড়ের ফালি। গুরুর নাম খামরু মোল্লা। তিনি ভুবনের ওপার থিকে ভূত উড়িয়ে লিয়ে এসে লিজের কাদা পা ধোয়াতেন। তার নামে শপথ। যা শুধোব ঠিক ঠিক জবাব দিবি— ।

রুদ্ধশ্বাস জনতার ওপর দিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে নেয় ঝগড়ু। তার দৃষ্টি রাজকীয়। এখন তার মাথা সকলের ওপরে। তার ভাতকাপড়ের সন্ধান নেই, জমি নেই, জিরেত নেই। তার ঝুপড়ি ঘরের ফুটো দিয়ে চৈতের রোদ আর বর্ষার পানি সমানে ঝরে। এক ঠ্যাঙে তাল বৃক্ষের গেঁজানো রস তার পেটের খিদে মেটায়। বারো মাস তার কেউ খোঁজ নেয় না। কিন্তু

আজকের এই একটা দিন তার। বহুকাল বাদে আসা একটা দিন। সে তাই তাড়ির চাটের মত বিষয়টাকে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে চায়।

ঝগড়ু আবার হাঁক পাড়ে, কই গো সামন্ত বাড়ীর মানুষ! এক ধামা চাল আনো। এগারোটা সুপারী, এগারটি পান। দশটা ট্যাকা। একখানি নতুন গামছাও আনবেক কিন্তু।

রাগে গা জ্বলে যায় নিশা সামন্তর। অল্প অল্প করে ভালো রকমই যাচ্ছে তার। আগে ভূত ছাড়ুক তারপর হতচ্ছাড়াকে সে গাঁ ছাড়া করবে। ঝগড়ুর কথা মত তাকে সবই দিতে হয়। এখন আর তার কোন কিছুকেই নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা নেই। পরিস্থিতি যেমন খেলাবে তাকে তেমনি খেলতে হবে। কূট বিষয়বুদ্ধির লোক নিশা সামন্ত সারা জীবন অন্যকে খেলিয়েছে। আজ তার খেলবার পালা!

চোখ দিয়ে জিনিসগুলি সব পরখ করে নেয় ঝগড়ু। তার নয়নজুলীর মত বলি রেখাঙ্কিত মুখে একটি পলাতক তৃপ্তি ফিরে আসে। হঠাৎ সে নাটকীয় ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়ায়। হেলারামের মুখোমুখি। চোখে চোখ রেখে তীব্র গলায় জিজ্ঞেস করে, এবার বল্, তুই কে?

—আমি!

দুই হাতে মাটিতে ভর দিয়ে হেলারাম উঠে দাঁড়ায়। ফলে জনতার দৃষ্টিতে ধরা এতক্ষণের ছবির মধ্যে একটা রূপান্তর আসে। আর যেকোন রূপান্তরই মানুষের মনের ওপর একটা ছাপ ফেলে। জনতা অধিক শ্বাসরুদ্ধ এবং অধিক নিঃশব্দ হয়।

ঝগড়ু গর্জন করে, আমিটা কে বটে? বল, সক্কলার সামনে পোস্কার করে বল্। নইলে আমি ঝগড়ু ওঝা, এই দিলম!

মুষ্টিবদ্ধ হাত উদ্যত করে ঝগড়ু।

দুই হাত তুলে কিছু ঠেকাবার ভঙ্গিতে হেলারাম বলে, আমি কাশী সামন্ত!

ধুলপুর গাঁয়ের নিশা সামন্তর বাড়ীর উঠোনে যেন ইন্দ্রের হাতের স্পেশাল বজ্রটি ফাটে। কাশী সামন্ত তো নিশা সামন্তর বাপ! বছর তিনেক হল দেহ-রক্ষা হয়েছে। নিশা সামন্তর শরীরটা আনচান করতে থাকে। তার শরীরের তাপ বেড়ে যায়। শেষকালটায় তার বাপ চাপল কিনা হেলারামের ঘাড়ে। জীবিত অবস্থায় তো এত অবিবেচক ছিল না তার বাপ।

এবার ঝগড়ু ওঝার আচরণের মধ্যেও একটা পরিবর্তন ঘটে যায়! সে অনেক নরম গলায় জিজ্ঞেস করে, আজ্ঞে, আপুনি হেলারামের ঘাড়ে কেনে চাপলেন?

হাজার হোক মানী লোকের ভূত। তাকে তো আর তুই তোকারি করা চলে না! আর কাশী সামন্তর দাপট এ তল্লাটে কে না দেখেছে। অমন ডাক সাইটে লোকের ভূতকে তো আর অপমান করা যায় না!

জবাব শোনার অপেক্ষায় জনতাও একেবারে নিথর হয়ে আছে। অন্য সব ইন্দ্রিয়ের কাজকর্ম এই মুহূর্তে স্থগিত! একমাত্র শ্রবণ ইন্দ্রিয় জেগে আছে তীক্ষ্ণ প্রখরতায়!

রক্ত চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে হেলারাম বলে, একটি অন্যেয্য কাজ হয়ে গেছে হে। সেটি শোধরাতে এলম।

নিশা সামন্তর মনে হলো কে যেন তার হৃৎপিণ্ডটা দুহাতে খামচে ধরে আছে।

কি অন্যায় হয়েছে?

কি অন্যায় শোধরাতে এলো তার বাপ হেলারামের ঘাড়ে চেপে?

ঝগড়ু আবার বিনীত ভঙ্গিতে শুধোয়, —আজ্ঞে, কি অন্যেয্য কাজ শোধরাতে আলেন?

চোখ আকাশে রেখেই হেলারাম বলে, সরকারী খাসের ভয়ে হেলার নামে পাঁচ একর জমি দলিল করেছিলম। এখন উয়ার দলিল উয়ারে ফেরৎ না দিলে আমার ছাড়ান নাই।

—বাজে কথা! মিথ্যে কথা! ডাহা মিথ্যে কথা।

ফাটা গলায় দুহাত তুলে তীব্র চিৎকার করে উঠলো নিশা সামন্ত। ওদিকে ঘরে শ্বশুরের ইচ্ছার কথা শুনে মূর্চ্ছা গেলো নিশা সামন্তর স্ত্রী অশ্রুমতী। হাজার হাজার চোখ ঘুরে এলো নিশা সামন্তর দিকে। ভীমরুলের চাকে ঢিলের মত একটা গুঞ্জন উঠলো। কটিক তার কুসুমপুরের মামাতো ভায়ের শালা গগনকে না পেয়ে সামনে দাঁড়ানো একটা অচেনা লোককেই বললো, কেমন, বলেছিলাম কিনা? নিশা সামন্ত মানুষটি মহা ঘুঘু!

লোকটি তাচ্ছিল্য চোখে তাকিয়ে বললো, আমাকে আবার কখন বললে তুমি!

চিৎকার করতে করতে ঝগড়ুর কাছে চলে এলো নিশা সামন্ত। তার চোখ টকটকে লাল এবং দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। এখন তাকেই ভূতে পাওয়া মনে হচ্ছে। সে ভাঙা গলায় চিৎকার করে বলল, ও আমার বাপ নয়। সব বানানো! সব মিথ্যে!

ঝগড়ু বিনীত ভাবে বললে, আজ্ঞে, জমির জন্যি বাপকে অস্বীকার যাবেন?

বিস্ময়ে অভিভূত বি. ডি. ও সাহেব বললেন, এসব কি ব্যাপার বলুন তো!

অঞ্চল প্রধান জবাব দিল, গাঁগ্রামে কত কিছু আছে মশাই! সব কি এত সহজে জানা বোঝা যায়!

একটা কাঁপা আঙুল হেলারামের দিকে তুলে নিশা সামন্ত বললো, আমার বাবার একটা বড় দোষ ছিলো। ও যদি ঠিক ঠিক আমার বাবা হয়, তবে বলুক সেটা কি দোষ?

ঝগড়ু রিলে করলো, আজ্ঞে বলুন, কি দোষ?

আকাশের দিকে মুখ রেখেই হেলারাম বলল, জমি চুরি!

বলেই সে কাটা কলাগাছের মত ধপাস করে উঠোনের ওপর পড়ে গেলো।

ঝগড়ু বললো, উনি চইলে গেলেন!

বাদা বাউরীর উপাখ্যান

বাদা বাউরীর নাম উঠলেই দু'একটি ঘটনা, দু'একটি নাম, একটি নির্জন ভূখণ্ড এবং একটি ট্র্যাজিক মৃত্যুর কথা এসে পড়ে। বাদা বাউরীর মৃত্যু প্রকৃত অর্থেই ট্র্যাজেডির নায়কের মৃত্যু। বাদা ছিলো ধীরোদাত্ত, সাহসী এবং কুশলী যোদ্ধা, তার চতুর্দিকে ঘিরে ছিলো প্রতিকূল দুর্ভেদ্য প্রাচীর। এই সবই ট্র্যাজেডির নায়কের অনিবার্য লক্ষণ। আপোষ ও সংগ্রামের মধ্যে সে বিপজ্জনক দ্বিতীয়টিকে বেছে নেয় এবং মারা পড়ে। ট্র্যাজেডির নায়কের যে আর একটি মৌল বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ উচ্চাকাঙ্ক্ষা, তাও বাদা বাউরীর যথেষ্টই ছিলো। সত্যি বলতে কি এই উচ্চাকাঙ্ক্ষাই যেন তাকে এক নিয়তি-নির্ধারিত পথে আমৃত্যু টেনে নিয়ে গিয়েছিলো।

তার শৈশব এবং বাল্যকাল কেটেছে রাঢ় বাংলায়। লাল মাটি, শালের জঙ্গল, জীবনযাপনের রূঢ় কৃপণতা মেনে নিয়ে তার প্রথাসিদ্ধ মৃত্যু হতে পারতো। কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষাই তাকে একটি লেংটি পরিয়ে চব্বিশ পরগণার দক্ষিণাঞ্চলে টেনে নিয়ে এলো। রাঢ় বাংলার কঠোর প্রকৃতি তাকে একটি পোক্ত শরীর উপহার দিয়েছিলো। এই শরীরটি নিয়ে সে দক্ষিণ চব্বিশ-পরগণার নোনা জল, পিছল কাদা মাটিতে এসে শক্ত পা ফেলে দাঁড়ালো।

তাকে দেখেই পছন্দ হল মহিম হালদারের। হালদারের দুটি অভাব। যেহেতু সে ধনবান তাই আরো ধনের অভাব। যেহেতু তার প্রচুর সম্পদ সেই জন্য সর্বদাই নিরাপত্তার অভাব। হালদারের চোখ তারিফ করলো সদ্য যুবক বাদা বাউরীর তরুণ শাল বৃক্ষের ন্যায় দীর্ঘ শক্ত শরীর ও স্লুইস্ গেটের মত বক্ষপট, আজানুস্পর্শকারী বলবান বাহু।

হালদার বললো, আমার এখানে কাজ করবি ?

মাথার উপর নীলাকাশ এবং পায়ের নীচে মাটি এই দুই অসীম বন্ধনী চিহ্নের মধ্যে দিশেহারা বাদা মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো। তখন অবশ্য তার নাম বাদা নয়। মড়া বাউরি। অনেকগুলি সন্তানের অকালমৃত্যুতে আতঙ্কিত বাপ-মা ছেলের জন্ম হতেই নাম রেখেছিলো মড়া। মড়া আর নতুন করবে মরবে না, সম্ভবত এরকম চিন্তাই এই নামকরণের পশ্চাৎপট।

নাম শুনে চোখ মুখ কুঁচকে মহিম হালদার বললো, ছ্যাঃ ছ্যাঃ। এটা একটা নাম হলো! সর্বক্ষণ অলুক্ষুণে মড়া মড়া করতে হবে!

তারপর একটু কাল ভেবে বলল, এখন থেকে তোর নাম বাদা। এই বাদায় তোর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হলো তো, সেই জন্ম বাদা। তোর পছন্দ তো?

বাদা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো। সেই থেকে সে বাদা। বাদা বাউরী।

হালদার জিজ্ঞেস করলো, তুই কি কাজ পারিস?

বাদা হাতের চেটো উল্টিয়ে জানালো, সে কোন কাজই পারে না। সুতরাং সেই মুহূর্তে একটা অলিখিত চুক্তি হলো। যে কোন কাজ পারে না, তাকে দিয়ে সব কাজই করানো চলে। অন্তত তার সব কাজই করা উচিত। ফলে হালদার বাড়ীর সব কাজ দৈত্যের মতো কাঁধে তুলে নেয় বাদা। সূর্য ওঠার অনেক আগেই সে ওঠে। সূর্য ডোবার অনেক পরে সে শুতে যায়। তার এই অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করার ক্ষমতার মধ্যে হালদার গিন্নী দৈব মহিমার প্রকাশ দেখে। সুতরাং সাপ থেকে সূর্য অবধি অগণিত ব্যাপারে ভক্তিমতী এই রমণীর সুনজরে পড়ে সে। খাদ্য সরবরাহে বাদার প্রতি কোন কৃপণতা করা হয় না।

প্রকৃতিদত্ত বিশাল কাঠামাটি অন্নজলের পরিচর্যা পেয়ে অচিরাৎ একটি দর্শনীয় বস্তুতে রূপান্তরিত হয়। শক্তি তার পেশীতে বন্য দাপটে জেগে ওঠে। শিলেট পাথরের মত কালো ত্বকে চোখ পিছলিয়ে আছাড় খায়। মহিম হালদার বাঁকা চোখে তাকিয়ে বলে, ছোটলোকের কাণ্ড দেখো। বলা নেই, কওয়া নেই, বাড়ছে তো বাড়ছেই! আমাদের অভাব কোন্‌টার! তবু এই দড়ি পাকানো চেহারা।

ইতিমধ্যে কয়েকটি ঘটনা ঘটে। আর সেই সব ঘটনাই বাদাকে যেমন হালদার বাড়ীতে তেমনই দূরদূরান্তে প্রতিষ্ঠা দেয়। বাদা প্রায় কিংবদন্তীর নায়ক হয়ে ওঠে।

প্রথম ঘটনাটি ঘটে হালদার বাড়ীতে। মধ্যরাতে ডাকাত পড়ে।

বাংলার দক্ষিণাঞ্চলের ডাকাতের খ্যাতি প্রায় প্রবাদপ্রতিম। হালদার বোঝে তার ধন এবং প্রাণ দুটোই যাবে। ফলে তার হাতে এবং পায়ে পৃথিবীর যাবতীয় ভূমিকম্প ভর করে। জানালা দিয়ে বন্দুক চালাতে গিয়ে সে অবাক বিস্ময়ে দেখে তার ডান দিকের দেওয়ালে টাঙানো বাবার তৈলচিত্রটি গুলিতে এফোঁড় ওফোঁড় হয়েছে। কাজেই তার আর বুঝতে বাকী থাকে না, চার পাঁচ হাত রেঞ্জের মধ্যে ডাকাতরা স্বেচ্ছায় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে এসে দাঁড়ালেও তার বন্দুক কাউকে স্পর্শ করতে পারবে না। সুতরাং সে ধরেই নেয়, সপরিবারে তার মৃত্যু হয়েছে। ডাকাতরা তার সমস্ত কাঁচা টাকা আর সোনাদানা দ্রুতগামী ছিপনৌকায় চাপিয়ে অজানা জায়গার দিকে যাত্রা করছে।

সে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে। সমস্ত কিছুর উপরে ব্রহ্মজ্ঞানের মত তার মনে পড়ে, হায় হায়, এত সম্পদ ছেড়ে আমি কোথায় যাব! এই জপমন্ত্রের ফাঁকে ফাঁকে সে নানা রকমের আওয়াজ শোনে। কোনটা হুংকারের, কোনটা আর্তনাদের। সে জামা কাপড় খারাপ করে মৃত্যুর অপেক্ষায় বিছানায় শুয়ে কাঁপতে থাকে। জ্ঞান ও অজ্ঞানের সীমারেখায় শুয়ে থেকে সে প্রথম যে ডাকটি শোনে তা যেন বেশ চেনা মনে হয়। তবু সে চোখ খুলতে পারে না। আবার সেই চেনা গলা। এবার সে দড়াম্ করে দরজা খোলার মত চোখ খোলে। এবং থলথলে, প্রায় প্রৌঢ়া স্ত্রীকে দেখতে পায়। স্ত্রীকে আস্ত অবস্থায় দেখে সে আরো ঘাবড়ায়।

হালদারগিন্নি গলায় যুগপৎ ভয়-আনন্দ-বিস্ময় ইত্যাদি মিশিয়ে হাউমাউ করে যে সব কথা বলে যায়, তার মানে করলে দাঁড়ায় বাদা বাউরী, ডাকাতরা পলাতক, হালদার বাড়ী নিরাপদ। শোনা মাত্র মুক্তকচ্ছ মহিম হালদার অকুস্থলের দিকে দৌড় লাগায়। সে দেখে গুটি চারেক ডাকাত অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ের চিকিৎসার বাইরে গিয়ে উঠোনে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। তারপর সে কিছু পরিমাণ আহত বাদাকে দেখে। তৎক্ষণাৎ সে ছুটে বাদাকে প্রণাম করতে যায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে, বেটা ছোটলোক আমার অন্নে প্রতিপালিত। পালক হয়ে পালিতের প্রতি এই আচরণ ধর্মমতে পাপাচরণ ছাড়া আর কিছু নয়। সে নিবৃত্ত হয়। স্থির নিষ্কম্প গলায় বাদার কাঁধে হাত রেখে বলে, সাবাশ বেটা।

বাদা তার শিলেট পাথরের মত কালো মুখে দাঁতের জ্যোৎস্না ছিটিয়ে হাসে। মালিকের এই আচরণে তা ক বেশ আনন্দিত মনে হয়।

হালদার গিন্নি বাদার মধ্যে আরো বেশী দেবমহিমা আবিষ্কার করে। তার খাদ্য তালিকায় ভাত ডাল মাছের সঙ্গে এক বাটি দুধ যুক্ত হয়। বাদাকে লোকাল থানা একটা পাঁচ ব্যাটারীর টর্চ উপহার দেয়। হালদার পায় আর একটা বন্দুকের লাইসেন্স। লোকের মুখে বাদার সাহস এবং হালদার বাড়ীর জন্ত তার মরণপণ লড়াইয়ের প্রশংসা শুনে মহিম হালদার হঠাৎ অনেকগুলি পয়সা খরচ করে বাদাকে একখানা নতুন কাপড়, স্যাণ্ডো গেঞ্জী ও গামছা কিনে দেয়।

বাদার মহিমা দূরে দূরে ছড়ায়। লোকমুখে বাস্তব ঘটনার সঙ্গে দৈব আভা যুক্ত হয়। যে সব ক্রিয়াকর্ম বাদার পক্ষে অসাধ্য তাই বাদার ঘাড়ে চাপিয়ে নিজেদের তৃপ্ত করে মানুষেরা। বাদা বাউরী কোন কথা বলে না। হাসে। সে আগের মতই হালদার বাড়ীর যাবতীয় কাজ উদয়াস্ত ধরে করে। সে ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে তেলচিটে বালিশে মাথা রাখা মাত্রই ঘুমায়। সূর্যের আগেই প্রকৃতিকে দেখে।

বিছ'নায় শুয়ে ঘুমকে তোয়াজ করতে করতে হালদার ভাবে, বেটা ছোটলোক কেমন শোওয়া মাত্রই টুপ্ করে ঘুমের দীঘিতে ডোবে। আর আমি? সারা রাত্তির বিছানায় ছটফট করে ভোরের দিকে একটু ছিঁচ্‌কে ঝিমুনি।

সে বিরক্ত হয়ে গিন্নির মাংসল পিঠে আঙুলের খোঁচা মেরে বলে, ঘুমুলে নাকি!

জড়ানো গলায় গিন্নি বলে, উঁহু!

—ছোটলোকদের অত তোয়াজ করে খাওয়াতে নেই, বুঝলে?

গলায় দীর্ঘ টান রেখে হালদার গিন্নি বলে, হ্যাঁ-এ্যা-এ্যা!

—হ্যাঁ ফ্যাঁ নয়। অত খাওয়াবে না. বুঝেছো! অত খাওয়ানো ভালো নয়।

এই সময় বুকের উপর ঘুমন্ত ছোট ছেলের লাথি পড়াতে হালদার গিন্নির চট্‌কা ভাঙে। সে পূর্ণ জ্ঞানে বলে, ছোটলোক হলেও ওর জন্যই তো আমাদের সব বেঁচে গেল।

—সে হলো গিয়ে তোমার ভগবানের কৃপা।

গিন্নি যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে বলে, সে তো হাজারবার সত্যি কিন্তু ভগবান তো নিজের হাতে কিছু করে দেন না। বাবার হাত দিয়েই করালেন।

মহিম হালদার বিরক্ত হয়। আনপড় মেয়েছেলেদের নিয়ে খুব ঝামেলা। ভক্তি জিনিসটা ভালো কিন্তু ভক্তিকে রাখতে হবে ভক্তের নিয়ন্ত্রণে। না হলে তো বানভাসি দশা হবে। হরির লুঠ হয়ে যাবে সব।

এর কিছু পরেই দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে।

আরো দক্ষিণের দিকে কিছু তালুক আছে মহিম হালদারের। অন্যেরা চাষ-আবাদ করে। দেবতার নৈবেদ্য গ্রহণের মত বছরে একবার গিয়ে নিজের ভাগ গ্রহণ করে মহিম হালদার। প্রতিবারই ভাগের সময় ঝুট ঝামেলা হয়। ঝামেলার জন্য মহিম হালদারের সন্দেহ থেকে। প্রতিবারই তার মনে হয়, ছোটলোকেরা তাকে উৎপন্ন ফসলের সঠিক ভাগ দিচ্ছে না। হিসাবের মধ্যে মস্ত বড় গড়বড় আছে। প্রতিবারই সে চোখ রাঙিয়ে, হুংকার দিয়ে জেতে। সে যেমন প্রতিবছরই জেতে সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ব্যাপার বিপরীত দিক থেকে ক্রম-পরিণতি পেতে থাকে। এই বাৎসরিক ঘটনাটি সাপ বাঘ এবং প্রকৃতির প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াকু ছোটলোকদের এক ধরনের শিক্ষা এবং ঘৃণা মিশ্রিত রাগের দিকে ঠেলতে থাকে। এবং সেটা যে এবছরেই অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও বিস্ফোরক হয়ে আছে তা মহিম হালদার কিভাবে জানবে। সে এসে তার বাৎসরিক রাগ, সন্দেহ প্রকাশ করে। এবং আদায় উসুলের জন্য চোখ রাঙানী নামক প্রক্রিয়াটি ব্যবহার করতে থাকে। মহিম হালদার ক্রুদ্ধ চিৎকারে বলে, ছোটলোকদের আমি একদম বিশ্বাস করি না!

ছোটলোকেরা পরস্পরের চোখে চোখে তাকায়। তাদের নোনা, হাজায় খাওয়া হাত পা। ফুটি ফাটানো রোদে ঝলসানো চামড়া। বেয়াড়া ঘোড়ার মত নোনা প্রকৃতিকে বাগে এনে ফসল দিতে বাধ্য করার শ্রমে পাকানো শরীর।

ছোটলোকদের মধ্যে বয়স্ক ছোটলোকটি শান্ত অথচ রোখা ভাঙিতে বলে, হালদার মোশাই, জমিনে ফসল ফলায় কারা গো?

—কেন? তোরা।

—ফসল কাটে কারা?

—তোরাই কাটিস।

—তবে দেয্য ভাগটা কেমূন হওয়া উচিত ?

এই প্রশ্নোত্তরের মধ্যে তীরের ফলার মত লুকানো সংকেতটি মহিম হালদারকে বিদ্ধ করে। সে নদীর ওপারে হিংস্র জন্তু বোঝাই ভয়ংকর সুন্দর বনের দিকে রাগী রক্তচোখ মেলে খানিক সময় তাকিয়ে থাকে। তারপর চাপা রাগে প্রশ্ন করে, এই তালুকটা কার রে ?

—কেন ? আপনার।

—তা হলে নেয্য ভাগটা কেমন হওয়া উচিত ?

এবার মহিম হালদারকে বিস্মিত করে অশিক্ষিত ছোটলোকটি বলে, হালদার মোশাই, ছেলে কার হয়, যে গব্বে ধরে, না যে পিত্তিপালন করে বাঁচায়ে রাখে ?

ছোটলোক এরকম যুক্তিবাদী হলে সত্যি সত্যি কার না রাগ হয়। মহিম হালদার রাগে ফেটে পড়ে। ফলে ব্যাপারটা আর এক তরফা থাকে না। ছোটলোকদের মধ্যে এক গোঁয়ার যুবক আকাশ ফাটানো হুংকার ছেড়ে বলে, শালোকে আজ নোনা গাঙের কাদায় পুঁতে দে যাবো।

অনেক দিনের বঞ্চিত, উপোসী, রাগী একদল ছোটলোক বাঘ চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে মহিম হালদারকে। হালদার বোঝে এখন ঘটনাটা আলাদা আলোচনার সীমা টপকে শারীরিক আঘাতের পূর্ব মুহূর্তে পৌঁছে গেছে। সে নানাবিধ বেগ অনুভব করে এবং স্নায়বিক আক্ষেপের শিকার হয়। তখনই লাঠি হাতে চক্রব্যূহে প্রবেশ করে বাদা বাউরী। চোখ বন্ধ করে মহিম হালদার শোনে হুংকার এবং আর্তনাদের ধারাবাহিক জান্তব শব্দ। কতক্ষণ ব্যাপারটা চলে সেটা ঠিক তার স্মরণে আসে না। সম্বিত ফিরলে দেখে বাদা তাকে নিয়ে নৌকায়। নৌকা নোনা জলের স্রোতে ভেসে চলে। পিছনের যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে থাকে একজন ছোটলোকের হাতে মার খাওয়া তিনজন ছোটলোকের লাশ।

বাদা বাউরী এবার পুরস্কৃত হয় অন্য ভাবে। থানা তার নামে কোন মামলা দায়ের করে না। সেই ছোটলোকদের কয়েকজনকে গুরুতর দাঙ্গাহাঙ্গামার অভিযোগে ফৌজদারী কেসে ফেলে ইহজন্মের মত মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া হয়। হালদারগিন্নি স্বামীর পরামর্শ মত ছেঁটে ফেলা বাদার দুধের বরাদ্দ পুনরায় চালু করে। স্বামীকে বলে, নিশ্চয়ই ভগবান তোমাকে রক্ষা করার জন্য

বাদাকে পাঠিয়েছেন। দু'দুবার বাদার জন্ত বেঁচে গিয়ে কথাটা হালদারেরও খানিক বিশ্বাস্ত মনে হয়। কিন্তু ভগবানের প্রতি তার একটা সূক্ষ্ম অভিমান দেখা দেয়। মহিমা যদি প্রকাশ করতেই হয় তবে বাদার মত ছোটলোকের মধ্য দিয়ে কেন। এতে কি ছোটলোকেরা আস্কারা পেয়ে যেতে পারে না?

বাদা আবার লোকের মুখে মুখে গল্পের চূড়োয় ওঠে। বাদা যা করেনি, বাদাকে দিয়ে তাই করায় লোকেরা। করিয়ে তাদের বিমর্ষ, মৃত দিনগুলিতে উত্তাপ সঞ্চার করে। বাদা শোনে। সাদা দাঁত দেখিয়ে হাসে। কোন কথা বলে না।

এর পর তৃতীয় ঘটনাটি ঘটে। ঘটনাটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু ভয়ংকর। মহিম হালদার প্রায় যমের দুয়ার থেকে ফিরে আসে।

ঘটনাস্থল বিছানা। কিছুদিন হয় গিন্নির নাকের ডাকে অতিষ্ঠ হয়ে আলাদা শোয়ার ব্যবস্থা করেছে মহিম হালদার। গিন্নির নাক অবশ্য বিয়ে হওয়াতকই ডাকে। তখন গিন্নির শরীরে যৌবন এবং উত্তাপ ছিলো বলে হালদারের কানে নাকের ডাকটা লাগতোই না। এখন সেসব চুকেবুকে গেছে। ফলে জল সরে গেলে কাদায় পোঁতা লগার মত খোঁচানোর ভঙ্গিতে উঁচিয়ে আছে নাকের ডাকটা। তাই আর আলাদা ব্যবস্থা না করে পারা যায়নি।

বিছানায় শুয়ে বাতি নেভাবার পূর্বমুহূর্তে হালদার ফোঁস করে একটা আওয়াজ শোনে। ব্যাপারটা বোঝার জন্য সে ঘাড় কাত করে আড়চোখে তাকায় এবং সেইভাবেই থেকে যায়।

তার আর চোখের পলক ফেলারও সাহস থাকে না। বালিশের পাশ থেকে মাথায় খড়ম আঁকা একটা সাপ ফণা তুলে তার মুখ লক্ষ্য করে স্থির হয়ে আছে। চিকন দামিনী-চমকের মত চেরা জিভ মুখের মধ্যে ঢুকছে আর বেরুচ্ছে। তকাৎটা হাত দেড়েকের। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফ্রীজশট হয়ে থাকে হালদার।

সম্ভবত এই ঘরে কোন কাজে এসে হালদার গিন্নির দৃশ্যটা নজরে পড়ে যায়। তৎক্ষণাৎ তার বাদার কথা মনে পড়ে।

তারপর কখন একটি দীর্ঘ কালো হাতের পাঁচটি আঙুল খড়ম-গরবিনীর ফণার নীচেটা বিদ্যুৎগতিতে চেপে ধরে, কখন একটি আছাড়ে কালান্তকের

কাল দর্শন হয়, কখন তার জ্ঞান লুপ্ত হয় সেই সবের কিছুই মনে আনতে পারে না মহিম হালদার। ঘন্টা তিনেক বাদে চোখ খুলে প্রথম কথা বলে, বাদা কই?

বাদা আসে এবং হাসে। তার দু'টি কালো ঠোঁটের ফাঁকে সাদা জ্যোৎস্না ছলাৎ করে ওঠে। একবার নয়, দু'বার নয়, পরপর তিনবার। শেষেরটা প্রায় শিবের অসাধ্য কাজের মধ্যে পড়ে। মহিম হালদারের দু'চোখ জলে ভরে আসে। সে বাষ্পরুদ্ধ গলায় বলে: বল, তুই কি চাস?

বাদা মাথা নীচু করে।

তার কালো শরীর ছুঁয়ে আবেগ-মাখা গলায় হালদার বলে, তুই আমার জীবনদাতা। তুই যা চাইবি তাই দেবো।

ফস করে বাদা বলে বসে, মোকে এট্টু জমি দিবে? চাষ আবাদ করে নিজের মত থাকবো।

ঠিক তখনই নীল আকাশে মেঘের ডাক শোনা যায়। নোনা গাঙে অসময়ে স্রোত আসে। বনের পশুরা রাত বিভ্রমে জলের সন্ধানে বাইরে ঘোরে। নানাবিধ কুলক্ষণ দেখা দেয়। অর্থাৎ বাদার জীবনে ট্রাজেডির সূত্রপাত হয়। বাদার উত্থানপর্ব সমাপ্ত হয়ে পতনপর্বের সূচনা হয়।

মহিম হালদারকে গভীর চিন্তায় ফেলে বাদা। একেবারে আক্ষরিক অর্থেই বাঁশবনে ডোম কানা হয়ে পড়ে। জমির তো সীমা পরিসীমা নেই, কিন্তু কোন জমিটা দেওয়া যায়। প্রতিশ্রুতি যখন দেওয়া হয়ে গেছে জমি তখন দিতেই হবে। অথচ চোখের উপর একটাও দানযোগ্য জমি ভেসে উঠছে না। দিনকতক আহার নিদ্রায় অরুচি হয় মহিম হালদারের।

অবশেষে একটা উপায় হয়। মহিম হালদারের চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। একদিন ভোরবেলা সে বাদাকে বলে, চল তোর জমি দেখবি চল্।

বাদার পায়ে ঝড়ের গতি লাগে।

হালদার বলে, আরে তুই যে ঘোড়া ছোটালি। আমি পারবো কেন। একটু আস্তে চল। জমি বিষয়ে বাদার এরকম ক্ষুধা তার ভালো লাগে না। তার এবং বাদার ক্ষুধা একই রকম হবে, এটা ভাবাও অপমানজনক। জমির কাছে এসে মহিম হালদার বলে, নদীর ধার থেকে অই যে দূরে গেমো গাছটা দেখছিস্, অই অবধি তোর জমি!

জমির পরিমাণ দেখে বিস্ময় বাদার চোখে মাকড়সার জাল বোনে। এত জমি তার। এই সবটা তার নিজের!

মহিম হালদার নদীর খোলা হাওয়ায় হা হা করে হাসে। হাসতে হাসতে বলে, এই সবটাই তোর নিজের। তোকে একেবারে দিয়ে দিলাম।

তারপর থেমে গম্ভীর থমথমে গলায় বলে, আমি কখনো কাউকে জমি দেইনি। সূচের মাথায় যতটুকু জমি ওঠে ততটুকুও নয়। তুই আমার জীবন বাঁচিয়েছিলি, সেই জন্য তোকে দিলাম।

অশিক্ষিত ছোটলোক যদি স্বপ্ন দেখে তা হলে যা যা ভুল করে, বাদারও সেই সেই ভুল হয়। সে দেখে না জমিটা নদীর সমতলে। তার নজরে আসে না, কাঁচা বাঁধের চোরা ছিদ্রপথে নদীর নোনা জলের অবাধ যাতায়াত। তার মালুম হয় না, জমিটাতে মোথা ঘাস আর জলজ চিটপিটির অমর রাজ্যপাট।

সে দিনকতক ঘোরে থাকে। গেমো গাছের তলায় টঙ্ বাঁধে। চালা খাটায়। বেড়া লাগায়। একক সংসার পাতে। দা কুড়ুল কোদাল সংগ্রহ করে। বুকে অফুরন্ত দম এবং পেশিতে অপরিসীম শক্তি অনুভব করে। রাতে টঙে চিৎ হয়ে শুয়ে একটা অদেখা অচেনা নারীর অবয়ব ভাবতে চেষ্টা করে। সে গোটাটা ভাবতে পারে না। ধড় মুণ্ড সব আলাদা থেকে যায়। বিচ্ছিন্ন অবয়বই তাকে শিহরিত করে।

সূর্য ওঠার আগে থেকেই সে কাজে লাগে। নালা কেটে জল বাইরে বার করার ব্যবস্থা করে। দু'দিন দু'রাত সমানে জল নিকাশের পরেও জমিতে জল একই পরিমাণ থেকে যায়। তখন তার চোখ বাঁধের চোরা ছিদ্রগুলিকে আবিষ্কার করে। সে মেরামতির কাজে লাগে। মাসের পর মাস চলে সে কাজ। সব ছিদ্র বন্ধ হলে মেঠো ইঁদুরের কৃপায় নতুন ছিদ্রের জন্ম হয়। একধারের মোথা ঘাস আর জলজ চিটপিটি সাফ করে অন্য ধার শুরু করতে না করতেই আবার গজিয়ে ওঠে রক্তবীজের বংশেরা।

মহিম হালদার তার গিন্নিকে বলে, ছোটলোকদের কাজ ছাড়া রাখতে নেই। বাদাকে এমন কাজ দিলাম যা জীবনভর চলবে।

লোকেরা ঐ পথে আসতে যেতে কর্মরত বাদাকে দেখতে পায়। তারা দেখে সংসারের এক দুর্লভ সরলতা পৃথিবীর এক জটিলতম ভূখণ্ডকে আবাদ-যোগ্য করার প্রক্রিয়ায় ব্যস্ত। কিংবদন্তীর নায়ককে দেখে এবার তারা হাসে।

তারা জানে, পৃথিবী যেখানে যেখানে এসে অশেষ কৃপণ হয়েছে এই নির্জন ভূখণ্ডটি তার মধ্যে পড়ে।

তারা বলাবলি করে, বাদাটা হাবা।

— বাদাটা বোকা।

বাদা তার কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। সে পরাজয়ের কথা ভাবে না। তার শরীরে এখনো শক্তির ভাণ্ডার মজুত। রাতে টঙে শুয়ে সে এক আন্দোলিত সবুজ শস্যের ক্ষেতের কথা ভাবে। তাকে ঘিরে চতুর্দিকে জেগে থাকে এক জীবন্ত অন্ধকার। সাপ ব্যাঙ পোকামাকড়ের চলাচলে রাত্রি প্রাণ পায়। দূর আকাশের নক্ষত্রেরা এদিক ওদিক সরে গিয়ে ঋতু পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করে।

তখন একদিন এখানে একটা লঞ্চ থামে। একটা আধবুড়োটে ক্ষেপাটে গোছের লোক নামে। অনেকক্ষণ তেজী রোদে দাঁড়িয়ে বাদার কাণ্ডকারখানা দেখে। বাদার সঙ্গে আলাপ করে। সব শুনে বলে, সারা জীবন এমনি ধারা চালালেও কোন ফল হবে না হে।

বিস্ময়ভরা চোখে বাদা বলে, কেনে ?

—জলজ চিটপিটি আর মোথা ঘাস এভাবে মরে না। নোনা জল ঠেকাতে গেলে অন্য ব্যবস্থা চাই। শুনে বাদা নদীর উপর দিয়ে দূরের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকে যা দেখে বুড়োর কি মনে হয় কে জানে। সে বলে, আমি সব ঠিক করে দিতে পারি। কেমিকেল স্প্রে করে দিলেই আগাছা ঝাড়ে বংশে মরবে।

বাদা শুধোয়, আপনি কে বটে ?

বুড়ো এলোমেলো দাঁতের জঙ্গলে একটু হাসে। চোখ পিট্‌পিট্ করে বলে, চাষ-আবাদ নিয়েই কাজ আমার হে। সুন্দরবনের উপর গবেষণা চালাচ্ছি আমি। এ মাটিতে কি আছে, কি নেই, কি দিতে হবে, কেমন ফসল হবে এই সব হিসেব নিকেশের কাজ আর কি।

বাদা কিছু বুঝতে পারে না। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। বুড়ো অল্প অল্প হাসে। নগর সভ্যতার উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ক্ষেপাটে বুড়োর সঙ্গে অশিক্ষিত বাদা বাউরীর একটা সখ্যতা জন্মে। সখ্যতার মূল কারণ সম্ভবত দুটি। উভয়েই উৎপাদনকামী। উভয়েই ফসলের স্বপ্নে মশগুল। ফলে

তাদের মধ্যে একটা মিলনবিন্দু সৃষ্টি হয়। বুড়ো বক্‌বক্‌ করে অনেক কথা বলে। বাদা একবর্ণও বোঝে না। বাদা তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে। শুনে বুড়ো কেমন তন্ময় হয়ে যায়। ইতিমধ্যে নিজের লোক দিয়ে বুড়ো ভূখণ্ডটিতে কেমিকেল স্প্রে করিয়ে দেয়। বাদাকে এক বস্তা চুন দিয়ে বলে, ঠিক একমাস বাদে এই চুন ছড়িয়ে দেবে। তারপর জমি পড়ে থাকবে এক বছর। রোদ খাবে, জল খাবে। তারপর লাঙল। তারপর রোয়ার কাজ। তখন এই রাক্ষুসীটা মা হবে। বুড়ো নিজের পয়সায় বাদাকে প্রচুর নারকেলের চারা সরবরাহ করে। বলে, বাঁধের ধারে ধারে লাগাও। শিকড় মাটি কামড়ে রাখবে। নোনা জল আর ঢুকবে না।

এক দেবদূত আর তার দেখানো স্বপ্নের মধ্যে বাদা সম্মোহিতের মত কাজ করে চলে। বাদার পরিশ্রম করার ক্ষমতা বুড়োকে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য দেখায়। সে শিরাওঠা হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কে জানে কেন বারবার চোখ মোছে।

অবশেষে একদিন বাদার ঘামে ভেজা চওড়া পিঠের উপর একটা চাপড় মেরে হাসতে হাসতে লক ভটভটিয়ে কোথায় চলে যায়। বাদা কাজের ফাঁকে ফাঁকে নদীর ধারে এসে দাঁড়ায়। বহতা নদীর জলে চোখ রাখলেই কানে আসে, তখন এই রাক্ষুসীটা মা হবে।

ঋতুচক্রে সময় ঘোরে। নোনা মাটি, নোনা হাওয়ায় চড়চড়িয়ে নারকেল গাছ বেড়ে ওঠে। লক্ষ লক্ষ শিকড়ের প্রেমে মরণ ফাঁসে বাঁধে মাটিকে। বাঁধের ওপাশে নদীর নোনা জল ফোঁসে, ছোবল মারে। কিন্তু বাদার জমিতে ঢুকবার পথ পায় না।

তারপর একদিন লোকেরা দেখে এক নির্জন সবুজ ভূখণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে আছে বাদা বাউরী। লোকের বিস্ময়ের অবধি থাকে না। তারা পায়ে পায়ে কাছে আসে। অবাক গলায় ডাকে, বাদা!

বাদা মুখ তুলে তাকায়।

—এসব কি পেকারে হলো বল্‌ তো!

বাদা হাসে। লোকেরা তাকিয়ে দেখে বাদার মাথায় শরৎকালের কাশফুল। তারা বলে, বাদা, তুই বুড়ো হয়ে গেলি!

বাদা আবার হাসে। জমির দিকে আঙুল তুলে বলে, ওই দিলে সব।

কিছু না দিয়ে তো ও কিছু দিবে না। বাদার নামে আবার গল্প কাহিনী ছড়ায়। কথকদের মুখে মুখে পল্লবিত হয় সেই কাহিনী। লোকেরা বাদার মধ্যে নিজেদের ত্রাণ খোঁজে। বাদার কথা গিয়ে ঢোকে হালদারবাড়ীতে।

মহিম হালদার এখন বৃদ্ধ। ভক্তিমতী গিন্নি দেহরক্ষা করেছেন বছর দশেক আগে। ছেলে দখিন হালদার এখন সব দেখাশোনা করে। ছেলে দখিন রাশভারী, বাবার তুলনায় অনেক বেশী বৈষয়িক, আবেগ শূন্য এবং নিষ্ঠুর। সে এসে বাদার আবাদে দাঁড়ায়। দেখে তার এক চোখ জুড়োয়, এক চোখ চকচক করে ওঠে।

বাদা তাকে চিনতে পারে না।

সে বলে, আমার বাবা মহিম হালদার।

দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে বাদা বলে, মালিক দিয়েছিলেন বলে, তাই।

—কি দিয়েছিলেন? স্থির চোখে তাকায় দখিন হালদার।

বাদা কেমন অস্বস্তি বোধ করে। আস্তে আস্তে বলে, এই জমিনটা!

—দলিল পাট্টা ছিলো কিছু?

বাদার চোখে কলকলিয়ে অন্ধকার ঢোকে। সে মাথা নাড়ে।

—তবে? স্থির চোখে তাকিয়ে ভারী গলায় বলে দখিন হালদার।

দীর্ঘ দেহ কিঞ্চিত নুয়ে পড়া, শিলেটের মত গায়ের রঙ একটু ছায়াটে, মাথায় চুলের মুকুট, নোনা জলে সাদায় খাওয়া হাত পা। ঘোর-লাগা গলায় বাদা বলে, মালিক বলেছিলেন, তোকে একেবারে দিয়ে দিলাম!

পাথর ভাঙ্গার মত শব্দ করে হাসে দখিন হালদার। বলে, দলিল পাট্টা না করে জমি কখনো কাউকে দেওয়া যায়? এ জমি আমার। ফসলের অর্ধেক আমার।

কিছুক্ষণ ঘোলা চোখে তাকিয়ে থাকে বাদা বাউরী। তারপর মোচড় খেয়ে ঘুরে ছুটতে থাকে দু'পাশের আন্দোলিত শস্যের ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে। 'ফসলের অর্ধেক আমার' কথাটা যেন তাকে বর্ষার ফলার মত তাড়া করতে থাকে। সে দৌড়ে বাঁধে ওঠে। নারকেল গাছের ফাঁকে ফাঁকে ছোটাছুটি করে, তার শরীরে যেন এক তীব্র বিষক্রিয়া চলছে। আবার সে ক্ষেতে নামে। শেষে লাফিয়ে ওঠে টঙের মাথায়। বহু যুদ্ধ জয়-করা তার পাকা লাঠিটা মাথার উপর তুলে ধরে আকাশ ফাটানো চিৎকার করে ওঠে।

—না-আ-আ-আ!

আপোষ ও যুদ্ধের মধ্যে সে দ্বিতীয়টি বেছে নেয়। ঘটনা ট্র্যাজিক পরিণতির দিতে দ্রুত এগুতে থাকে। সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষাই তাকে নিয়তির মত টেনে নিয়ে চলে।

সব শুনে বৃদ্ধ মহিম হালদার কম্পিত গলায় ছেলেকে বলে, বাদা আমার তিন তিনবার জীবন বাঁচিয়েছিলো। ওকে অন্তত একবার সুযোগ দিস্। দখিন হালদার কোন কথা বলে না।

তার পরের ঘটনা অতীব সংক্ষিপ্ত।

সেদিন নাকি একটা আস্ত চাঁদ উঠেছিল নারকেল গাছের মাথায়। দক্ষিণ সমুদ্র থেকে উঠে এসেছিলো স্বাস্থ্যদায়িনী বাতাস। বাদার শস্যক্ষেত্রে মায়ের বুকে দুধের মত ধানেরও বাঁধছিলো জমাট ছোট ছোট দানা। অর্থাৎ পৃথিবী ছিলো প্রেম ও জীবনের পক্ষে চমৎকার অনুকূল। ঠিক তখন নাকি সেই নির্জন ভূখণ্ডে একটা বন্দুকের শব্দ হয়। মহিম হালদারের মত দখিন হালদারের হাত কাঁপে না। নোনা নদী দিয়ে একটা প্রকাণ্ড শিলেট পাথরের লাশ ভেসে গিয়েছিলো বঙ্গোপসাগরের দিকে।

বাদা বাউরীর ট্র্যাজিক উপাখ্যান এইখানেই শেষ হবার কথা। কিন্তু শেষ হয় না। কারণ দক্ষিণের ছোটলোকেরা এই কাহিনী বিশ্বাস করে না।

তারা অন্যরকম বলে।

সেই নির্জন ভূখণ্ড নাকি এক রণক্ষেত্রের রূপ নেয়। বাদা তার জীবনের শ্রেষ্ঠ যুদ্ধ এবং সাহস দেখায়। দখিন হালদারের লাঠিয়ালরা চূড়ান্ত মার খায়। হারে। আবার ফিরে আসে। আবার মার খায়। দখিন হালদারের কপাল থেকে রক্ত ঝরে। কতক্ষণ এই ভয়ংকর লড়াই চলে তা সঠিক কেউ জানে না। চাঁদ পশ্চিম দিগন্তে টাল খেয়ে গেলে পিছন থেকে দখিন হালদার বাদা বাউরীর পিঠে পরপর দুটো গুলি করে।

ফলে বাদা বাউরী বাদাঞ্চলের ছোটলোকদের কাছে চিরকালের জন্য বেঁচে যায়।